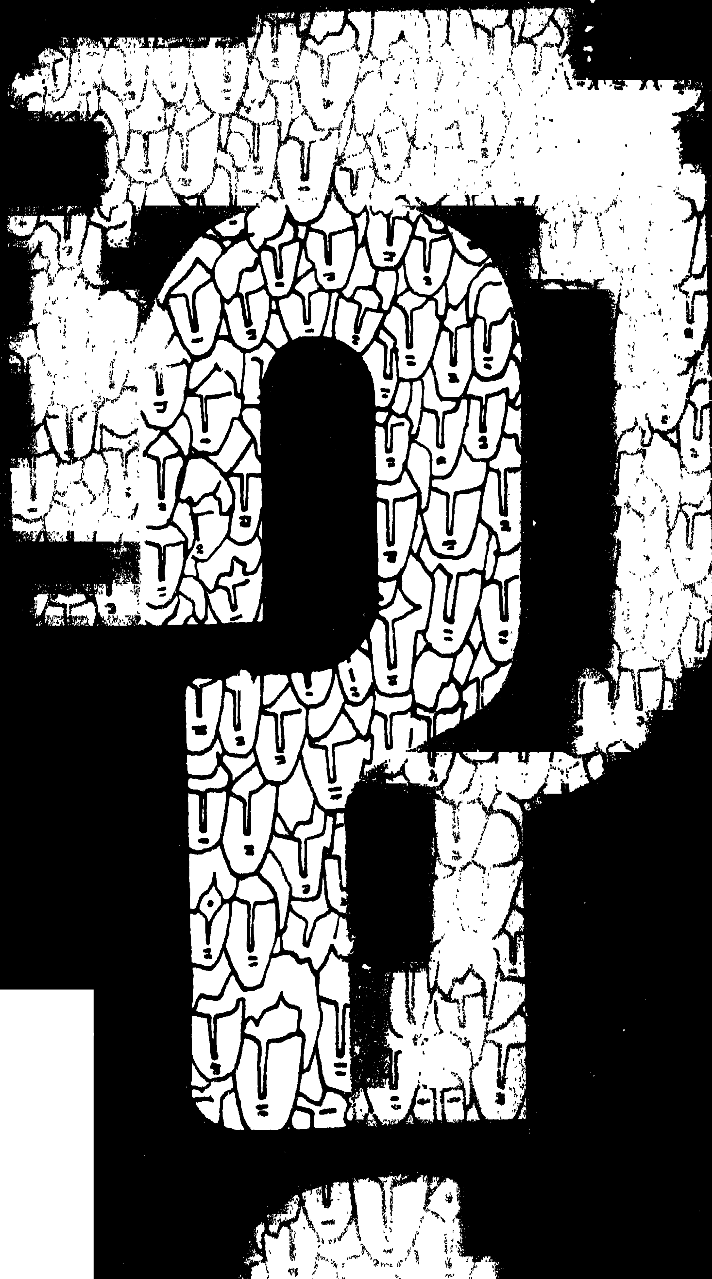
ভালো আছো

গোপাল সামন্ত



ভালো আছো

গোপাল সামন্ত

রামায়ণী প্রকাশ ভবন
১০৬, রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
১০৩/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—১৯৪৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীদুলাল চন্দ্র ভূঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
১১ তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গত পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতির

উদ্দেশ্যে—

ভালো আছো

॥ এক ॥

সুহাস বাড়ি থেকে বের হয়ে এল। আজ অফিসের পিক্-আপ্ ভ্যানটা আসবে না। একটু আগে টেলিফোনে খবর এসেছে ওটাকে মেরামতের জন্য কারখানায় নিয়ে যাওয়া দরকার। ফোনটা পেয়ে ভালোই হয়েছে। এখনও তাড়াতাড়ি মোড়ে পৌঁছোতে পারলে ট্যাক্সি হয়তো পাওয়া যাবে।

মনের মধ্যে দ্রুততার ভাব নিয়ে রাস্তায় এসে পড়তেই সুহাসকে একটু পিছিয়ে আসতে হলো। বারান্দায় কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো। সামনেই দু-জন লোক রাস্তায় একটা বাঁশ ঘোরাচ্ছে। সুহাস তাকিয়ে দেখল ওদের সামনের বাড়ির দেয়ালে আরও বাঁশ দাঁড় করানো রয়েছে। ভারা বাঁধা হচ্ছে— রঙ মিস্ত্রিদের হাল্কা রকমের ভারা। বাড়িটায় চুণকাম কিংবা রঙ হবে। পুজো কাছে এসে গিয়েছে। অনেক বাড়িতেই রঙ-কলি ফেরানো হচ্ছে। কালই তো মহালয়া না?

বাঁশটা ঘুরে সামনে খালি হতেই সুহাস এগিয়ে যায় ছোট্টুলালের দোকানের দিকে। আফিসে যাওয়ার সময় রোজ সে ওখান থেকে নিজের ব্র্যাণ্ডের দু-প্যাকেট সিগারেট তুলে নেয়।

দোকানের সামনেটায় একটু ভিড়ের মতো। প্রতিদিনই এমনি সময়ে ও-রকম থাকে এই জায়গাটা। সুহাস জানে এই ভিড়ের সব মানুষ কিছু কিনতে এখানে আসে নি। এখানে দাঁড়ানো পাড়ার সব বেকার ছেলেদের অভ্যাস। দোকানটার সামনে টিনের বড়ো ঝাঁপটাই হয়তো সেজন্য দায়ী— গ্রীষ্মের রোদ, বর্ষার বৃষ্টি থেকে দরকার মতো মাথা বাঁচিয়ে বছরের বারোটা মাস এখানে দাঁড়িয়ে গল্প আড্ডা অব্যাহত চলে। তারই ফলে অভ্যাস। সেটা বেকার ছেলেদের। কিন্তু স্কুলের ছেলেরাও আছে। জলে জল টানে, ভিড়ে ভিড় টানে। তাই হয়তো ছোট্টুলালের দোকানের সামনে সব সময় এ-রকম ভিড়।

সুহাস এগিয়ে যেতে ছেলেরা তার জায়গা ছেড়ে দেয়। দু একটা জলন্ত সিগারেটও আড়াল হয়ে যায়। এটুকু সম্মান আজও সুহাসের এ-পাড়ায় আছে। এককালে সে এখানকার সব কিছুর সঙ্গে জড়িত ছিলো— পাড়ার

ক্লাব-এর সেক্রেটারী, দুর্গাপুজো কালীপুজো কমিটির, বস্তির নাইট-স্কুলের উদ্যোক্তাদের একজন— এমনি আরও কতো কিছু ব্যাপারে—

কিন্তু সে অনেককাল আগেকার কথা। তখন সুহাস কলেজে পড়তো। শেষে পাশ করে চাকরি পাবার পরেও কিছুকাল সে সবকিছু চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তারপর নিজের জীবনে জড়িয়ে একটু একটু করে সরে এসেছে। এখন সব ছেড়ে বজায় আছে শুধু হাল্কা একটা সম্পর্ক তার পাড়ার সঙ্গে— বিশেষ করে পুরানো মানুষদের।

সুহাস দোকানের কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দোকানী ছোট্টুলাল পিছন ফিরে সরষের তেলের টিনের মধ্যে হাতা ডুবিয়ে তেল তুলে একটা কৌটোর মধ্যে ঢালছে। ওদিকে দোকানের বাচ্চা ছেলেটা ঠোঙাতে ডাল ভরে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করছে। সুহাস একটু অপেক্ষাই করবে। ওদের কারও হাতের কাজটা শেষ হলে সে সিগারেটের জন্য বলবে।

সুহাসের ডানদিকে কাউন্টারের বেড়ায় হেলান দিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ সেদিকে পড়তেই মনে হয়— ওকে যেন চেনে সে। কিন্তু কোথায় দেখেছে তা ঠিক মনে পড়ছে না। মেয়েটির খালি পা। একটু ময়লামতো শাড়ি— তবু বেশ ঝকঝকে চেহারা। এ পাড়ারই কোনো বাড়ির মেয়ে হয়তো হবে।

সুহাস তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু সে সুহাসের দিকে হাসিমুখে চেয়ে। মামাবাবু, ভালো আছেন?— সে বলল।

মুহূর্তেই সুহাসের মনে পড়ে যায়— আরে! এ তো— ওর মা সুহাসদের বাড়িতে কাজ করতো। এ তখন খুব ছোটো ছিলো। ইজের পরে খালি গায়ে মায়ের সঙ্গে আসতো। নামটাও মনে পড়ছে— কে, বুটি, না?

হ্যাঁ, ভালো আছি রে— সুহাস প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলে— তোরা সব ভালো তো? তোকে কিন্তু অনেক দিন দেখি নি।

এখানে তো ছিলাম না, ভবানীপুরে কাজ করছিলাম, এখন তো আবার আপনাদের পাড়ায় এসেছি, আজ কদিন হলো— বুটি মুখ ঘুরিয়ে হাত তুলে দূরের কোনো বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলে— ওই বাড়িতে খাওয়া পরায় কাজ করছি।

তোর মা-কেও অনেকদিন দেখি নি। একদিন আসতে বলিস তো।

ছোট্টুলালের তেল মাপা তখনও শেষ হয় নি, সুহাসের গলার শব্দে সে মুখ

ঘুরিয়ে তাকায়, সুহাসকে দেখেই ব্যস্তভাবে কৌটোটা নামিয়ে দুটো প্যাকেট সুহাসের দিকে বাড়িয়ে দেয়। অন্য সব খরিদ্দারকে দাঁড় করিয়ে সুহাসের সিগারেট প্রতিদিনই একটু তাড়াতাড়ি দেয় ছোট্টুলাল— সুহাসকে সে একটু আলাদা খাতির করে। মাঝে মধ্যে টাকায় ঠেকলে সুহাসের কাছে সে বিনা-সুদে ধার পায়— হয়তো সেজন্যই।

সুহাস হাতের এ্যাটাচিটা খুলে একটা প্যাকেট তার মধ্যে ভরে আরেকটা খুলে একটা সিগারেট ওখানে দাঁড়িয়েই ধরিয়ে নেয়। ছোট্টুলাল্ ততক্ষণে খুচরো গুনে ওর হাতের মধ্যে দিয়েছে। সেগুলো পকেটে ফেলে সে বের হয়ে আসে। ছেলেরা পথ করে দিয়েছে আগের মতোই আবার।

সেই ছোট্ট মেয়েটা! বুটি, এখন বড়ো হয়ে কতো বদলে গিয়েছে— ওকে দেখতে আর ঝিয়ের মেয়ের মতো লাগে না— সুহাস ভাবছিল— ওর মা কিন্তু খুব ভালো মানুষ ছিলো— একবার সুহাসের মাইনের টাকা-ভর্তি ব্যাগটা সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিল বাড়ি ফেরার সময়। সেটাকে দেখে সে তুলে এনে ফেরৎ দিয়েছিল— সেই কথাটাও মনে পড়ে যায়। সে নিজে না দিলে সুহাস কিছুতেই বুঝতে পারতো না ব্যাগটা সে কোথায় হারিয়েছে।

সুহাস আর কিছুটা এগিয়ে যেতে রাস্তায় কয়েকটা ছেলে একটু সরে ওকে যেন পথ ছেড়ে দেয়। তাদের মধ্যে থেকে একজন সুহাসের দিকে এগিয়ে আসছে— কুট্টি। ভালো নাম সুব্রত— সুহাসের অনেকদিনের প্রিয় ছেলে এ পাড়ায়।

কিরে কুট্টি ভালো আছিস ?— সুহাস একটু হেসে বলে।

হ্যাঁ, সুহাসদা। একটু আগে আপনার কাছে গিয়েছিলাম, বৌদি বললেন আপনি স্নান করতে গিয়েছেন—

আজ একটু তাড়াতাড়িই গিয়েছিলাম, গাড়িটা আসবে না খবর আসতেই— তা কি জন্যে গিয়েছিলি বল ?

কথা বলতে বলতে ছেলেদের ভিড়টুকু পার হয়ে সুহাস্ থেমে দাঁড়ায়। কুট্টির সঙ্গে তার অনেকদিনের সম্পর্ক। ওর সেকালের ক্লাবের ফুটবল টিমের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কুট্টি। দারুণ খেলতো সেই বয়সে— এখনও গোঁফ দাড়ি ওঠেনি। শিশুর মতো নরম একটা মুখ, তবু চাবুকের মতো শরীর। মুখের ভাবটা এখন বদলে গিয়েছে। একহারা সেই শরীরটা বয়সে ভরাট হয়ে কী সুন্দর না হয়েছে! এ রকমের চওড়া-কাঁধের স্বাস্থ্যবান ছেলে সুহাস বরাবর

ভালবাসে। অফিসে যাওয়ার তাড়া যতোই থাক, ওর জন্তে কয়েকটা মুহূর্ত খরচই করবে সে।

মুখটা একটু অপ্রস্তুত ভাব করে কুট্টি বলে, গিয়েছিলাম বলতে— একটা কিছুতে লাগিয়ে দিন না সুহাসদা, বসে বসে যে পচে গেলাম একেবারে।

ঠিক এইখানে সুহাসের ভয়। ও একটু ভালো চাকরি করে তা পাড়ার অনেকেই জানে। কতো ছেলে যে ওর কাছে আসে— একটা চাকরি করে দিন! একটা কিছুতে লাগিয়ে দিন। কিন্তু কী চাকরি সুহাস করে দেবে? কোথায়?

এ কথার উত্তর সে অনেকবার দিয়েছে। তারই পুনরাবৃত্তি করে যতোদূর সম্ভব মোলায়েম সুরে ম্লান হেসে বলে— আমার তো তেমন কোন ক্ষমতা নেই কুট্টি, না হলে শুধু তোর কেন, এ পাড়ার সব ছেলেরই আমি যা পারতাম করে দিতাম।

একটু থেমে সুহাস আবার বলে— জানিস তো আমি পারচেজ্ অফিসারের পোস্টে আছি। চাকরি দেবার কোনো ক্ষমতা নেই, তবে কেউ কিছু সাপ্লাইয়ের কাজ করলে— মানে আমাদের লাইনের— আর আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে— যে সব জিনিস আমাদের অফিস কেনে—

বিজনেস্?— কুট্টি যেন চমকে উঠে বলে।

এক রকম তা-ই বলতে গেলে, তবু—

কিন্তু আপনার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে অফিসের, না?

না, এমন কিছু নয়, তবু চল, হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলি বরং।

সুহাস চলতে শুরু করে। কুট্টি তার পাশাপাশি চলতে চলতে বলে— ও আমার ক্ষমতায় কুলোবে সুহাস দা?

কেন?

টাকা কই যে বিজনেস করবো?

সব ব্যবসাতে যে টাকা লাগে এমন কোনো কথা নেই। অন্যের দোকান থেকে মাল নিয়ে অর্ডার সাপ্লাই করা যায়, কমিশনড্ এজেন্টের কাজ আছে। ব্রোকারেজ, রিপ্রেজেন্টেটিভ্-এর কাজ আছে— তুই আয় না একদিন আমাদের অফিসে, তোকে বুঝিয়ে দেবো, দেখিয়েও দেবো আমাদের পারচেজ-লিস্ট।

কুট্টির মুখের দিকে চেয়ে সে এবারে একটু হেসে বলে— তারপর সব কিন্তু তোর ওপর। মানে দামে কম্পিটিটিভ্ না হলে, কোয়ালিটি ভাল না হলে আমার আর কিছু করার নেই— কেননা পারচেজ অফিসারের চেয়ারে বসে আমাকে শুধু অফিসের স্বার্থ ই দেখতে হয়—

বলতে বলতে সুহাস থামে— তার মনে হয় একটা কথার উত্তরে সে অনেক বেশি বলে ফেলেছে কুট্টিকে। শেষে কুট্টির দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, অফিসে একদিন আয়, ছাখ আমাদের লিস্ট, তারপরে বলিস—

কবে আসবো বলুন ?

যে-কোন দিন আসতে পারিস, তবে হ্যাঁ, বিকেলের দিকে এলেই ভালো হয়, তিনটের পর থেকে মোটামুটি একটু ফ্রী থাকি—

ঠিক আছে, বিকেলেই আসবো। এখন তাহলে আসি সুহাসদা ?

হ্যাঁ, আয়।

কুট্টি ফিরে চলে আসে ছোট্টুলালের দোকানের সামনে। সুহাস ততক্ষণে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

পাড়ার পরিচিত পথ সে পার হয়ে যাচ্ছে। একটু দূরেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশের বারান্দা থেকে দ্রুতপায়ে নেমে আসছেন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। হাতে সুহাসের মতোই কালো একটা অফিস-এ্যাটাচি। তিনি গাড়ির মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বারান্দায় একটি মহিলাও বেরিয়ে এলেন। তাঁর কোলে ছোট্ট একটি মেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে।

স্টীয়ারিংয়ে বসে বসেই ভদ্রলোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন— আও বেটি, সাথহী লেকর যায়েগা—

মহিলাটি বারান্দা থেকে নেমে বাচ্চাটাকে তাঁর সামনে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক ওকে আদর করছেন। চিৎকারটা থেমেছে। তখনই গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল— আর কী চিৎকার ওই মেয়েটির! মায়ের কোলের মধ্যে আথাল পাথাল করছে— রাস্তায় যেন ছিটকে পড়বে মেয়েটা— সুহাসের ভয় লাগে। কিন্তু না, ভদ্রমহিলা ওকে সামলে বারান্দায় উঠে গেলেন— সুহাস দেখেছে মহিলাটির ঠোঁটে, গালে একটু বেশি রঙ মাখা। মেয়েটির সারামুখ কান্নায় ভেজা— সুহাসের মনে পড়ে তার মেয়ে রিনকুর কথা। একটু আগে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে তার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময়।

গাড়িটা অনেক এগিয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা বাচ্চাটিকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন হয়তো, তবু তার কান্নার শব্দ সুহাস এখনও শুনতে পাচ্ছে। রিনকু কী কাঁদছে এখনও ? না, সুস্মিতা তাকে ভোলাতে পেরেছে ?

সামনের রাস্তাটা প্রায় সবটা জুড়ে দাঁড়িয়ে একটা লরি ইট খালাস করছে। ইটের ধুলো উড়ছে দেখে মাথা বাঁচানোর চেষ্টায় সুহাস পথের অন্য পাশে চলে এল.

কিন্তু থেমে দাঁড়াতে হলো। উল্টো দিক থেকে একটা রিক্সা ঠিক সেই সময়েই ঢুকে পড়েছে। লরিটার পিছনের দিকে সরে এল সে। রিক্সাটা পার হয়ে যেতে আবার এগিয়ে গেছে— সামনেই একজন চেনা মানুষ— সত্যসন্ধবাবু। লাঠি হাতে পথের দিকে চোখ রেখে তিনি আস্তে আস্তে হাঁটছেন।

সুহাস বলে ওঠে, কাকাবাবু, ভালো আছেন?

হ্যাঁ বাবা— তিনি যেন অভ্যাসের সুরেই বলেন, তারপর চোখ তুলে সুহাসের মুখে তাঁর পুরু চশমার দৃষ্টি ফেলে বলেন— কে, সুহাস না?

হ্যাঁ কাকাবাবু—।

সে থামতেও যাচ্ছিল। তখনই মনে পড়ে যায় আফিসের কথা— না, এখন আর দাঁড়ানো চলবে না। তাঁকে পার হয়ে সে আবার হাঁটতে থাকে। চেহারাটা বড্ডো খারাপ হয়ে গেছে সত্যসন্ধবাবুর। তাঁদের বাড়িতে সে অনেকদিন যায় নি— খুব ভালো মানুষ— সুহাসকে খুবই ভালোবাসতেন। এবারে শিগগিরই একদিন ওঁদের বাড়িতে যাবে সে। কিন্তু কবে? সামনেই তো পুজোর ছুটি আসছে। ছুটি হোক— তার মধ্যে যে কোন একদিন যাবে—

সামনের মোড়টা ঘুরে বাঁদিকে ফিরতেই আর একটা বাধা। ছেলেদের ফুটবল খেলা হচ্ছে রাস্তার ওপরে— শুধু পেনাল্টি-কিক্-এর খেলা। দুটো ইট রাস্তাটার দুদিকে বসানো। মাঝখানে একজন গোলকীপার হাঁটু ভাঁজ করে দু-হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে— তার উল্টো দিকে আরেকটি ছেলে বল মারতে উদ্যত। ঠিক এখনই ওখানটায় ঢোকা উচিত নয়। সুহাস থেমে দাঁড়াল— সট্‌টা হয়ে যাক, তারপরে সে যাবে।

পিছনের দিকে উৎসাহী দর্শক অনেক ছোটো বড়ো ছেলে। সুহাসও ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। সট্‌টা মারা হলো ঠিক তখনই, আর চমৎকার একটা গোলও হয়ে গেল সুহাসের চোখের সামনে। বলটা ওর গা ঘেঁষে চলে গেছে। সুহাস আবার দ্রুতপায়ে চলতে শুরু করে। গড়িয়াহাটায় প্রায় পৌঁছে গিয়েছে সে।

ওই ছেলেগুলোর একজনকেও সুহাস চেনে না। পাড়ার এ দিকটায় সবই নতুন নতুন বাড়ি। ঠিক এখানেই সেই বিশাল মাঠটা ছিলো— সুহাসের মনে পড়ে— একটা বড়ো পুকুরও ছিলো উত্তরের কোণে। সুহাস তাতেই সাঁতার কাটা শিখেছিল। মাঠে ওরা ফুটবল খেলতো। ক্রিকেটও। তার আগে

খুব ছেলেবেলায়— ঢিল্ ঢিল্ ঢিলোরিয়া। আরও এক নাম ছিলো সেই খেলাটার —চোর পুলিশ খেলা।

চোরেরা ঢিলোরিয়া শব্দ তুলেই দূরে পালিয়ে যেতো। শব্দের নিশানা ধরে পুলিশ ছুটে এসে তাদের দেখতে পেতো না, তখনই দূর থেকে আবার শব্দ উঠতো— ঢিল্ ঢিল্ ঢিলোরিয়া। কিন্তু ওরকম শব্দ করে পালানোর মানে কিছু ছিলো? না, সত্যিকারের চোরদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব?

কথাটা মনে আসতে সুহাসের একটু হাসি পায়, তবু বিষণ্ণও লাগে সেই দিনগুলোর জন্যে, যখন মানে না ভেবে যা খুশি সে করতে পারতো— কোন মানে খোঁজার বয়সও তখন নয়। সুহাসের সে সময় বয়স কতো? ও তো আজন্ম এখানেই কাটিয়েছে— এ-পাড়ায় তার শৈশব বাল্য কৈশোর সবই কেটেছে। এই শহরে।

কী হয়ে গিয়েছে আজ সেই শহরটা। ছেলেদের এখন রাস্তার মধ্যে খেলতে হয়। ক্রিকেট তো সব পাড়াতেই রাস্তায় খেলা চলছে। ফুটবল আজ প্রথম দেখল সুহাস।

দাদা আজ হেঁটে যাচ্ছেন যে?— একটা প্রশ্ন শুনে সুহাস তাকিয়ে ছাখে— ওদেরই পাড়ার বীরেন ওকে প্রশ্নটা করছে। রাস্তার একধারে বস্তা বিছিয়ে সে আলু সাজিয়ে বসে আছে। সুহাসের চোখ তার দিকে পড়তে সে বলে— অফিসের গাড়ি আসে নাই আপনার?

না— সুহাস বলে। তারপর প্রথামতো প্রশ্ন করে— তোমাদের খবর সব ভালো তো বীরেন?

মুখভর্তি এক বিনীত হাসি নিয়ে সে উত্তর দেয়— হ্যাঁ, সব ভালোই দাদা আপনাদের দয়ায়—

সুহাস বীরেনকে পার হয়ে চলে এসেছে। বীরেনের কাছে আলু সে একদিনও কেনে নি, তবু সে বলল— আপনাদের দয়ায়। কিসের দয়া ওকে সে দেখিয়েছে কবে? দয়া কেউ কাউকে করে না— শুধু বিনয়ে ভদ্রতায় মানুষ সে কথা বলে।

দূর থেকে একটা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে সুহাস ছুট দিয়ে সেটাকে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে একজন ওটার দরজা খুলে বসে পড়ল সুহাসের সামনেই। শুধু একটু খানির জন্যে ট্যাক্সিটা ধরতে সে পারলো না।

এবারে ফুটপাথের পাশ ঘেঁষে সে এমন ভাবে দাঁড়াল যাতে সামনের অথবা

পিছনের যে কোন রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি বেরিয়ে আসলে তার চোখে পড়ে যায়। কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি? সুহাস হাতঘড়ির দিকে দেখল—সোয়া নটা। আশা এখনও আছে। তবে বড়ো জোর আর পনেরো মিনিট। সতর্কভাবে সব দিকে চোখ ঘুরিয়ে সে দেখতে লাগল। ওদিক থেকে কে আসছে ওই মেয়েটি? সত্যসন্ধবাবুর মেয়ে টুনু, না? হ্যাঁ, সে-ই তো। হাতে একটা র‍্যাশনব্যাগ ঝুলিয়ে টুনু সুহাসের দিকে এগিয়ে আসছে। মাটির দিকে চোখ তাকিয়ে হাঁটছে সে। কাছাকাছি এসে চোখ তুলল একবার, সুহাসকে দেখেই বলে উঠল— সুহাসদা ভালো আছেন?

হ্যাঁরে টুনু। তুই?

আছি একরকম—

তা এতো সকালে কোথায় বেরিয়েছিলি?

সুহাস এই প্রশ্নটা করতো না তার থলির দিকে তাকালে। টুনু যে বাজার করতে বের হয়েছিল তা ওর হাতের থলি থেকে বেরিয়ে থাকা মুলো, শাকের পাতা দেখেই বুঝতে পারা যায়। তবু করতোও হয়তো — কেননা কোথায় সেই ঢাকুরিয়ার বাজার প্রায় ওদের বাড়ির কাছাকাছি। আর এ তো গড়িয়াহাটা পুলের কাছাকাছি— একেবারে উল্টোদিকের জায়গা।

বাজার শেষ করে একটা ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছিলাম।

ওষুধ! কেন কার অসুখ?

বাবার জন্যে, অসুখ কিছু নতুন করে নয়, তবু বারোমাসই ওষুধ চলছে, জানেন তো হার্টের অসুখে ভুগছেন, সেবারে সেই স্ট্রোক হবার পর থেকেই—

একটু আগেই তো তোর বাবার সঙ্গে দেখা হলো।

বাবা! বাবাকে দেখলেন? ঠিক কোথায় বলুন তো?

টুনুর কথার মধ্যে একটু চমকে ওঠার সুর শুনে সুহাস কিছুটা অবাক হয়ে বলে— ওই তো সেই রাস্তায় যেখানে ইট পড়ছে, ভেতরের দিকে বাড়ি হচ্ছে, ওখানেই—

টুনু আর প্রশ্ন করে না। কী যেন ভেবে সে গম্ভীর হয়ে গেছে— সুহাসের মনে হয়। কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে সে বলে— বাজারেই হোক, আর ওষুধ কিনতে হোক, তুই কেন রে টুনু— তোর দাদা থাকতে?

দাদা! কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই টুনুর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে, তারই মধ্যে ক্লান্তস্বরে সে বলে— ওর কথা আর বলবেন না সুহাসদা—

কথা বলতে বলতে সুহাসের চোখদুটো রাস্তার দু দিকে ট্যাকসির খোঁজ করেই যাচ্ছিল। দূরে ওই ট্যাক্সিটা কী খালি? না— একটু অন্যমনস্ক হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে সুহাস আরেকটা প্রশ্ন করে— কী পড়ছিস এখন? কোন কলেজে?

কলেজে!

টুনুর সেই একটা কথার মধ্যে এমন এক তীক্ষ্ণ সুর, পাল্টা প্রশ্ন আর চমকে ওঠার ধ্বনি আছে যা সুহাসকেও চমকে দেয়। সে চোখ ফিরিয়ে টুনুর দিকে তাকায়। তীব্র একটা আঘাতের চিহ্ন সরে গিয়ে যেন বিষণ্ণতার ভাব ফুটে উঠছে— খুব আস্তে নিচু গলায় সে এবারে বলছে— কলেজ কোথায় সুহাসদা, আপনি জানেন না, যে আমি পড়া ছেড়ে দিয়েছি?

সে কি রে! পড়া ছেড়ে দিয়েছিস?

হ্যাঁ, সে তো অনেকদিন। তা প্রায় চার বছর হয়ে গেল—

কি করে জানবো বল? তোদের বাড়িতে তো অনেকদিন যাই না— সুহাস একটু কৈফিয়তের সুরে বলে। আর কোনো প্রশ্নও করতে সে চায় না। একটু আগে সে সত্যসন্ধবাবুকে দেখেছে, তখন তাড়াতাড়িতে খেয়াল করে নি, এখন মনে পড়ছে, বেশ ময়লা একটা খাটো ধুতি আর একটা আধময়লা ফতুয়া তিনি পরেছিলেন, তাঁর ছেলে টুকলাকেও দেখেছে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রতিদিনের মতো— সে যে কিছু করে না তা তো জানাই কথা, তারপর টুনুর এই পড়া ছেড়ে দেওয়া— সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অনুমানই করা যায়। আর, লাভই বা কী আরও বেশি শুনে? শুধু একটু সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিছুই কি করতে পারে সে?

টুনু সুহাসের মুখের থেকে চোখ নামিয়ে বাজারের থলিটা হাত-বদল করে নেয়, তারপরে বলে— আচ্ছা, আমি এখন আসি সুহাসদা?

হ্যাঁ, আয়— সুহাস বলে একটু স্বস্তির সুরে যেন—

টুনু ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। সুহাস ট্যাকসির খোঁজে রাস্তায় চোখ বুলিয়ে আরেকবার টুনুর দিকে তাকায়। টুনু একটু দূরে চলে গিয়েছে। বেশ সুশ্রী একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে যেন প্রায় একজন মহিলার মতো ধীর চালে হাঁটছে। হাতে বাজারের থলি— মুলোর পাতাগুলো তার ওপরে বের হয়ে আছে।

এমনি ভাবে দূর থেকে দেখা শুধু ভালো। তার চেয়ে বেশি জানতে গিয়ে

একটু ভুলই করেছে সে। এই সকাল বেলায় অফিসে বেরোনোর সময়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল—

যখন কিছু পাওয়ার থাকে বেশি খুঁজতে হয় না। সুহাসের পিছন দিক থেকে একটা ট্যাকসি এসে তার পাশেই থেমেছে। ড্রাইভার ডাক দিয়ে বলে—কাঁহা যাইয়েগা সাব, ডালহৌসী?

ট্যাকসিটা চলতে শুরু করেছে। সুহাস ভাবছে টুমুর কথা— সেই ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটা! পড়াশোনায় ভালো ছিলো, ভাল গান গাইতো। নাচে তো খুবই ভালো— সেবারে পাড়ার পুজোর প্যাণ্ডালে ওর নাচ দেখে বাইরের একটা দল ওকে নেবার জন্যে সুহাসকেই ধরেছিল। রাজি হন নি সত্যসন্ধবাবু। তাঁর উত্তরটা আজও মনে আছে— নাম হবে, টাকা পাবে। এ তুমি কি বলছো সুহাস? মা সরস্বতীর সাধনার মধ্যে লক্ষ্মীর কথা ভাবতে হবে।

শুনে লজ্জা পেয়ে সুহাস চুপ করে গিয়েছিল।

টুমু বেশ ভালো আবৃত্তিও করতো—

সেই টুমু আজ পড়া ছেড়ে দিয়েছে চার বছর। তার মানে, হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল এ-সব দরজাও পার সে হয় নি। বিয়ে তো হয় নি— বাড়িতে বসে বসে ও তবে করছে কি? ঠিক বসে অবশ্য বলা যায় না— টুমু তো বাজার করছে, বাবার ওষুধ কিনে আনছে— এগুলো ভালো— মেয়েদের সব বাইরের কাজে এগিয়ে আসতে দেখলে সুহাসের ভালো লাগে। তবু শুধু ওটকুতে টুমুকে যেন মানায় না। নাচ গান আবৃত্তি এসবেও যদি বা হতো তাহলে শুনে খুশি হতো সুহাস।

ও-সব গুণগুলো টুমু তার বাবার কাছে পেয়েছিল। সত্যসন্ধবাবুর মধ্যে সুরের ব্যাপার সব রকমই ছিলো—উনি গান করতেন, আড়বাঁশী বাজাতেন। সেই সূত্রেই— সুহাসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সুহাসেরও শখ হয়েছিল বাঁশি বাজানো শেখার— গিয়েছিল ওঁদের বাড়িতে। বাঁশি বাজানো সুহাসের খুব বেশি দুর এগোয়নি, তবু আসা যাওয়ার ফলে সত্যসন্ধবাবুকে সে কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিল— চিনতেও পেরেছিল।

আজ যে মানুষটাকে দেখে একটু আগে সে— কাকাবাবু, ভালো আছেন? বলে তারপর প্রায় পাশ কাটিয়েই চলে এসেছে— তাঁর ওই হাতে লাঠি আর চশমার মধ্যে হলদে কোঁচকানো চোখদুটো দেখে কে চিনতে পারবে সেদিনের গানে আর সুরে উচ্ছল সেই উজ্জল মানুষটাকে?

সত্যি, এরকমও বদলে মানুষ যায়।

সুহাসও বদলে গিয়েছে অন্য রকম ভাবে। ওর গলায়-বাঁধা ডবল নট্-এর এই টাই আর বিদেশী যে টাইপিনটা বুকের ওপরে ঝুলছে— তার নীচে যে টেরিলীনের প্যাণ্টটা চৌরঙ্গীর গোলাম আহম্মদের দোকানে তৈরি করানো— এ-সব শরীরে নিয়ে ও কী আজও সেই সুহাস যে কলেজে পড়তে নিজের হাতে কাচা আর ইস্ত্রী করা জামা কাপড় পরতো? যে বস্তির একটা ঘরে চাঁদা তোলা টাকায় স্কুল তৈরি করে রোজ সেখানে পড়াতে যেতো সন্ধ্যায়? যে সেদিন এ অঞ্চলের প্রতিটি কাজের মধ্যে থাকতো?

সেই সুহাসও আর কোথাও আজ নেই।

ট্যাক্‌সিটা এবারে পার্ক স্ট্রীটের ওপর দিয়ে চলছিল। এতো পথ কখন পার হয়েছে সুহাস তা খেয়ালই করে নি, ট্যাকসিটা হঠাৎ থেমে দাঁড়াতে তাকিয়ে দেখল— ওয়েলেসলী। বাঁদিকে উড্ স্ট্রীটের মোড়। সামনে ট্র্যাফিকের লাল আলো জ্বলছে। বাঁ-দিকের ফুটপাথের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একজন লোক— ময়লা পাজামা, তার চেয়ে একটু পরিষ্কার সাদা সার্ট— মুখটায় যেন কতোকাল আগেকার কোন্ চেনা মুখের আদল।

কোথাকার চেনা? কবেকার? সুহাস তার স্মৃতির মধ্যে খুঁজছিল। হঠাৎ মনে পড়তে চেঁচিয়ে ওঠে— কে? অনুপ না?

শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেছে সে। হ্যাঁ, অনুপই। সুহাসের ভুল হয় নি। আবার সে চেঁচিয়ে ডাক দেয়— এই যে এদিকে— এই অনুপ!

শূন্য একটা দৃষ্টি সুহাসের মুখের ওপরে থেমে যেন বিস্ময় নিয়ে খুঁজছে— সুহাস গলা চড়িয়ে ডাকে— আয়, শিগ্‌গির উঠে আয়।

কিন্তু সে তখনও একই ভাবে চেয়ে আছে।

ট্রাফিকের লাল বদলে গিয়ে হলুদ আলোটা জ্বলে উঠেছে, ড্রাইভারও পিছনে মুখ ঘুরিয়ে ট্যাকসি ছাড়ার অনুমতির অপেক্ষায়, সুহাস আর অপেক্ষা না করে দ্রুত হাতে দরজাটা খুলে বলে— থোড়া রোকনা ভাইসাব্। পরমুহূর্তে ফুটপাথে সেই অবাক মানুষটার হাত ধরে টান দেয়— আয়, উঠে আয়, তাড়াতাড়ি—

সে যেন সুহাসের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাকে গাড়িতে টেনেও তুলেছে সুহাস, তবু তার মধ্যে পিছনের গাড়িগুলোর

হর্ন-এর শব্দে ভরে গিয়েছে বাতাস— তাদের সব ব্যস্ততাকে আটকে ধরেছে সামনের যে ট্যাকসিটা তাকেই তীব্র চিৎকারে শাসন করছে সবাই।

এতো শব্দের মধ্যে তবু সুহাসের সামনে স্তব্ধ এক কবেকার অতীত— এ-সেই অনুপ।

সুহাস ট্যাকসিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভার দ্রুত গীয়ার ফেলে এ্যাকসিলেটরে চাপ দিল। ছিটকে একটা লাফ দিয়ে যেন পিছনের জায়গা সে খালি করে দিয়েছে। তবুও পিছনে তখনো হর্নের শব্দ চলেছে—পার্ক স্ট্রীট্ ওয়েলসলী উড্ স্ট্রীট সব মুখরিত হয়ে আছে। সেই সব শব্দের মধ্যে গলা একটু চড়িয়ে সুহাস বলে— কি রে, চিনতে পারছিস না তো। কিন্তু তোকে আমি ঠিক চিনেছি কিনা বল?

দরজার ধার ঘেঁসে বসা সেই মানুষটার চোখে মুখে তখনও বিস্ময়— তার মনের মধ্যে সন্ধান যেন চলেছেই— সে বলে ওঠে, আপনি?

এখনও চিনতে পারলি না? আমি সুহাস।

বলতে বলতে তার কাঁধটা ধরে ঝাঁকুনি দেয়— বল, কেমন আছিস? ওঃ, কতোকাল পরে দেখা।

এবারে সুহাসকে সে চিনেছে— চোখে মুখে পরিচয়ের ঝলকে-ওঠা আলো— ও, তাই বল।

ভালো আছিস? সুহাস আবার বলে—,

হ্যাঁ, ভালোই। তুই?

আছি একরকম— সুহাস উত্তর দেয়— কিন্তু, আশ্চর্য, তুই আমাকে চিনতে পারলি না অনুপ?

এ কথাটা সুহাস বলতেই পারে। মাঝখানের পনেরো বছরের ব্যবধানেও তাকে চিনতে না পারার মতো বদলায় নি সে। শরীরটা এখন একটু ভারি হয়েছে, মুখে গালে আরেকপ্রস্থ মাংসও লেগেছে, চোখে একটা চশমা— তবু অনেকেই বলে, সুহাস আজও সেই একই রকম রয়ে গেছে।

অনুপ বদলেছে অনেক। প্রথমে তো পোশাক, তারপরে মুখ— কোথায় তার সেই কালো রংএর মুখে আলো-জ্বলা সেই দুটো চোখ যা সুহাসদের সবাইকার ঈর্ষার বিষয় ছিল? মুখের চামড়াটা আজ ফ্যাকাসে, শিথিল। চোখ ঘোলাটে— তারই কোল ঘেঁষে কতো অগুনতি সরু মোটা খাঁজ। ওর একহারা শরীরের সেই টান বাঁধুনিটাও কোথায় চলে গেছে। সুহাসের সামনে আজ এই আধময়লা

পোশাকপরা অন্তত এক হপ্তা আগে দাড়ি কামানো ভাঙা চেহারার মানুষটাকে দেখে কে চিনতে পারবে সেদিনের সেই অনুপকে ?

তবু সুহাস চিনেছে ওর চোখের ওপরে মাঝখানে ঠেকে-যাওয়া জোড়া ভ্রূ আর ডানদিকে কপালের ওপরে সেই কাটা দাগটা দেখে। ওটার ইতিহাস সুহাসের জানা। ঘটনাটা তার চোখের সামনেই ঘটেছিল।

অনুপ এখন সুহাসের সারা দেহের ওপরে চোখ বুলিয়ে দেখছে। সুহাস যা দেখার দেখেই নিয়েছে। সে বলে উঠল— বল, কী করছিস এখন ?

বলতে গেলে কিছুই প্রায় নয়।

তার মানে ?

মানে, বলার মতো এমন কিছু নয়—কখনো এটা কখনো ওটা, বেশির ভাগই দালালী— জমির, বাড়ির, কখনও বা অন্যকিছুর—

দালালী তো ভালোই একটা লাইন—

অনুপ একটু ম্লান হাসি হাসে— হ্যাঁ, খুবই ভালো। তা তুই কী করছিস— বিজনেস্ ?

না রে, একটা চাকরিতেই আছি আমি।

বলতে বলতে আরেকটা কথা যেন মনে পড়েছে— বিয়ে করেছিস ? সেই অলকাকে ? অলকা কেমন আছে ?

বিয়ে আমি কাউকেই করি নি—

বলিস কিরে। ত' হলে অলকার—

অনুপ ধীরে মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে— ওকথা বাদ দিয়ে অন্য কিছু বল।

তবুও সেই একই কথা আবার বলে সুহাস— অলকা কেমন আছে ? সে— তার—

চলন্ত ট্যাকসির শব্দে কিছু কথা হয়তো শোনা যায় নি, বাতাসে কিছুটা উড়েও গিয়েছে হয়তো বা— সুহাস শুধু দুটো মৃদু শব্দ শুনতে পায়— অলকা নেই—

নেই। কী বলছিস তুই অনুপ ? সুহাস প্রায় চিৎকার করে ওঠে— কোথায় নেই ?

অনুপ মুখ ঘুরিয়ে বলে— অতো চেঁচাস না সুহাস। চেয়ে ছাখ, চারপাশের সব লোক চোখ কান দিয়ে গিলছে।

সুহাস চোখ ফিরিয়ে ছাখে দু পাশে গাড়িগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটা মুখ বেরিয়ে এসেছে— সবারই চোখে যেন একই কৌতূহলের রঙ। তবু তাতে কী আসে যায় ওর। সে আরও চেঁচিয়ে বলবে, আবার বলতে যায়, কিন্তু উত্তর আসে তার আগেই— নেই মানে নেই, কোথাও নেই—

লাল অলোটা সরে যেতে এখন সব গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করেছে। পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর মোড়। বাঁ দিকে গান্ধীজী লাঠি হাতে চলেছেন। সুহাস চলছে অফিসের পথে— গাড়িটা ময়দানের রাস্তায় ঢুকল, তখনই অনুপ বলে ওঠে— ট্যাকসিটা থামা, আমি এখানেই নামবো।

অলকা নেই। মানেটা বুঝতে পেরেছে সুহাস— অলকা নেই মানে সে কোথাও নেই।

সুহাসকে নিরুত্তর দেখে অনুপ বলে ওঠে— এই ট্যাকসি, রোকো ইহাঁ।

ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়িটাকে বাঁদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সুহাস বলে ওঠে— কী হয়েছিল অলকার ?

সে অনেক কথা, আজ নয়, যদি আর কোন দিন দেখা হয় তবে বলবো—

কেন এখন বলতে ক্ষতি কী ?

অনুপের চোখে মুখে বিরক্তির স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সে বলে— বলছি আজ নয়। আমার কাজ আছে—

সেটা কী খুবই জরুরী ? না হলে চল না আমার অফিসে একটু—

কাজ ? হ্যাঁ, তা আছে, কিন্তু ঠিক সেজন্যে নয়, আমার এখানেই নেমে যাওয়া ভালো।

এত হেঁয়ালি সুহাসের সহ্য নয় ঠিক এই সময়— কাজ আছে, তবু সেজন্য নয়। অলকা নেই, তবু তার কী হয়েছিল তা বলবে না। সুহাস আর একটুও পেড়াপেড়ি করবে না। মনের বিরক্তিটা প্রকাশ করতেই সে যেন খুব শান্তভাবে নিচু গলায় বলে— ঠিক আছে। তাই বরং যা—

অনুপ কোন উত্তর দেয় না।

সুহাস ছাখে সে নেমে যাওয়ার জন্য তৈরি। ওর বিরুদ্ধে উম্মাটা সুহাসের তোলাই থাক এখন। অনুপ চলে যাবার আগে অন্তত আর একবার দেখা হওয়ার সূত্রটা না রেখে দিলে খুবই ভুল করা হবে। তাই এ্যাটাচিটা খুলে সে নিজের একটা নেম-কার্ড বের করে অনুপের হাতে দেয়— এইটে রেখে দে, আমার ঠিকানা ফোন-নম্বর সবই আছে, যদি কোন দিন দেখা করতে চাস—

একটু থেমে সে আবার বলে— এবারে তোর ঠিকানাটা বল, লিখে রেখে দিই—

আমার ঠিকানা আমি কাউকেই দিই না— অনুপ বলে। সে নীচের দিকে তাকিয়ে পা ঘষছে ট্যাকসির মেঝেতে। এবারে সীট ছেড়ে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে গিয়ে সুহাসের চোখের সামনে এক পাটি জুতো তুলে ধরে বলে— ছাখ, এই জন্তে তোর অফিসে গেলাম না। শালা এই গিঁটটা মাঝে মাঝে এমন খুলে যায়।

সুহাস দেখল সেই জুতোটার দিকে। ওটা একটা সরু সরু স্ট্র্যাপ্ দেওয়া কাবলি জুতো ছিলো। গোড়ালির দিকটা চেপটে এখন একটা চটিজুতো— কিন্তু বড্ডো পুরনো। ওপরের দুটো স্ট্র্যাপ বেরিয়ে এসেছে— সে দুটোকে একটা তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেটাই খুলে গিয়েছে আবার। জুতোটার সোলের চামড়া আঙুলের জায়গাগুলোতে ক্ষয়ে গিয়ে নীচেকার সাদা রবারের রঙ বেরিয়ে এসেছে।

অনুপ সুহাসের সামনেই তারটা আবার আটকে নিয়ে বলে— পারতিস আমাকে তোর অফিসে নিয়ে যেতে? কেউ জিগ্যেস করলে পরিচয় দিতে পারতিস? কী বলতিস— বন্ধু?

কথা শেষ করে অনুপ চলে যাচ্ছে। সুহাস পিছনে ডেকে বলে— না আসতে চাস, ফোন করিস যেন—

অনুপ ফিরে দাঁড়ায়।

সুহাস বলে— কবে করবি বলে যা।

এতক্ষণে প্রথমবার একটু নরম স্বরে উত্তর আসে— তার কোনো ঠিক নেই, তবে করবো একদিন—

আর কোনো কথা না বলে অনুপ আবার হাঁটতে সুরু করে। সুহাস চেয়ে থাকে তার দিকে। অনুপের হাঁটার চালটা কিন্তু সেই আগেকার মতোই আছে। আর ওই তার-বাঁধা জুতোটাও পায়ে যেন এতোটাই সহজ যে হাঁটার ভঙ্গিতে তার একটুও বেচাল নেই।

অব ছোঁড়ে সাব্?

ট্যাকসি ড্রাইভারের গলার শব্দে সুহাস চমকে উঠে বলে— হ্যাঁ চলিয়ে—

॥ দুই ॥

সুহাস দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বুটি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল একটু। তারপর ছোট্টুলালের দিকে ফিরে বলল,— পঁচিশ পয়সার সোডা দিও, একটা দেশলাই, আর— হ্যাঁ, গুঁড়ো হলুদের প্যাকেটও একটা—

বুটির তেলের কৌটোটা তুলে নিয়ে ছোট্টুলাল আবার তেল ভরছে। কৌটোটার গা বেয়ে তেল গড়িয়ে পড়ছে। না, ঠিক সময়ে ছোট্টুলালটা আঙুল দিয়ে আটকে দিয়েছে—

সুহাসকে বুটি মামাবাবু বলতো সে কথা ওর ঠিক মনে আছে। যখন সে ইস্কুলে ভর্তি হয় মা মামাবাবুকে বলতে তিনি ওর বই কিনে দিয়েছিলেন। শুধু সেবারে নয়, তার পরের বছরেও। সেই দু-বছর বুটি ইস্কুলে পড়েছিল। তারপর ছেড়ে দিয়েছে। আজ যদি সে পড়তে পড়তে এগিয়ে যেতো তাহলে সে তো কলেজেই পড়তো, না ?

কলেজে। ভাবতে একটু হাসি পায়। দুঃখও লাগে। বুটি কলেজে পড়লে বাবুদের বাড়ির কাজ কে করতো ? কে এখন তেল সোডা দেশলাই—

হঠাৎ ছোট্টুলাল ওজন করে দেখাতে যায়। শেষে ঠোঙায় আরও একটু ভরে বলে— খুব হিসাব তো দেখি তোর।

এই খবর্দার। তুই বলবে না বলছি—

ছোট্টুলাল যেন তার মুখের ওপরে একটা চড় খেয়ে হঠাৎ চুপ করে গেছে। নিরুত্তরে সে সব জিনিষগুলো এক এক করে ঠোঙার মধ্যে ভরে। বুটির হাত থেকে ধারের খাতাটা নিয়ে জিনিসগুলো লিখে সেটা ফেরৎ দিয়ে দেয়।

বুটি বের হয়ে আসে ছেলেদের ভিড়ের মধ্যে পাশ কাটিয়ে।

উঃ, ছোট্টুলালটা যা দেরি করে দিলো এই কটা জিনিষ দিতে। আজ বলবে গিয়ে গিন্নীমাকে। বুটিকে আবার তুই বলে কথা বলতে এসেছে। দিয়েছে ওকে ঠিকমতো শুনিয়ে। তুমি আছো দোকানদার— আছো ? জিনিস দেবে, হিসাব করে পয়সা নেবে। দেবে বুটির বাবুরা যেখানে সে কাজ করে। তবে কে তুমি তুই বলার ? তোমাদের বাড়িতে কাজ করি নাকি আমি, এঁ্যা ?

বুটি মনে মনে একটু হেসে বলে— তুমি একটা জোচ্চোর। একটু অন্য দিকে তাকিয়েছি, আর অমনি সোডাটা ঠোঙায় মুড়ে ফেলছিলে। সেটা আবার ওজন করে দেখানো! কী হলো ওজনে?

বুটি বাড়ি ঢুকতেই গিন্নীমা বলেন— এতো দেরি! বাসনগুলো সব এখনও পড়ে, রান্না এদিকে হয়ে এলো আমার— দে মা, তেলটা এখানেই নামিয়ে দে—

বুটি সব জিনিসই নামিয়ে দেয়। শুধু সোডার ঠোঙাটা সরিয়ে রাখে— ওটা একটু পরে কাপড় কাচতে বুটির নিজেরই লাগবে।

রুটি দুটো এবারে খেয়ে নে। সেই কোন সকাল থেকে বলছি তোকে—

গিন্নীমা বলেছেন ঠিকই। কিন্তু সময় বুটি কখন পেয়েছে? সকালে সারা বাড়ি ঝাঁট দিয়ে, উঠোন ধুয়ে, গিন্নীমার ছাড়া কাপড়গুলো কেচে শুকোতে দিয়ে সে কয়লা ভেঙেছে, উনুন ধরিয়েছে, গোয়ালা দুধ দিয়ে যায় নি বলে চায়ের দুধের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে আরেকটা গোয়ালাকে ধরে কিনেছে। তারই মধ্যে বড়দা-বাবুর বাজারে যাবার সময়— তাঁকে তৈরি দেখে সে তাড়াতাড়ি করে তাঁর সঙ্গে বেরিয়েছে। তারপর বাজার থেকে ফেরার পরে গোয়ালার খাটালে গিয়েছে— ফেরা মাত্রই তো সে ছোট্টুলালের দোকানে গিয়েছিল। এর মধ্যে সময় ও কখন পেয়েছে যে একটু বসে রুটিগুলো খেয়ে নেবে? অথচ ক্ষিদেয় বুটির পেট যে সেই সকাল থেকে কী রকম জ্বলছে তা সে ছাড়া আর কে জানে!

রান্নাঘরেরই একপাশে একটা এ্যালুমিনিয়ামের থালায় ওর খাবার খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা। থালাটা তুলে সে কাগজটাকে সরিয়ে নিল— সঙ্গে সঙ্গেই গিন্নীমার ধমক— কিসের না কিসের হাত! বাইরে থেকে এলি, হাত না ধুয়েই তুই খাবি নাকি?

এমনি শিক্ষা এ বাড়িতে আসা থেকেই উনি দিচ্ছেন। খাবার আগে হাত বুটি ধুয়েই নিতো। তবু ভালো এক রকম গিন্নীমার ওই কথাগুলো। এতে কিছু শেখা যায়। বুটির স্কুলের পড়া হয় নি, তবুও এবাড়ি ওবাড়িতে কাজ করে সে অনেক শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু একটা মুস্কিল— সেটা হলো এই যে এক বাড়ির শিক্ষা আবার অন্য বাড়িতে চলে না। সব বাড়িরই নিজেদের এক একটা ধরন আছে, যা অন্য বাড়িতে খাটে না। এর আগে বুটি যে বাড়িতে কাজ করতো সেখানে এ-বাড়ির থেকে কতো তফাৎ। সে-বাড়ির গিন্নী সব সময় জুতো পরে রান্না ঘরে যেতেন, জুতো পরে শোবার ঘরেও—

তা যদি এই গিন্নীমা দেখতেন?

এ গিন্নীমার কিন্তু একটু বেশি যেন ছুঁই ছুঁই বাই। একটা শব্দ বুটি জানে এই ব্যাপারে। মনে মনে নিঃশব্দে একটু হেসে সে শব্দহীন বলে— ছুঁচিবাই।

ততক্ষণে হাত ধুয়ে থালাটা নিয়ে সে রান্নাঘরের বারান্দার মধ্যে বসেছিল। রুটিগুলোকে উল্টে দেখামাত্রই বুটির মনটা খারাপ হয়ে যায়— আজও বাসি রুটি! গিন্নীমা বলেছেন— দুটো, কিন্তু একটা বেশি— তিনটে। তবু ওপরেরটা ছাড়া বাকি দুটোই কাল রাত্তিরের— শুকিয়ে একেবারে কাঠের মত শক্ত খড়খড়ে হয়ে আছে। তরকারিটা পেঁপের— এটাই চলছে রোজই। কিন্তু— রঙটা যেন একটু বেশি সাদা। তবে কী?—

সন্দেহটা হতেই থালাটা তুলে সে নাকের সামনে ধরে। এঃ! এতো একেবারে গন্ধ হয়ে গেছে! এটা কী রাত্তিরের? রাত্তিরে বুটি এখানে খায় না — কী রান্না হয় তা ঠিক জানে না। কাল দুপুরে তো পেঁপের তরকারীই রান্না হয়েছিল— তবে কী সেটাই? তা না হলে আর এতো গন্ধ বেরোয়? এখন তো তেমন আর গরমকাল নয় যে রাত্তিরেরটা এর মধ্যেই এ-রকম হয়ে যাবে।

রুটিগুলো হাতে তুলে সে কলঘরে চলে যায়। থালাটা উল্টে নর্দমায় খালি করে কলের জলে ধুয়ে নেয়। বেরিয়ে এসে ভাবে এবারে রুটিগুলো সে কি দিয়ে খাবে। গিয়ে বলবে নাকি গিন্নীমাকে অন্ত কিছু দিতে?

এই একটা ব্যাপারে কিন্তু সব বাড়ির লোকই এক রকম। বাসি খাবার সব ঝিদের জন্ত। ভালো খাবার কারও এঁটো পড়ে থাকলে তবেই তা ঝিয়ের। আজ পর্যন্ত যতো বাড়িতে বুটি কাজ করেছে, তারা সবাই যেন এই জায়গায় এক—

না, একেবারে অন্ত রকমের একটা বাড়ির কথা বুটি জানে। সেটা সুহাস-মামাবাবুদের বাড়ি। বুটির মা ওখানে কাজ করতো— ও তখন খুব ছোটো, তবু এখনও মনে আছে যে মা রোজ থালায় খাবার নিয়ে আসতো। যেদিন যেমন রান্না হতো তাই আনতো মা। ভালো জিনিস কিছু হলে তা যেন একটু বেশিই আসতো। মামাবাবুদের বাড়িতে ওদের পাড়ার বিন্দুর মা এখন কাজ করে। সে মাঝে মাঝে বুটির মাকে বলে যায়— এতো বড়ো বড়ো লোকের বাড়ি দেখন্থ বুটির মা, এ রকম বাড়ি কিন্তু একটাও দেখি নি রে।

মা কেন যে ওবাড়ির কাজটা ছেড়ে দিলো?

কিন্তু থাক ওসব চিন্তা এখন। বুটি শুধু যদি একটু গুড় পেতো! রুটিগুলো তাহলে খেতে পারতো।

—ও মেয়ে, তরকারিটা একটু দেখে খাস— গিন্নীমার গলার শব্দে বুটি একটু চমকেই ওঠে— খারাপ হয়ে গিয়ে থাকলে খেয়ে আর কাজ নেই, শেষে অসুখ-বিসুখ হলে তো আমারই আবার বিপদ।

বুটি ভাবছিল এবারে সে বলবে, কিন্তু গিন্নীমা নিজেই বলেন— আয়, একটু ডাল নিয়ে যা—

থালা হাতে বুটি ঘরের মধ্যে ঢুকল। সেদিকে তাকিয়ে গিন্নীমা বলেন— ফেলে দিয়েছিস? তা বেশ করেছিস, নে সোজা করে থালাটা ধর—

কড়াইয়ের ভিতর থেকে তিনি একহাতা ডাল তুলে বুটির রুটিগুলোর ওপরে ঢেলে দিয়ে বলেন— এক্ষুনি মুখে দিস না যেন, যা ফুটন্ত! একটু জুড়িয়ে যাক, তারপর খাবি।

কিছুক্ষণ পরে রুটি খেতে খেতে বুটি ভাবছিল— ডাল জিনিসটা অনেক ভালো গুড়ের চেয়ে। শক্ত রুটি এতে নরম হয়। ডালে বেশ পেটও ভরে। উঃ, যা খিদেটা পেয়েছিল!

খাওয়া শেষ হতেই থালাটা ধুয়ে সে কলতলায় বাসন নিয়ে বসে। তাড়াতাড়ি এগুলোকে মেজে এখানটা খালি করে দিতে হবে। বড়দাবাবুর অফিস যাওয়ার সময় তো হয়েই এসেছে গিন্নীমার রান্নাও হয়ে এল বলে—

বুটির হাত দুটো কাজ করতে থাকে তাদের আঠারো বছরের সব দ্রুততা দিয়ে। এক একটা করে বাসনগুলোকে তার চোখের সামনে থেকে সে ডানদিকে সরিয়ে দিচ্ছে। মাজা শেষ। কলের জলে ধোয়া। শুধু ওঠার সময় গোছাটা সে আরেকবার কলের নীচে ধরবে।

হাত নাড়তে নাড়তে বুটির ব্লাউজে একটু শব্দ হলো— ফ্যাস্। বুকের কাছটায় একটু ছেঁড়া ছিলো, সেটাই হয়তো বাড়লো। এটা আর বেশিদিন পরা যাবে না— নতুন একটা চাই।

ছেঁড়া কতোটা বাড়লো তা দেখতে হবে। এখন নয়, পরে দেখবে। শাড়ির ঝোলা আঁচলটা তুলে দেখতে গেলে তাতে আবার ছাই লেগে যাবে। তার সঙ্গে সকড়ি-মাখা কালি। দুটো হাতই যা হয়ে আছে!

বুটি সব বাসনগুলো এবারে মেজে ফেলেছে। এবারে বাকী শুধু বড়ো কড়াইটা। কাল দুপুরে এটাতে কাপড় ফুটানো হয়েছিল তারপর থেকে পড়ে আছে।

কড়াইটাকে মাজার জন্য বুটি মনে মনে প্রস্তুত হয়। খুব তাড়াতাড়ি শেষ

করতে হবে। বড়দাবাবুর স্নানের সময় তো হয়েই গিয়েছে! গিন্নীমা এখনই ডাক পাড়বেন। বকবেন। একটু বকেন বুটিকে, কিন্তু মানুষটা ভালো। ও যখন রুটিগুলো কি দিয়ে খাবে ভাবছিল, নিজে ডেকে ডাল দিলেন— যেন বুটির মনের কথাগুলো বুঝতে পেরেছিলেন।

এই কড়াইটা মাজতে একটা ঝামার টুকরো চাই। সেটা কলঘরের দেয়ালের খোপে তোলা আছে। ঝামাটা সে বের করে নেয়। কোনের দিকে একটা মাটির হাঁড়িতে বালিও রাখা আছে। কিছুটা বালি সে কড়াইয়ের ওপরে ছিটিয়ে দেয়। তারপরে ঘষতে থাকে। এটাকে মাজতে বেশ গায়ের জোর লাগে। বুটির তা আছে। বাবুদের বাড়ির মেয়ের মতো নরম তার শরীর নয়। ছোটোবেলা থেকে কাজ করছে— সেজন্যই। খেতে ও পায় নি ভালো— তবুও।

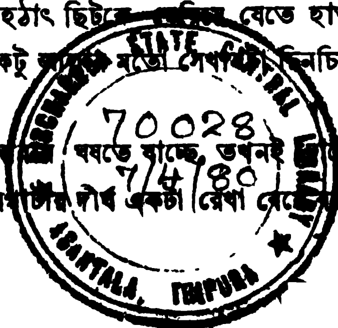
শরীরের ওজন দিয়ে শক্ত হাতের চাপে সে ঝামাটাকে জোরে জোরে ঘষে। পারতো দিদিমণি এরকম? খুব জোর দেয়— আরও জোর। তাড়াতাড়ি— আরও তাড়াতাড়ি। কড়ার একটা হাতলের একপাশ ভাঙা— সেখানে পৌঁছে শুধু একটু সাবধান হয়। এটাকে সারিয়ে নেওয়া দরকার— বাসনওলা পারবে না, লোহার মিস্ত্রী চাই। বুটি একদিন খুঁজে দেখবে সেরকম লোক কোথায় পাওয়া যায়।

বুটি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষছে। এক একবার সোজা ঘষছে— ঘষেই যাচ্ছে। আবার একটু বালি ছিটিয়ে নিল। ঘষার সঙ্গে শব্দ উঠছে— সে শুনতে লাগল।

গোল করে ঘষলে একরকম শব্দ— খং খং খং। সোজা ঘষায়— খখ্‌খড়-খস্‌। হাতটা ফেরত নেবার সময়ে ওই খস্‌ শব্দটা হয়। সব কাজের একটা শব্দ আছে, শব্দে একটা মজাও আছে, কাজের মধ্যে মজা লাগে শব্দগুলো শুনলে— বুটির হাত ঘষার তালে তালে যে শব্দটা উঠছে তা সে মন দিয়ে শোনে— একটা বাজনার সুরের মতো যেন! সেই সুরের মধ্যে শব্দ মিলিয়ে সে এখন দ্রুতহাতে ঘষছে— জোরে, আরও জোরে। তবু হাতের জোর যেন লাগছেই না তার—

হয়তো সেই সুরের তালে কিছু গোলমাল হয়ে থাকবে, নয়তো শব্দটা তাকে অন্যমনস্ক করার ফলেই বুটির হাতের ঝামাটা হঠাৎ ছিটকে [illegible] যেতে হাত গিয়ে পড়ল সেই ভাঙা হাতলটার ওপর। একটু [illegible] মতো সেখানটা চিনচিন করে উঠল।

ও কিছু নয়! ঝামাটা কুড়িয়ে সে [illegible] ঘষতে যাচ্ছে, তখনই [illegible] পড়ল হাতটার কব্জির ওপরে সেই জ্বালার জায়গাটায় দীর্ঘ একটা রেখা [illegible]



বেরিয়ে আসছে। হাতটা তুলে দেখল নীচ থেকে টপ টপ করে রক্তের ফোঁটা পড়ছে— জলের কলটা ঠিকমতো বন্ধ না হলে যে রকম ফোঁটা ফোঁটা পড়ে তার চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি। দেখে বুটির ভয় লাগে— ইস্, কী হবে এখন?—

বুটি কথাগুলো একটু জোরেই হয়তো বলেছিল। পাশে রান্নাঘরে গিন্নীমার তা কানে যায়. সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে ওঠেন— কী হলো রে? ও মেয়ে—

বুটি তখন হাত দিয়ে রক্ত থামানোর চেষ্টা করছে। তার উত্তর না পেয়ে— গিন্নীমা আবার ডাক দেন— ওরে ও মেয়ে, কী যে তোর নাম। কী হয়েছে?

বলে তিনি উঠে বাইরে বেরিয়ে আসেন। বুটি রক্ত থামাতে না পেরে শাড়ির আঁচল দিয়ে ক্ষতের জায়গাটা জড়াচ্ছে। গিন্নীমা এগিয়ে হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে এসে বলেন— দেখি খোল তো একবার—

আঁচলটার অনেকখানি ভিজে উঠেছে রক্তে। রক্ত দেখার প্রথম চমকটা বুটির কেটে গিয়েছে এতক্ষণে— সে নিজেও এখন দেখতে চায় শুধু ওইটুকু আলা দেওয়া কাটাটা— বঁটি কিংবা ছুরিতে নয়! শুধু কড়াইয়ের হাতলে লেগে— কী এমন হয়েছে যে রক্ত এ-রকম পড়ছে?

আঁচলটা সরিয়ে সে ছাখে, গিন্নীমাকে দেখায়, তারপর আবার চেপে ধরে। গিন্নীমা ততোক্ষণে চিৎকার করে উঠেছেন— ওরে সন্তু, কুন্তি—

কুন্তি তাঁর মেজো ছেলে। বড়ো ছেলে সন্তু। সে তখন অফিসে যাবার আগে শেষবার কাগজে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। মায়ের চিৎকার শুনে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে সে ছুটে আসে। কাছে এসেই ছাখে— রক্ত!

রক্তে তার বড়ো ভয়— ইস্ এ কী কাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে ওঠে— কুন্তি! কুন্তি কোথায়?

নিমেষে ছুটে যায় দরজার দিকে— সেখান থেকে ডাক দেয়, কুন্তি! তারপর দ্রুতপায়ে রাস্তায় চলে গিয়ে দূরে কুন্তিকে দেখে ডাকে— এই কুন্তি। শিগ্‌গির বাড়ি আয়—

বাড়িতে ফিরে এসে সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলে— ভালো করে চেপে রাখো, কুন্তি আসছে।

সবাইকার এতো ব্যস্ততায় বুটি লজ্জা পায়। একটু যদি সাবধান সে হতো! তাহলে বড়দাবাবুর অফিস বের হওয়ার সময়ে এরকম হাঙ্গামা সে বাধিয়ে বসতো না।

চেপে ধরে আছে। মেজদাবাবুও এসে গিয়েছেন। বুকের কাটা জায়গাটার ওপরে হাতের চাপ দিয়ে আঁচলটা তিনি সরিয়ে দেন। তারপরে আবার ক্ষতের ওপরে চেপে বলেন— একটু পরিষ্কার কাপড় নিয়ে এসো তো মা, তোমার পানের চুন আর চিনির কৌটোটা আনো।

বুটির দিকে মুখ ফিরিয়ে আশ্বাস দেন— কিচ্ছু হয় নি, ভয় পাস না, এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

বড়দাবাবুর দিকে তারপর মুখ ঘোরান তিনি— বড়দা তুমি সরে দাঁড়াও।

বুটি আশ্বাস পায়। খুব শান্তভাবে কথা তিনি বলছেন— সব কিছু করছেন। চুন আর চিনি মিশিয়ে প্রথমে একটা মণ্ড তৈরি হলো চায়ের প্লেটের ওপরে। কাপড়টা গিন্নীমার হাত থেকে নিয়ে দুটো ফালি করে তার একটা দিয়ে রক্ত মুছলেন ভালো করে, রক্তটা আবার বেরিয়ে আসার আগেই দ্রুতহাতে চুন চিনির মণ্ডটা তার ওপরে চেপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফুঁ দিতে লাগলেন। তার ওপর চুনটা শুকিয়ে আসছে, রক্ত তবু এপাশে ওপাশে গড়াচ্ছে, সেখানেও মুছে আবার কিছুটা মণ্ড তার ওপরে লাগিয়ে খুব জোরে ফুঁ দিতে থাকেন।

এবারে আর রক্ত বের হচ্ছে না। ফুঁ দেওয়া বন্ধ করে বললেন— দ্যাখ, এবারে থেমেছে তো?

মা একটু পরিষ্কার জল দাও তো, হাতটা মুছে দিই—

গিন্নীমা জল আনতে ভিতরে গেছেন, বড়দাবাবু ঘরের মধ্যে চলে গেছেন একটু আগেই, বুটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে— মেজদাবাবুর হাতের মধ্যে তার একটা হাত তখনও ধরা— বুটির হঠাৎ কীরকম যেন লাগে, আরও কী ভেবে তার চোখ পড়ে সেই ব্লাউজের ওপর যেখানে খানিক আগে সে ছেঁড়ার শব্দ পেয়েছিল। দেখেই চমকে ওঠে— এ কী! এ রকম ছিঁড়ে গিয়েছে? বুকটা যে একেবারে—

বুটির দৃষ্টির পথ অনুসরণ করে কুন্তির চোখও গিয়ে ঠিক সেখানেই থেমেছিল। যৌবনের সেই একতাল মাংসপিণ্ডের ওপর— বুটির দেহের রঙের চেয়ে ওখানটা অনেক বেশি ফর্সা—

শুধু কয়েকটা মুহূর্ত। তার মধ্যে বুটি তার আঁচল টেনে দিল। কুন্তি আগেই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল।

জল আসতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে তা দিয়ে হাতের এপাশে ওপাশে সব রক্তের জায়গাগুলো মুছে দিচ্ছে কুন্তি। বুটি অনেক কথা ভাবছে— মেজদাবাবুর চোখে

এখনই তার শরীরটা বেতাবে পড়েছে। লজ্জায় সে যেন কুঁকড়ে যায়। হাতটা ছাড়িয়ে এখনই কোথাও সরে যেতে পারলে বেঁচে যেতো সে—

শেষে হাতের ওপরে কাপড় জড়িয়ে শক্ত একটা গিঁট দিয়ে বুটি বলে— চুনটা ভালো করে শক্ত হলে এটা খুলেও ফেলতে পারিস। যা, এবারে হয়েছে তো? বলে, সে সরে যায়।

বুটি আড়চোখে ছাখে মেজদাবাবু আবার বাড়ির বাইরে চলে যাচ্ছেন। সে যেন বেঁচেছে।

॥ তিন ॥

এখনই অনেকদিন পরে কুন্তি একটা জরুরী কাজে লেগেছে। এটা বড়দা পারতো না। পারার কথাই ওঠে না— বড়দা কি রকম দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তা কুন্তির মনে পড়ে— একটু হাসি পায় নিজেরই ওপরে তাচ্ছিল্যে— ওই মানুষটা— একটু রক্ত দেখলেই যার ওরকম ভয়, তাকেই কুন্তি যে ভয় করে! এই ভয়টা থেকে কিছুতেই ওর রেহাই নেই— বড়দা মাথায় কুন্তির চেয়ে অন্তত তিন ইঞ্চি খাটো, বুকের ছাতিতে ইঞ্চি ছয়ের মতো কম— তার অনেকটাই কোমরের মাপে পুষিয়ে নেওয়া, সেই বড়দাকে দেখলে ও বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়। কারণটা হয়তো শুধু তাঁর উপদেশের জন্য— কিছু একটা কর কুন্তি। চাকরি না পাস তো যা হয় কিছু ব্যবসায় নেমে যা— ছোটোখাটো কোনো ব্যবসার পুঁজি আমি না হয় ধার করেই দেবো। তাও যদি না পারিস তাহলে ফেরিঅলার কাজেও তো নামতে পারিস। তাতে যে যা খুশি বলে বলুক, আমি অন্তত খুশি হবো—

বড়দা মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলে বলেন— কুন্তি, যে বয়সটা তোর চলে যাচ্ছে তা কোনদিনও আর ফিরে আসবে না রে! কাজের অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেলে তারপর চাইলেও আর কাজ করতে পারা যায় না—

এই সব বেশ ভালো উপদেশ বড়দার। কুন্তি নিজেও কী তা জানে না? আজ সকালে তবে সুহাসদার কাছে সে কী জন্যে গিয়েছিল? সুহাসদাকে সে কী ঠিক ওই কথাই বলে নি?

বড়দার শুধু উপদেশ। কিন্তু ভেবে কী কখনও দেখেছে যে উপদেশ দেওয়া যতোটা সোজা কাজ ততোটা সহজ নয়!

চাকরির জন্য দরখাস্ত ও অনেক জায়গায় দিয়েছে— মাঝে মাঝেই দিয়ে যায়। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো তো ছ-বছর হয়ে গেল। ইন্টারভিউও সে কতোবার দিয়েছে, কিন্তু কী হলো আজ পর্যন্ত?

ব্যাকিং— ব্যাকিং চাই। কুন্তির কোন্ ব্যাকিং আছে? কোনো মামা, কাকা তেমন নেই, মেসোমশাই পিসেমশাই, কোনো তুতো-দাদাও নেই যাদের ঠেকো থাকলে কুন্তি চাকরি একটা পেতে পারতো! এ সব তো জানাই বড়দার, কিন্তু সেও তো নিজের অফিসের বসকে একটু বলে দেখলে পারে!

দোকান করবে ? যে সব জায়গায় দোকান দিলে তা চলার মতো চলে সেখানে একটা দোকানের সেলামী দিতেই বড়দা অন্তত তিনবার ফতুর হয়ে যাবে। ফিরিঅলা হবে ? হকার মানেটা আসলে কী তা কি তুমি জানো বড়দা ? তার মানে হলো পুলিশের তাড়া খেয়ে এ-ফুটপাথ থেকে ও-ফুটপাথে ছোটা, রেলের এক কামরা থেকে অন্য কামরায় পালিয়ে বেড়ানো।

তা-ই যদি কুট্টিকে করতে হয় তবে তা সে অন্যভাবে করবে। অন্য কারণে। সেজন্য কুট্টির হাতে পাইপ-গান কিংবা পিস্তলের দরকার নেই—একটা বড়ো সাইজের কাগজ-কাটা ছুরি থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু কুট্টি সেসব লাইনে যায় নি, যাবেও না— ওগুলো কুট্টি অপছন্দই করে। কারও ভয়ে নয়। ওর রুচিতে বাধে— তাই।

বাড়ি থেকে বের হয়ে পাড়ার একটা বারান্দায় একা বসে কুট্টি এইসব ভাবছিল। এখনই ওরা সব আসবে। এখানে এসে বসবে। তখন আর একা থাকতে হবে না—একা থাকলেই কুট্টির মনে কতো কথা যে ভিড় করে!

মনে আসছে একটু আগেকার সেই ব্যাপারটা— কুট্টি ঝিয়ের হাতটা চমৎকার বেঁধে দিয়েছে। রক্তটা কী রকম বন্ধ হয়ে গেল! কিন্তু তারপর ? অতো কাছের থেকে ও-রকম মেয়েদের শরীর— বুকটা ফর্সা— গোল— দারুণ!

ছিঃ সুব্রত!— কুট্টির মনের মধ্যে থেকে কে যেন ওর ভালো নাম ধরে ডাক দিয়ে বলে ওঠে— মন থেকে ওকথা সরিয়ে দাও— সে না তোমাদের বাড়ির ঝি ? তোমাদের থেকে অনেক নীচের সমাজের— রুচিটা তোমার একটু নেমে কি যাচ্ছে না ?

বাদ দে, বাদ দে। সব রঙবাজি রাখ— কুট্টি তাকে উত্তর দেয়। শালা, এখানে চুপচাপ বসে আছি, একটা সিগারেট কেনার পয়সা নেই— তার বলে কিনা বাড়ির ঝি। ওই ঝিয়ের মেয়েটাই যদি একটা সিনেমা দেখতে চাইতো তাহলে তো মায়ের কাছে চেয়ে, কিংবা বড়দার পকেট হাতড়ে তার রেস্ত যোগাড় করতে হতো! তারপর এখন আবার রুচি টেস্টের গল্প বলতে এসেছে।

ওদের দলটা এসে গিয়েছে। বারান্দাটা গরম হয়ে উঠল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে— তাদের সবাইকার দিকে আলতো একটা প্রশ্ন সে এতোক্ষণে ছুঁড়ে দেয়— কারো কাছে একটা সিগারেট আছে ?

চুলবুল একটা খোলা প্যাকেট কুট্টির দিকে এগিয়ে দেয়— দুটো মোটে আছে, তা তুই যখন বলছিস— না দিয়ে কি উপায় আছে?

তার মানে?— চাপা একটা উষ্মা কুট্টির গলার শব্দে।

চুববুল হঠাৎ একটা রসিকতা করতে গিয়ে থমকে গিয়েছে কুট্টির কথায় এখন একটু খুশি করার সুরে বলে— বলছিলাম কী, এই পাড়ায় থাকতে গেলে, কসবার দাপট থেকে বাঁচতে গেলে— মানে, এমন-কি একটা ফুটবলের টিম করতে গেলেও তো তোকে না হলে চলবে না।

ঠিক এই ভাবে বলবি, জানিস। কুট্টির গলায় এখনও সেই উষ্মার রেশ রয়ে গেছে।

আসলে ওর মনটাই আজ খারাপ— সিগারেটটা তুলে নিয়ে, জ্বালিয়ে, টান দিয়ে কুট্টি সেই একটু আগেকার কথাগুলো ভাবতে থাকে। বড়দা হয়তো কিছুটা ঠিকই বলে— বয়স হয়ে যাচ্ছে, বয়স হয়ে যাচ্ছে। কতো বয়স এখন কুট্টির? আর দু-মাস বাদে সাতাশ পুরো হবে। পুরন্ত ভরন্ত বয়স। নারী ওকে আকর্ষণ করে, করে ভালো খাওয়া, ভালো ব্র্যাণ্ডের সিগারেট, সিনেমার ছবি— কিন্তু উপায় নেই। এতোদিন তো বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো! অপর্ণা ওকে ভালবেসেছিল, কিন্তু পারলো কী তার বিয়ে ঠেকাতে? কি দিয়ে পারবে? শুধু ওর যৌবনের দেহটা, বুকের ছাতি আর কব্জির জোর দেখিয়ে? ও-সব পুরনো কালে চলতো যখন কথা ছিলো— বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। এখন বীর হলো পুলিশ, আর ওই সব পেট-মোটা থস্‌থসে মানুষগুলো— যারা নতুন নতুন গাড়ি চড়ে, আটতলা দশতলা বাড়ি বানায়, আর, ফলে সব ভালো ভালো নারী দখল করে ভোগ করে— শালারা!

এই চিন্তাটা অনেক রকম ভাবে ঘুরে ফিরে ওর মনে বারবার আসছে— অন্য কিছু একটা ভাবা দরকার। এবারে কুট্টি সিগারেটটায় বড়ো করে একটা শেষ টান দেয়, সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে বলে— জানিস, মন্ত্রী মশাই আজ কী বলেছেন!

আবার বাণী দিয়েছেন নাকি?— একজন বলে।

বাণী নয়, মহাবাণী। একেবারে ভবিষ্যদ্‌বাণী। বলেছেন যে, তিন বছরের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধান করে দেবেন।

রোয়াক ভর্তি অনেক বেকারের এক সঙ্গে প্রশ্ন— তাই নাকি?

কী করে?— চুলবুল বলে।

কেন? ম্যাজিক করে!— আর একজন উত্তর দেয় কুট্টির বদলে।

আরও কী ঝেড়েছেন জানিস?— কুট্টি এবারে বলছে, ঝেড়েছেন যে দশ হাজার গ্রামে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে দেবেন—

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আর এদিকে শালা কারখানাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রিকের অভাবে। কল-কারখানা আবার বাড়াতেও বলছেন— রঙবাজিটা বুঝেছিস?

রোয়াকে উপবিষ্ট হরেক-বয়সী হরেক-রকম বেকারদের সবাই এর সবটা মানে বুঝতে পারে না, তবু কুট্টির ওপরে এ সব বিষয়ে তাদের শ্রদ্ধা আছে, কুট্টি —কুট্টিদা বি এ পর্যন্ত পড়েছিল। রোজ খবরের কাগজ পড়ে, দেশের বিষয়ে মাঝে মাঝে কিছু মোক্ষম কথা বলে তা ওরা জানে।

বাণী দিয়ে যাক, বাৎ ঝেড়ে যাক, তারপর একদিন বুঝবে।— কুট্টি বলে।

এবারে সে একটু চুপ করে। তারপর আরও কয়েকটা খবর ওদের বুঝিয়ে বলে।— আজ সকালে কাগজের কিছুটা অংশ আর সব হেড্‌লাইনগুলো পড়েছে সে।

বারান্দার সামনের রাস্তা দিয়ে এতক্ষণ হরেক রকম মানুষ হেঁটে গিয়েছে। অনেক মোটর, ট্যাক্সি, লরি, রিক্সা চলে গেছে। ওরা সবকিছু দেখেছে। এখন দেখল সামনে দিয়ে গট গট করে চলে যাচ্ছে বিশ্বাস বাড়ির মেয়ে – এ পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে— চোখ ঝলসানো চেহারা :

কী রে, আজ গাড়ি নেই যে?— চাপা একটা গলা শোনা যায়।

ও সব ভাঁটের ব্যাপার– আর একটা গলা।

ওদিকে চোখ দিস না শালারা, চোখ পুড়ে যাবে— চুলবুল বলে।

খাঁটি বুর্জোয়া মাল— ঝণ্টু।

কুট্টিও মেয়েটির হেঁটে যাওয়া দেখছিল নিমগ্ন দৃষ্টিতে। মেয়েটা ওর স্নায়ুর গভীরে গিয়ে আঘাত দেয় বরাবরই, তবু এদের এই সব পিছন-চুকলি খুবই খারাপ লাগে। তাই সে গম্ভীরভাবে বলে ওঠে— বুর্জোয়া মানে কী বলতো?

স্তব্ধ নিরুত্তর বারান্দাটা। শব্দটা খুবই জানা – মানেটা তো বোঝাই আছে? তবু কথা দিয়ে বলা যায় না—

মানে জানিস না কেউ? তবে যে বড়ো পট পট করছিস!

সবাই এখনও চুপ। তাদের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে সে একটু অহঙ্কার হাসি হেসে বলে— বুর্জোয়া মানে হলো উচ্চ নাগরিক। মানে, সাধারণ মানুষদের চেয়ে যারা একটু উঁচু শ্রেণীর লোক তাদেরই বুর্জোয়া বলা হয়।

তাহলে ভুল কী বলা হয়েছে ?— চুলবুল বলে ওঠে— ওদের গাড়ি আছে, বড়োলোকও খুব—

না, ভুল নয়, ঠিকই। কিন্তু তার ফলে এ রকম মানেও তো একটা হয়ে *যায় যে, যারা বুর্জোয়া বুর্জোয়া বলে গাল দেয় তারা উচ্চ নয়— নীচ ?*

কুট্টিদা ভীষণ রেগে গিয়েছে— অনেকেরই মনে হয়। কেউ ভাবে, কুট্টি দিচ্ছে এবারে। এখন একটু তফাৎ থাকা ভালো। কুট্টির কী ওই মেয়েটার ওপর নজর আছে ? চুলবুল স্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকে— হতেও বা পারে !

সেটা হয়তো ওদের সবাইকারই আছে। মোমের মতো রঙ, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী আর সুন্দর মুখের ওই মেয়েটাকে নিয়ে অন্য জায়গায় তারা বড়াইও করে থাকে। শুধু কী রকম যেন ! ওদের দিকে কখনো ফিরেও তাকায় না।

তোরা উঠবি, না বসেই থাকবি ? কুট্টি সবাইকার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে— আমি কিন্তু যাচ্ছি, আবার সেই বিকেলে —

কারও উত্তরের জন্য না অপেক্ষা করে কুট্টি বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। ক্ষিদেটা জোর পেয়েছে— আজ দাড়িও কামাবে সে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেতে বসবে। বড়দা আজ বাজারে গিয়েছিল— মাছ এসেছে নিশ্চয়। পোনা মাছ। বড়দা ভালোবাসে। যেদিনই বাজারে নিজে যায়, কিনে আনে।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে কুট্টি আবার বুটিকে দেখতে পেল। ওর দিকে পিছন ফিরে উঠোনে বসে সে কয়লার গুল দিচ্ছে। হাতটা ভালোই বেঁধে দিয়েছে কুট্টি। কিন্তু ও যদি তখন কাছে না থাকতো ? ডাক্তারখানাতেই নিয়ে যেতে হতো— অন্তত আট টাকা লাগতো। কুট্টির ভালো লাগে ভেবে যে সে কাছাকাছি থেকে বড়দার আটটা টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে। তার একটা টাকা পেলেও কুট্টির আজকের দিনটা ভালোই চলে যেতো—

শালা চুলবুলটা খচড়া আছে। তার ধার ও রাখবে না। ওকে আজ দিয়েছে ভালোই কুট্টি। ওই সব কাঁপ্পা-ছড়খাওয়া পলতেগুলোকে মাঝেমাঝে একটু টাইট দিয়ে নামিয়ে আনতে হয়।

সব শালা অকাল কুম্মাণ্ড ওই বারান্দায় এখনও বসে আছে। কুট্টি ওখানে বসতে চায় না। কিন্তু কী করবে ! বসতেই হয়।

বুটিটা ভালো মেয়ে। হাতটা বেশ কেটেছে, তবু আবার এখন জল দিয়ে বসেছে।

কুট্টি ঘরের মধ্যে একটু সময় এদিক ওদিক ঘোরে। কিছু একটা সে করতে চায়, কিন্তু কী তা মনে পড়ছে না। তাকের ওপরে রাখা জিনিসগুলো একটু নাড়াচাড়া করে, আয়নার সামনে দাঁড়ায়। দাড়িটা বড়ো হয়েছে, শেষ কবে কামিয়েছিল কুট্টি? সোমবার। মানে, তিন দিন আগে। ঠিক এই কথাটাই এক্ষুনি ও মনে করতে চাইছিল, আর সেজন্যেই তাকের ওপরে জিনিসগুলোর মধ্যে খুঁজছিল সেই অজানা জিনিসটাকে যেটা আসলে ওর শেভিং সেট্। কিন্তু আয়নার সামনে না দাঁড়ালে কথাটা ওর মনে পড়তো না এখনও— এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। এর আগেও কুট্টির এ রকম হয়েছে— তুমি একটা কিছু করতে চেয়েছিলে, ভুলে গিয়েছো, কিন্তু নিজের অজান্তে তারই কাছাকাছি গিয়ে শূন্যের মধ্যে হাতড়াচ্ছো। বেশ মজার ব্যাপার এটা, না?

শেভিং সেটটা আগে ওই তাকের ওপর থাকতো। এখন টেবিলের একপাশে রাখা আছে। সেটাকে বের করে কুট্টি। বড়দির দেওয়া জন্মদিনের উপহার। বড়দি এখানে আসলে ওর জন্মদিনে কিছু একটা দেয়। বড়দি না এলে সেটা ফাঁকাই চলে যায়— শুধু মায়ের রান্না পায়েস খাওয়া ছাড়া। বড়দিটা দাড়ি কামানোর বিষয়ে দারুণ খুঁতখুঁতে— কুট্টি, এরকম বিচ্ছিরী দাড়ি রেখেছিস কেন রে? রাখবি তো ভালো করে রাখিস্। না হলে রোজ কামাবি। অন্তত হপ্তায় তিনদিন তো নিশ্চয়ই। কি রে, কথাটা কানে গ্যালো?

কুট্টি ঠিকই বুঝেছিল— এ ব্যাপারটা বড়দির শ্বশুরবাড়িতে শেখা। জামাইদা রোজ সকালে দাড়ি কামান, তাই। অবশ্য শেভিং সেটটা খুব ভালোই বড়দি দিয়েছিল। আর এটা পাওয়ার পর থেকে কুট্টি ঠিক বড়দির কথামতো না হলেও, বেশ মাঝে মাঝেই কামায়।

একটা গেলাসে ভরে জল নিয়ে আসে কুট্টি। বুটিটা এখনও জল দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে আবার ফিরে আসে। গালটা ভিজিয়ে সাবান লাগায়। তারপর সেফটি রেজরের টানে টানে ওর দাড়ি কামানো মুখটা বেরিয়ে আসছে আয়নার চোখের সামনে। সেই মুখটার দিকে কুট্টিও তাকিয়ে থাকে। মুখটাকে একপাশ ফিরিয়ে ভাখে। অন্যপাশে ঘুরিয়ে আবার ভাখে। কুট্টিকে বেশ ভালো দেখতে ছিলো এককালে। এখনও কী তার কিছুটা নেই?

আছে তেমনিই, তবু একটু বদলেও গিয়েছে সে। শুধু মুখের চেহারায় নয়,

অনেক কিছুতে। এই মুখটার— এই চেহারার কোনো মানে যেন নেই। কুট্টির সব কিছুই আজ খাপছাড়া হয়ে গেছে।

কুট্টির চোখে একদিন একটা আলো ছিল— আয়নায় তাকালে তা কুট্টির দিকে তাকিয়ে হাসতো— সেটা কোথায় গেল? কুট্টি আয়নার চোখে চোখ রেখে চেয়ে চেয়ে খুঁজতে থাকে। তারপর সে চোখ নামিয়ে নেয়— নিজের দিকে তাকিয়ে। ও-সব আর ভাববে না। কী লাভ ভেবে? যা আছে তা আছে—

তাড়াতাড়ি গেলাসটা সে তুলে নেয়। শেভিং সেট্ গুছিয়ে গামছা জড়িয়ে দ্রুতপায়ে স্নানের ঘরে চলে আসে। সেখান থেকেই বলে ওঠে— মা, ভাতটা দিয়ে দাও, আমি এক্ষুনি আসছি।

বাথরুমে টিনের দরজা। ওপরেও টিন। বড়ো চৌবাচ্চাটা আজকাল আর ভরে না— কর্পোরেশনের জল যা কমে গিয়েছে। নর্দমার সিমেণ্ট ভেঙে গিয়েছে, মেঝেটা শ্যাওলা জমে বিচ্ছিরী হয়ে আছে। সেদিন ওর পা হড়কে গিয়েছিল। কুট্টি পা দিয়ে ঘষে খানিকটা জল ঢেলে দেয়। তারপর গামছা খুলে গায়ের ওপরে জল ঢালতে থাকে। জলের স্পর্শটা নরম— কতো সব কথা যে মনে পড়িয়ে দেয়।

নিজের শরীরের দিকে সে তাকিয়ে ছাখে— ওর দেহে এখন ভরা যৌবন। পায়ের থাই দুটো থাক থাক পেশিতে ভরা। তার নীচে গুলিগুলো এখন আগের চেয়ে অনেক ভারী হয়ে উঠেছে— ফুটবলের ওপরে ও দুটোকে ঠিক মতো ছাড়লে অনেক গোল্-কীপারের হাত ফেটে যাবে বল ধরতে গেলে।

তবু, শালা! মনে মনে কোনো অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে গাল পেড়ে কিংবা অভিশাপ দিয়ে বলে— কী কাজে লাগছে? ফুটবলও তো আর খেলাই হয় না।

কীরে, ভাত দিতে বললি, আমি বেড়ে তো বসেই আছি—

মায়ের গলা শুনে চমকে ওঠে কুট্টি। শরীরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। নিজের দিকে তাকালেই তার আজে বাজে কত সব চিন্তা যে এসে যায়। এবারে তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করে সে গামছাটা আবার জড়িয়ে বের হয়ে আসে।

থালার সামনে বসে কুট্টির ভালো লাগে সব সময়। বড়দাটা রোজ ভাত ফেলে রাখে। কুট্টি কিন্তু কোনো দিনও ফ্যালে না। খাওয়া ওর পরিষ্কার। মা বলেন, তোকে খেতে দিয়ে সুখ আছে রে কুট্টি।

কিন্তু— মাছের বাটির মধ্যে হাত ডুবিয়ে সে বলে ওঠে, পোনা মাছ কই? এ যে তেলাপিয়া!

মা কোনো উত্তর দেন না।

আর তাও এইটুকুন। এক টুকরো। ছোটো তেলাপিয়া আবার কেটে কেউ টুকরো করে খায় নাকি?

মা কুট্টির মুখের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলেন— ওই তো এনেছে, আমি আর কী করবো বল্—

কুট্টির মনে একটা শক্ত কথা ঠোঁট পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল, হঠাৎ সেটাকে থামিয়ে নেয়, বলে— বড়দাও তেলাপিয়া খেয়েছে?

তা নয় তো কি আর তোরই জন্তে আলাদা করে এনেছে?

আর কোন কথা বলে না কুট্টি, মনে মনে ভাবে, চাকরি একটা লাগুক, ও নিজে রোজ বাজারে যাবে। দেখিয়ে দেবে বাজার কী রকম করতে হয়।

ডাল আর একটু নে— মা হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ঠিক আছে— কুট্টি বলে। এও একরকম ভালো জিনিস। প্রোটিন আছে— উদ্‌ভিজ্জ— ছোটোবেলার স্বাস্থ্য বইয়ের শব্দটা মনে এসে যায়। দারুণ খিদে পেয়েছিল কুট্টির— এখন সবই বেশ ভালো চলবে তার।

খাওয়া শেষ করে উঠে কুট্টি একটা সিগারেটের কথা ভাবল। কাল মায়ের কাছে একটা আধুলি নিয়েছিল তার কুড়িটা পয়সা এখনও আছে। তার থেকে একটা দশ পয়সা নিয়ে সে ছোট্টুলালের দোকানে চলে এল। দুটো সিগারেট কিনে একটা ধরিয়ে আরেকটাকে রেখে দেয়। দুপুরে মা ঘুম দিলে তখন এটাকে ধরাবে।

একটু দূরের সেই বারান্দাটার দিকে তাকিয়ে ছাখে কুট্টি। চুলবুলরা সবাই কাটি দিয়েছে। এখন সবাইকারই হোটেলের সময়। ক্লাবটা আবার বিকেলে খুলবে। শুধু গুণ্টু আর প্রদীপ একটু বাদেই চলে আসবে— ওদের বাড়িতে জায়গা নেই। গুণ্টুদের টিনের ঘর— খুব নিচু। শ্লা, যা গরম!— বাড়ির কথা উঠলেই সে বলে— তাই পেইলে আসতে হয়। গুণ্টুকে কুট্টি কতোবার শিখিয়েছে উচ্চারণটা পালিয়ে— পেইলে নয়। কিন্তু শোধরায় না কিছুতেই।

ওদের হিসাব ধরলে কুট্টি বেশ ভালোই আছে বলা যায়। দুপুরে বড়দা বাড়ি থাকে না। খাটটা তার একার জন্তে পাওয়া যায়। মা, টুকলু, রুমু ওরা মায়ের ঘরে থাকে। তাই ঘরের ব্যাপারে কুট্টির কোন অসুবিধা নেই শুধু ছুটির দিন ছাড়া।

টুকলু রুমুরা ফিরবে কবে বড়দির বাড়ি থেকে? পুজোর সময় বড়দি কি আসবে? এখনও খবর আসে নি।

বড়দা বাড়িতে থাকলে কুট্টির দুপুরটা একটু অন্য রকম চলে। সেদিন বড়দার পাশে খাটের ওপরে না শুয়ে সে পাড়ার বারান্দায় চলে যায়। এক বারান্দায় রোদ এসে পড়লে ঘুরে উল্টোদিকে গিয়ে বসে। বাড়িতে বড়দার কাছাকাছি সেই. অস্বস্তির চেয়ে তা অনেক ভালো। আর, দুপুরটা কতোটুকুই বা সময়!

আজ কিন্তু দুপুরটা ভালো কাটবে খুব। দুটো পুজো সংখ্যা বাড়িতে। কুট্টি আজ আবার তার ভালো নামের সুব্রত হয়ে গল্প-উপন্যাস পড়বে, পড়বে সিনেমা আর খেলার পাতা।

গড়ানো দুপুরটায় সুব্রত খাটে শুয়ে একটা পুজো সংখ্যা পড়ছিল। খেলার পাতাগুলো প্রথমে সে কিছু কিছু পড়েছে। সিনেমার অংশে নায়ক নায়িকাদের ছবিগুলো দেখেছে। তারপর চলে এসেছে গল্প উপন্যাসের দিকে। সূচীপত্র দেখে প্রথমে সে দুটো গল্প পড়ল। দুজনেই নামকরা লেখক— একজন তো প্রাইজ পাওয়া— কিন্তু ধুস্— কী যে সব লিখেছে! এবার সে পাতা উল্টে উল্টে চলে— বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন। তিন রকমের পাখা বাজারের সেরা— তার চোখে পড়েছে। চারটে ট্যাল্কম পাউডার, স্নো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ— সিনেমার নায়ক নায়িকারা বলছেন। সে আবার ফিরে আসে সূচীপত্রের পাতায়। একটা উপন্যাসের পৃষ্ঠা-নম্বর দেখে সেখানটা খুঁলে সুব্রত পড়তে শুরু করে। প্রথমে খানিকটা, মাঝের কিছু কিছু, তারপরে শেষ দিক— এমনিভাবে একবার চোখ-বোলানো পড়ে নিয়ে ভালো লাগলে সে প্রথম থেকে উপন্যাস পড়ে।

এটাকেও তেমনিভাবে কিছুটা পড়ে আর চোখ বুলিয়ে সুব্রত শেষদিকে চলে এল। যেটুকু পড়েছে তাতে পড়ার ইচ্ছে চলে গেছে, ভাবছিল এটা ছেড়ে সে অন্য কিছু খুঁজবে, তারই মধ্যে পাতা উল্টে সে একটু পিছনে চলে আসে। সেখানে চোখ পড়তেই চোখ দুটো তার স্থির হয়ে যায়— আরে! এ কী! ওখানে তো দারুণ ব্যাপার চলছে! দুজন স্ত্রী পুরুষ দুজনকে কাছে টেনে আনছে— টানছেই। ইস্, এ কী কাণ্ড! ওরা করছে কী? দুজনেরই দেহে তো ঘাম ফুটে উঠেছে! মানে, সবই স্পষ্ট একেবারে—

সে যেন চোখের সামনে ব্যাপারটা ঘটতে দেখছে— একটি সুন্দর নারী দেহ —নয়। তার দেহলগ্ন একজন পুরুষ পত্রিকার পাতা থেকে সেই নারী এক বাস্তব শরীরে যেন কুট্টির সামনে চলে এসেছে— ও তাকে দেখতেই পাচ্ছে— কী সুন্দর তার উপচে-পড়া দেহটা। রূপসী— মোমের মত রঙ, মাখনের মতো নরম—

সে ফিরে আসে আরেকবার সেই প্রথমের দিকে যেখান থেকে ওই ঘটনার সুরু— এ সেই স্বপ্নের দেশ যেখানে কুট্টি আজও যেতে পারে নি কোনদিন, অথচ বাসনাও ছিলো— অবচেতনে যা রয়ে গেছে আজও—

হাত থেকে বইটা খসে পড়েছে কুট্টির। ওর দেহে এখন সেই পুরুষটার উত্তেজনা— কুট্টির সাতাশ বছরের যৌবন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নারী। নারী। দেহ।

বিছানায় পাশ ফেরে কুট্টি। একটা বালিশ টেনে নেয় শরীরের কাছে। খুব কাছে। উদ্বেল যৌবনে সে শুধু ছটফট করছে— না, এই বালিশটা নয়। আসল নারী কই? দেহ কোথায়?

বালিশটা ছুঁড়ে ফেলে কুট্টি বিছানা ছেড়ে নেমে আসে। দরজার কাছে গিয়ে সেটা বন্ধ করে দেয়। দেয়ালের বড়ো আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর চওড়া বুকটা চোখের সামনে— দুরু দুরু যৌবন যেন মেঘের মতো ডাকছে। যৌবন প্রচুর আছে কুট্টির— ওর সারা দেহটা যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে সেই যৌবনের স্পর্শে— চোখের সামনে হঠাৎ এবারে আজ সকালে দেখা সেই বুটির দেহটা— তার ব্লাউজের ফাঁকে বের হয়ে থাকা বুকের সেই মাংস— দারুণ ভালো শরীরটা বুটির—

কুট্টি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। মা এখন ওঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। বুটি একা আছে সিঁড়ির ঘরে— দুপুরে ওখানেই শোয়। কুট্টি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। কয়েকটা সিঁড়ি নেমে আসে। আবার এগোয় ভয়ে ভয়ে। পিছিয়ে এসে সাহস খোঁজে। এগিয়ে গিয়ে ভয় পায়। তবু—নারী! দেহ— বুটির সেই খোলা বুকটা— গোল, ফর্সা—

শুধু ভয় আর সাহস— এই দুটোই তার মনের মধ্যে। আর কিছুই নেই পৃথিবীতে। কোথাও, কোনদিন ছিলো না যেন—কুট্টির মধ্যে সুব্রত গাঙ্গুলী এখন কোথায় হারিয়ে গেছে, আছে শুধু কুট্টি নামের একটি যুবক যে জীবনে শুধু লাথি খেয়ে বেড়ায়। তার সেই আহত যৌবন, পৌরুষ এই মুহূর্তে শুধুমাত্র একটা পুরুষের দেহ হয়ে বুটির ভেজানো দরজাটা শেষে খুলেই দিল—

বুটি শুয়ে রয়েছে। শাড়িটা সরে গিয়ে পা-দুটো হাঁটু পর্যন্ত বেরিয়ে আছে। আঁচল এখন আর ঢাকা নয়— ব্লাউজের ফাঁকে সেই মাংসের পিণ্ডটা স্পষ্ট দেখা যায়—

কুট্টি উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপে। ধীরে ধীরে সে ওই মাংসের দিকে এগিয়ে যায়— বাঘ যেমন গুটি গুটি পায়ে শিকারের দিকে এগোয়। তবু অন্য রকম— ভয়ে ভয়ে। এবারে সে আস্তে আস্তে বুটির বুকের ওপরে হাত ছোঁয়ায়। ও কি ঘুমিয়ে আছে? কুট্টি হাতে একটু চাপ দেয়। নরম স্পর্শটা অনুভব করে। তারপরে সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে— আরেকটু জোরে। আরও জোরে—

আর তখনই হঠাৎ—

এক লহমার মধ্যে বুটি ঝেড়ে উঠে বসে। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে হরিণের মতো ছিটকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। বুকের ওপরে দুটো হাত চেপে চিৎকার করলো— ওগো— কে—

শুধু ওইটুকু অস্পষ্ট শব্দই বের হয়ে এসেছিল—তারই মধ্যে কুট্টি মুখটা চেপে শব্দ আটকে দিয়েছে— ইস্, এ কী হয়ে গেল! কুট্টি দু-হাত দিয়ে মুখটাকে আরও জোরে চেপে ধরে।

বুটি বুকের ওপর থেকে হাত সরিয়ে এখন কুট্টির হাত দুটো ছাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে— বিহ্বল আতঙ্কে তার দু-চোখ ভরা অন্ধকার মুখে শুধু একটু একটু শব্দ বের হয়ে আসছে— কুট্টির হাত ছাড়াতে কিছুতেই সে পারছে না।

কুট্টির মাথায় কিছু আসছে না— শুধু, ইস্ এ কী হয়ে গেল!— এ কী হয়ে গেল— কী করবে এখন? তারপর হিস্‌হিসিয়ে চাপা গলায় বলে— বুটি তুই থাম, বুটি তুই থাম, আর আমি কোনদিনও করবো না!

সে বলতেই থাকে— বুটি তুই থাম। বুটি তুই থাম!

বুটির মুখের কোণ থেকে তবু শব্দ বেরিয়ে আসছে। কুট্টির বাঘটা ছোট এক মেষশিশু হয়ে যায়—সে কাঁপা গলায় বলে, বুটি আমাকে তুই দয়া কর! আমাকে মাফ্ কর। বুটি তুই শব্দ করিস না রে। তোর মুখ চেপে ধরছি শুধু এই শব্দ থামাতে বুটি, তুই থাম। দয়া করে তুই চুপ কর—

বুটির মুখের শব্দ একটু একটু করে কমছে। কুট্টির হাতের চাপও আলগা হয়ে যাচ্ছে। বুটির চোখ থেকে আতঙ্কের অন্ধকারটা ক্রমে কমে আসছে— হাত আরও আলগা করে কুট্টি এবারে তার মুখটা ছেড়ে দিল।

বুটি জোরে জোরে দম নিয়ে হাঁফাতে থাকে। কুট্টি একটা বড়ো নিঃশ্বাস ছাড়ে— দম সে-ও নেয়। তারপর বুটিকে অবাক করে হঠাৎ সামনে ঝুঁকে

কুন্তি তার হাঁটুতে হাত রেখে বলে— এই ত্মাখ বুটি, আমি তোর পায়ে ধরছি, তুই যেন কাউকে বলিস না। আমাকে তুই ক্ষমা কর বুটি—

বুটি তার পা দুটোকে টেনে নেয়। সে এখনও বুঝতে পারছে না কী হয়েছিল, কী হচ্ছে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে এবাড়ির মেজদাবাবুকে দেখছে। মেজদাবাবু বলছেন— বল, আমাকে কথা দিলি ?

নিজের অজ্ঞাতে কোন কারণে বুটির দুচোখ ভরে জল উপছে উঠেছে। দু-গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওর বুকের ওপর। সে আঁচল তুলে চোখ মুছল। সেটা নামিয়ে আস্তে আস্তে বুকের ওপরে জড়িয়ে নিল। কুন্তি আর কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পায় বুটি। হাতের কাটা জায়গায় দারুণ ব্যথা লাগছে— সেদিকে তাকিয়ে ত্মাখে, না, রক্ত বের হয় নি। আঁচলটা সরিয়ে সেই বুকটার দিকে ত্মাখে যার ওপরে মেজদাবাবু হাত দিয়েছিলেন— কী অবাক কাণ্ড!

এবারে সে মেঝের ওপরে বসে পড়ে। একটু সময় চুপ করে বসে থাকে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের একধারে গিয়ে দাঁড়ায়। এখন দুপুর— রাস্তায় শুধু দু-একটা লোক চলছে। কিছুই ভালো লাগছে না— কী যে হলো তা বুঝতেও পারছে না। ঘরের মধ্যে ফিরে আসে আবার। এবারে সে বাড়ি চলে যাবে— এখানে আর কি করবে ও ?

বুটি নিচে নেমে এল। মেজদাবাবুর ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে। চোখ মাটিতে নামিয়ে জায়গাটা পার হয়ে গেল। দরজাটা খোলাই আছে। বুটি না তাকিয়েও দেখেছে, মেজদাবাবু খাটের একপাশে বসে আছেন।

কুন্তিও বুঝল বুটি চলে যাচ্ছে। নিশ্চয় এখন বস্তিতে যাবে। কুন্তির সেই পায়ে ধরায় হয়তো কাজ হয় নি— ও গিয়ে একে-ওকে বলবে। তারপর ? কী হবে তা কুন্তি সঠিক জানে না। শুধু এটুকুই জানে যে, যা ঘটবে তা সামাল দেবার সাধ্য তার নেই— সেখানে ওর বুকের চওড়া ছাতি কিংবা হাতের মোটা কবজি দুটো কোন কাজেই লাগবে না।

খাটের ওপরে আবার শুয়ে সে ছাদের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে কতো আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। শেষে একসময় মুখ ফিরিয়ে পাশ বালিশের ওপরে সেই পুজো সংখ্যাটা চোখে পড়তেই জোরে একটা লাথি মেরে সেটাকে মাটিতে ফেলে দেয়।

॥ চার ॥

সত্যসন্ধবাবুকে সুহাস যখনই বলেছে— কাকাবাবু, ভালো আছেন ? তিনি বলেছেন, আছি।

তারপরে আরও কিছু তিনি বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, সুহাস তখন এগিয়ে গেছে। ওকে একদিন ডেকে ভালো করে সব বলতে পারলে হয়! সুহাস কি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারে না তাঁর বেকার ছেলে টুকলার জন্যে ? বড়ো ছেলেটা টাটায় চাকরি করে— বৌ নিয়ে সেখানেই থাকে। মাসে দুটো টাকাও সে ঠেকায় না। অবশ্য ছোট ছেলেটাকে সে নিজের কাছে রেখেছে— বাজার করা, ফাই-ফরমাশ খাটা এ সব কাজে লাগে বলেই হয়তো। কিন্তু এখানে যে আরও চারটে পেট আছে তা কি করে চলে ?

বাড়ির দুটো ঘরের একটা তিনি ভাড়ায় দিয়েছেন— গুদাম হিসাবে ভাড়া। ফুটো ছাদ, ভাঙা মেঝেয় মানুষ কি আর ভাড়া দিয়ে থাকবে ? তবু তাতেই মাসে তিরিশ টাকা পাওয়া যায়। সেটা কম নয়, কিন্তু বাড়ির ট্যাক্স দিয়ে যা থাকে তাতে চারটে পেট কি করে চলবে ?

একেবারে না খাওয়া সুহাস! একবেলা খেতাম দুদিন পরে পরে। তাও শুধু শুকনো রুটি— তুমি যদি দেখতে। কিন্তু এখন একটু সুবিধা হয়েছে। মেয়েটা কোথায় যেন কাজ পেয়েছে— ফুরনের কাজ। কখনও বেশি কাজ থাকলে বেশি পায়, নয়তো কিছুই নয়।

তবু উপবাস কমে গেছে। কিন্তু ওইটুকু মেয়ে— ওর পড়া হলো না, বিয়েও যে কবে হবে তার ঠিক নেই। আর, বিয়ে দেবোই বা কি দিয়ে ? টাকা কোথায় ? আরও একটা কথা সুহাস, ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমরা খাবোই বা কী ?— আমরা দুই বুড়ো-বুড়ি ? ছেলেটার কথা না-হয় না ধরলাম।

মনে মনে সুহাসের সঙ্গে এ-রকম কথা বলতে বলতে তিনি বাড়ির দিকে গলির মধ্যে ঢুকলেন। ছোট্টুলালের দোকানটা তিনি পার হয়ে এসেছেন। মনটা খারাপ হয়ে আছে একটু নস্যির কথা ভেবে। পাঁচ পয়সার নস্যি কিনতে পারলে হতো। নেশার জন্য নয়, সেটা অনেকদিন চলে গেছে— শুধু সেই

পুরনো গন্ধটার জন্য এখনও মাঝেমাঝে মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছা তিনি দমন করেন— টুনুকেও বলেন না। তাকে উনি অনেক কিছু চেয়েছেন।

মনে মনে সুহাসের সঙ্গেই আবার কথা বলে ওঠেন— ক্ষুধা যাকে দমন করতে হয়, তার কি কোনো নেশা থাকে? না, সাধ? না কি থাকা উচিত?

গলিটুকু পার হয়ে এবারে তিনি বাড়ির সামনে পৌঁছেছেন। সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করেন— ওখানকার সেই ভাঙা ইটগুলো কোন জায়গায় আছে। ওগুলোর কথা ভাবতেই তাঁর ভয় হয়— পায়ের নিচে একদিন নড়ে গিয়েছিল, একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছেন। লাঠি সামনে বাড়িয়ে পরীক্ষা করেন, তারপর উঠে যান। ইটগুলোকে সরিয়ে ফেলতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু তাতে আবার পাশের ইটও খুলতে শুরু করবে।

বারান্দার দিকে ঘরের দরজাটা খোলা। ভিতরে ঢুকেই ডাক দেন— টুনু।

কোনো উত্তর না পেয়ে আবার ডাকেন— টুনু এসেছে?

টুনুর উত্তর নেই, তার মায়ের সাড়া নেই, তবে সে গেল কোথায়? দরজাটা এদিকে খোলা! এবারে একটু জোরে তিনি বলেন— ওগো শুনছো, টুনু এসেছে?

এতক্ষণে ভিতরের দিকে ক্ষীণ একটা শব্দে বুঝতে পারেন যে টুনুর মা কলঘর কিংবা রান্নাঘর থেকে উত্তর দিয়েছে।

কিন্তু ওদের বিবেচনা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান— ঘরটা একেবারে খোলা রেখে দিয়ে? যে কোন লোক তো এখন ঘরে ঢুকতে পারতো।

কিছুই তাঁর হিসাবমতো হয় নি কোনদিন, আজও হয় না। আগে তাঁর হিসাবে না মিললে তিনি রা.. করতেন, ধমক দিতেন, অন্যেরা বুঝে চলতো। কিন্তু, সে এক প্রায়-ভুলে-যাওয়া অতীতের কথা— যেন স্বপ্নের মতন। আজ তিনি শুধু মৃদুভাবে জানান। তাতে কেউ না শুনলে মনের মধ্যে খুব গোপনে একটু দুঃখ পান। দুঃখটা কম নয়, তবু নিজের কাছেও প্রকাশ করার সাহস না থাকায় সেটা অমনি ক্ষীণ হয়ে আসে। দেহে যার পুষ্টি নেই, শক্তি নেই, চোখে যার দৃষ্টি নেই, একটা টাকা কোথাও থেকে আনার মতো ক্ষমতা নেই— তার ওই পর্যন্তই ভালো। তার চেয়ে বেশিটা আর মানায় না।

টুনুর মা ঘরে ঢোকার সময় তাই তিনি মৃদুস্বরে বলেন— আসার সময় দেখলাম দরজাটা খোলা, তোমরাও কেউ ঘরে নেই, আমি বেশ চলে এলাম।

কিন্তু এরকম কথার মানেও অভ্যাসের ফলে টুনুর মায়ের চেনা। গলায়

খানিকটা ঝাঁজ দিয়ে তিনি বলে ওঠেন— খোলা ছিলো তো হয়েছে কী ? ঘরে তো লাখ লাখ টাকার সোনার গয়না আছে ! সব চোরে নিয়ে যেতো তো ভালোই হতো—

সত্যসন্ধবাবু চুপ করে যান। কথাটা বলে যে ভুলটা করেছেন তার জন্য আফশোষ করেন। টুনুর মা বলতে থাকেন— কী নিতো চোরে ? তোমার ওই ছেঁড়া তোষক আর বালিশ ?— বিক্রি করলে যার চার আনা দাম নেই, নিয়ে যেতে তিন টাকা খরচ ! নাকি রান্নাঘরের সব ভাঙা হাঁড়ি আর ফুটো এনামেলের থালা বাসন ?

একটু দম নিয়ে তিনি আবার বলেন — ওগুলো চোরে কি নেবে ? রাস্তায় ফেলে দিয়ে ছাখো, ভিখিরিতেও কুড়িয়ে নেবে না।

টুনুর মায়ের সব কথাগুলো সত্যি নয়, তা সত্যসন্ধবাবু জানেন। এনামেলের থালা ফুটো হলে ভাত তাতে খাওয়া যায়, কিন্তু হাঁড়ি ফুটো বা ভাঙা হলে, আর গেলাসে ফুটো থাকলে তাতে কাজ চলে না। কিন্তু এ সব কিছু না বলে তিনি চুপ করে থাকেন। যে ভুল একবার করে ফেলেছেন তাতেই যথেষ্ট হয়েছে, আর কথা বলার সাহস তাঁর নেই।

তবুও প্রসঙ্গটা হয়তো ওখানেই শেষ হতো না টুনু না এলে। ঠিক সেই সময়েই টুনু ঘরে ঢুকে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবার মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ে রয়েছে। মায়ের মুখের বিদ্রুপ আর রাগের শেষ চিহ্ন তখনও মিলিয়ে যায় নি— এসব টুনুর অনেকদিনের চেনা— সে অনুমানই করতে পারে তার আসার আগে এখানে কি চলছিল, তবু মাকে কিছু না বলে সে বাবার দিকে ফিরে বলে— আবার তুমি রাস্তায় অতো দূর বেরিয়েছিলে ?

না, বেশি দূরে তো যাই নি—

যাও নি ? সুহাসদা যে বললেন তোমাকে ওই লণ্ড্রীর ওপারে দেখেছেন।

সত্যসন্ধবাবু ধরা পড়ে যাওয়ার মতো মুখের ভাব করেন।

টুনু বলে—কতোদিন তোমাকে বলেছি ছোট্টুলালের দোকানটা তুমি পার হবে না। কিন্তু একটু ফাঁক পেয়েছো কি অমনি --

এই সব কথার মধ্যে টুনুর মা ঘর থেকে বের হয়ে যান। টুনু সেদিকে একটু তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার বলে— বলো, আর কোনদিন তুমি একা একা অতো দূরে যাবে না—

আচ্ছা, যাবো না, হলো তো ?

টুনু জানে এই প্রতিজ্ঞা তাঁর থাকবে না। কটা দিন হয়তো মনে রাখবেন, তারপর ভুলে আবার চলে যাবেন লাঠি ঠুক ঠুক করে, মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে—তবু সে এখন আর কিছু বলতে চায় না। একটু আগে তার মা-ও হয়তো অনেক কিছু বলেছেন, টুনুও বলেছে কম নয়— মেজাজটা বড়োই তার খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন—

কিস্‌মিস্ এনেছিস টুনু ?

এবারে তার হাসি পায়। বলে— তার সঙ্গে একটু খেজুরও এনেছি। তবে বেশি নয়, শুধু তোমার জন্যে—

কৃতজ্ঞতায়, মমতায়, করুণায়— সত্যসন্ধবাবুর মন উথলে ওঠে তাঁর এই মেয়েটির জন্য— এখনও ওর স্কুল কলেজে পড়ার কথা, খেলা হাসি গল্প গান নিয়ে থাকার কথা, কিন্তু তার বদলে ও নিজেই কাজ খুঁজে নিয়েছে। ফুরনের কাজ। কিছু রোজগার করে এনে তবু দু-মুঠো খাওয়াচ্ছে সবাইকে— উপবাস কমে গিয়েছে এখন। আর লক্ষ্মী পুজোর দিনে যা হোক কিছু ভালো মন্দ কিনেও টুনু আনে— বিশেষ করে তাঁরই পছন্দমতো— এই মেয়েটা আগের জন্মে তাঁর মা ছিলো নিশ্চয়।

সুখের আবেশে তাঁর ছানি পড়া চোখ দুটো যেন বুঁজে আসে এবারে— গলার মধ্যে আবেগের এক কান্নার মতো ডেলা সরিয়ে প্রায় বদ্ধ স্বরে তিনি বলেন— তুই একটু কাছে আয় মা—

কেন, কাছে এসে কী হবে ?

তোকে একটু দেখবো।

বাঃ! আমাকে আবার দেখবে কী ? টুনু একটু হেসে উঠে বলে— কী দেখার আছে আমায় বলো তো বাবা ?

তবু সে এগিয়েও আসে।

সত্যসন্ধবাবু তার মুখে হাত বোলান, কপালে হাত রাখেন— তুই বেশি যেন পরিশ্রম করিস না মা— তিনি নরম স্নেহ ভরা গলায় বলেন—

টুনু চুপ করে থাকে। একটু ভয় ওঠে মনের মধ্যে— বাবা যদি বুঝতে পারেন কোনদিন টুনুর কাজের কথা ?

একটু চুপ করে থাকার পর সত্যসন্ধবাবু আবার বলে ওঠেন— জানিস টুনু, তুই যখন খুব ছোট, আমার কোলে থাকতে কী ভালো যে বাসতিস আর

আমাকে অফিসে বের হতে দেখলেই সে কী কান্না তোর! কেউ ভোলাতেই পারতো না তোকে।

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে দম নেবার জন্যে তিনি একটু থামেন। তাঁর শীর্ণ মুখের কোঁচকানো চামড়াগুলো বিরল এক হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর বলেন— আর জানিস, আমি তোকে কী করে ফাঁকি দিতাম? খাওয়া শেষ হলে আমার জামা-কাপড়গুলো তোর মা আমাকে পাশের ঘরে দিয়ে আসতো, পরে আমি গলির পিছন দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতাম— তুই বুঝতেও পারতিস না। আবার একটু থেমে তিনি বলেন— আমার কিন্তু ইচ্ছে করতো তোকে নিয়ে বসেই থাকতে, কিন্তু কাজে বের না হলে খাওয়ার পয়সা কী করে জুটবে তা তুই না বুঝলেও আমাকে তো ভাবতে হতো!

কতোকাল আগেকার সেই সব সুখ আনন্দের স্মৃতির স্পর্শ যেন সত্যসন্ধবাবুর কণ্ঠস্বরেও এখন— আবেগে তাঁর গলা প্রায় কান্নার মতো শোনায়— টুনু, সেই ছোট্টবেলাটি থেকেই আমার ওপর কী যে তোর টান।

বলে তিনি থেমে যান।

কাজ। কাজে বের না হলে খাওয়ার পয়সা জোটে না— কতো পুরনো, কতোবার শোনা একটা কথা— তবু টুনুর মনে আজ অন্য একটা জায়গায় ঘা লেগে যায়। সেই আঘাতের ব্যথা, তার সঙ্গে বাবার ভালবাসা— আনন্দ বেদনা সব একসঙ্গে মিশে টুনুর দু-চোখে জল ভরে দেয়। গালের ওপর দিয়ে বয়ে এসে সত্যসন্ধবাবুর হাতের ওপরে পড়ে টুনুর চোখের জল।

একী তুই কাঁদছিস?— চমকে উঠে তিনি বলেন।

টুনু আস্তে আস্তে বাবার হাতটা সরিয়ে দূরে সরে যায়।

সত্যসন্ধবাবু চুপ করে বসে কথা খুঁজছেন। টুনু শুধু ভাবছে— এই সবের পরেও আজ তাকে কাজে বের হতে হবে—হাতে যা টাকা ছিল আজকের বাজার করতে সব শেষ হয়ে গেছে, কাজ না করলে খাওয়ার টাকা জোটে না— বাবা ঠিকই বলেছেন!

বাবা সেই সত্যযুগের মানুষ। তিনি জানেন না কাজও এ যুগে কতো রকমের হতে পারে।

কিন্তু যদি জানতে পারেন কোন দিন?

এক অন্ধকার আতঙ্ক যেন টুনুর সামনে দাঁড়িয়ে— না, না। তা হতে পারে না কিছুতেই— টুনু নিজেকেই শব্দহীন উত্তর দেয়— আরও একটু সাবধান হবো

আমি নিজে। কিন্তু— একটা অশুভ ভাবনা টুনুর মনে চলে এসেছে হঠাৎ— এই ভাবনাটা কিছুদিন হলো তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

টুনু একটু কাছে আয় মা— টুনুর দিকে দু-হাত বাড়িয়ে বাবা ডাক দিচ্ছেন আবার।

বাজারের কাপড়টা ছেড়ে স্নান করে আসি, তারপর তোমার কাছে এসে বসবো।

এ কালের মেয়ে, তবু সবই খেয়াল আছে— সত্যসন্ধবাবু ভাবেন। ভেবে খুশি হন।

টুনু বাজারের থলিটা তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে রান্নাঘরে তার মায়ের কাছে চলে যায়। মা ওর দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন, তাঁর অবয়বটা দেখামাত্র কেমন এক বিতৃষ্ণায় টুনুর মন ভরে ওঠে— মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না।

তারই ঝাঁঝ ফুটে উঠেছে টুনুর গলায়— রইলো বাজার, খেজুর আর কিসমিসগুলো সবই বাবার জন্যে এনেছি— দেখো বাবাকেই যেন দেওয়া হয়। দাদা যেন সব গিলে না ফ্যালে।

টুনুর বলার মধ্যে একটু আদেশের সুর আছে। মাঝে মাঝে আজকাল এ-রকম ভাবে কথা বলে টুনু। মা তার সামনে মাথা নোয়ান। তিনি বুঝেছেন এমনি সময়ে কোন উত্তর দেওয়া উচিত নয়।

পিছন ফিরে থলিটা তিনি তুলে নেন। জিনিষগুলোকে বের করেন। টুনুটা আগে এরকম ছিল না, এখন দিন দিন যেন কী রকম হয়ে যাচ্ছে। তবু বাবার ওপরে টানটা তার একই রকম আছে— বরং যেন বেড়ে গিয়েছে আজকাল।

কয়েকটা আনাজ, আলু, তার ওপরে ফল। টুনুর মা জানেন, টুনু এসব ফল তার বাবার পছন্দমতো কেনে। ঘরের দরজা দিয়ে চোখটা কলঘরের দিকে চলে যায়। ওখানে টুনু স্নান করছে—

ওই টুনু যখন ছোট ছিল! টুলটুল টুকুন আর টুনু। ওদের বাবা। তিনি নিজে—অনেকদিন আগেকার এক অতীতের মধ্যে ফিরে গেছেন। সব অন্য রকম ছিল। সবই সুখের ছিল।

তাঁর নিজের বাবার কথা মনে পড়ে। তিনি সত্যসন্ধবাবুকে খুবই অন্য চোখে

দেখতেন— তিনি বলতেন, উমা, তোকে যার হাতে দিয়েছি তাঁর মতো খাঁটি মানুষ, অমন গুণী! তোর বড়ো ভাগ্য রে।

খুব ভালো লাগতো ওই কথা শুনে। সত্যি, উনি সব মানুষের থেকে কতো তফাৎ ছিলেন। কাজ থেকে ফিরে এসে গান গাইতে বসতেন। ছেলেরা কাছে বসে শুনতো। রাত্রে উমার পাশ থেকে উঠে কখন যে ছাদে চলে যেতেন তা জানতে পারা যেতো না, শুধু বাঁশীর শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলে বুঝতেন মানুষটা পাশে নেই।

সেই সব দিন! স্বাস্থ্যবান সেই গান আর বাঁশীর মানুষটা এখন কী হয়ে গিয়েছেন। হাতের জিনিষগুলো নামিয়ে উমা কোনো অতীতকে দেখতেই যেন রান্নাঘর থেকে বের হয়ে উঠোন পেরিয়ে এসে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ান। অতীতের মানুষটা খাটে হেলান দিয়ে অন্য চেহারায় বসে আছেন। খাটের নীচে হারমোনিয়ামের জায়গাটা খালি হয়ে পড়ে আছে অনেকদিন ধরে। শুধু তাকের ওপরে তোলা সেই বাঁশের বাঁশীগুলো এখনও রয়েছে— কতোদিনকার ধুলোয় সব ভর্তি হয়ে আছে।

কতোকাল ওগুলোতে হাত পড়ে নি কারও। ওঁর তো হাঁফানীরও রোগ। উমাও ওগুলোকে আর ঝেড়ে মুছে রাখেন না। মুখ থেকে একটা নিঃশ্বাস তাঁর অজান্তেই বেরিয়ে আসে। তারপর ভাবেন, এবার থেকে হপ্তায় অন্তত একদিন ওগুলোকে মুছে পরিষ্কার করে রাখবেন।

আজকের ঝগড়াটা বাধাবার কিছু দরকার কি ছিলো? কথাগুলো একটু রূঢ় হয়ে গেছে কা?

হয়েছে। নিশ্চয়ই হয়েছে।

আমার কোন দোষ নেই কিন্তু! মাথায় কিছুই যে ঠিক থাকে না আজকাল।

ঠিক আছে, এবার থেকে বুঝে চলবে।

চেষ্টা কোরবো। খুব চেষ্টা কোরবো।

শব্দহীন এই সব কথা বলে ও শুনে তিনি ধীর পায়ে নিঃশব্দে রান্নাঘরে ফিরে যান।

ঠিক সেই সময়ে টুনু স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করে তার শরীর পরীক্ষা করছিলো। কিছুদিন ধরে রোজ সে এরকমই করছে। একটা ভয় তার মনের মধ্যে কিছুকাল এসেছে— তার কারণও আছে। পর পর দু মাস তার যৌবন পরিষ্কার হয় নি।

টুনু তার বুক দুটোর দিকে তাকিয়ে ছাখে— এগুলো কি আরও একটু ভারি হয়ে উঠেছে ? এমনিতেই তো ওর একটু বাড়ন্ত বুক— কিন্তু এখন যেন আরও একটু বেশি বলে মনে হচ্ছে।

বুকের থেকে চোখ সরিয়ে সে তলপেটের দিকে তাকায়। হাত বুলিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে— এটাও কি আগের মতো আছে ? না, আর একটু উঁচু হয়ে উঠেছে ? প্রায় তো আগের মতোই। কিন্তু একটু যেন— ?

কিন্তু এরকম তো হতেই পারে শরীর কিছুটা মোটা হলে ! মোটাই কি ও আগের থেকে বেশি হয়েছে ? নিজের হাতগুলোর দিকে, পায়ের দিকে সে ভালো করে তাকিয়ে ছাখে। তবু ঠিক বোঝা যায় না কিছু !

আবার সে তলপেটের দিকে তাকায়। নাভি-কুণ্ডলীর নীচটায় ভালো করে লক্ষ্য করে। মাথা সামনে বাড়িয়ে তলপেটের উপর দিয়ে ঊরুর কতোটা পর্যন্ত দেখা যায়, পিছনে হেলিয়ে নিলে হাঁটুর ঠিক কোন জায়গাটায় চোখ পড়ে তা সঠিকভাবে ছাখে— মনে করার চেষ্টা করে আগের হপ্তায় অমানভাবে ঠিক কোন জায়গাটা সে দেখতে পেতো ? তার আগের হপ্তায় কী রকম ছিলো ? তারও আগে ? আগের মাসে ? আরো আগে যখন এই ভয়টা তার মনে আসে নি সে-সময়ে কিরকম ছিলো ?

সব মনে পড়ে না। কিছুই যেন তফাৎ নেই। তবু একটু কেমন যেন—

উঃ, পুরো দুটো মাস পার হয়ে গিয়েছে ! এখন তো তিন মাসের কাছাকাছি ! কী যে হলো, কে জানে।

টুনুর চোখের সামনেকার এই শরীরটা তার ফুরোনের কাজে পুরুষের চোখের সামনে অনাবৃত হয়েছে। তার বাড়ন্ত গড়ন, যৌবনের ভরন্ত বুক তাদের খুশিও করেছে— ওর স্বাস্থ্যটা সত্যিই ভাল। টুনু নিজেও এককালে তার প্রথম যৌবনের সেই ভরে-ওঠা শরীরটাকে বিস্ময়ের চোখ দিয়ে দিনের মধ্যে কতোবার কতো ফাঁক খুঁজে দেখতো—দেখে সে অবাক হয়ে যেতো — ঠিক এমনিই যে ? এ যেন কোনো রাজকন্যার মতো যে এবারে রাণী হতে চলেছে — কোন স্বপ্নদেশের—

কী আনন্দ যে হতো তার নিজের শরীরটা দেখে !

কিন্তু আজ শুধু ভয়। ঘৃণা তার নিজের ওপর, আর সেইসব পুরুষদের ওপরে যারা টুনুর এই দেহটা নিয়ে খুশি হয়েছে, দামও দিয়েছে, টুনুর এই পেটটা ভরেছে—

পেটের ওপর থেকে তার হাতটা নাভি-কুণ্ডলী পার হয়ে এখন তলপেটের ওপরে গিয়েছিল—একটু কী উঁচু ?

হে ভগবান, টুনু মনে মনে বলে— এই তলপেটটাকে পেটের এতো কাছাকাছি তুমি রেখেছো কেন আমার মতো মেয়েদের জন্যে ?

আমি যে বড্ডো গরীব। তুমি কি জানো না যে আমি যা করেছি তা বাবার জন্যে, মায়ের জন্যে, দাদাটারও জন্যে, আর আমার এই পেটটার জন্যে ? তুমি তো সবই জানো। তাই আমাকে তুমি যেন বাঁচিয়ে দিও ঠাকুর। আমার এই সন্দেহটা তুমি শুধু এবারের মতো মিথ্যে করে দাও।

বাবা, তোমার আশীর্বাদ যেন আমাকে এবারের মতো বাঁচিয়ে দেয় !

মা লক্ষ্মী, আজ আমি তোমার পূজোর জন্যে আমার শেষ টাকাটাও খরচ করে এসেছি— তুমিও একটু দেখো। তোমরা সবাই মিলে আমার সব ভাবনা মিথ্যে করে দাও !

সব প্রার্থনার শেষে টুনু মনে একটু আশ্বাস পায়— এখনও তো এ শুধু একটা সন্দেহই। কতো মেয়েরই তো এরকম কতো সময়ে হয়। তেমনি হয়তো তারও হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। এমনকি কালই হয়তো দেখবে— সব ভুল। শুধু আজেবাজে চিন্তাই সে করছিল !

এতক্ষণের অশুভ ভাবনাটা মন থেকে একটু সরে যেতে টুনু স্নান শেষ করে। শাড়ি ব্লাউজ পরে আবার বাইরে বেরিয়ে আসে।

বাবা খাটের ওপরে হেলান দিয়ে বসে আছেন। শুধু বসে থাকেন, আর শুয়ে থাকেন সারাদিন — আর কিছুই তো করবার নেই। চোখের জন্য প্রথমে খবরের কাগজ পড়া ছেড়েছেন। বই ছেড়েছেন তার পরে। বাঁশী বাজানোর তো কথাই ওঠে না ! কী বা আছে শরীরের আর ! গানও গান না। শরীর ঠিক না থাকলে, মনে সুখ আনন্দ না থাকলে গান সুর এ-সব কি আসে মানুষের।

টুনু নিজেও কি আর গান গায় ? না, নাচতে তার ইচ্ছে করে ? ওসব শেষ হয়ে গেছে এবাড়ির সবাইকার। ওরা পৃথিবীর নিচের দিকে থাকে। যারা গান গায় রেডিওয়, যারা নাচে— টুনু সিনেমায় দেখেছে যাদের— তারা সব স্বর্গের মানুষ— টুনুদের পৃথিবী থেকে তা অনেক দূরে। অনেক উঁচুতে।

—টুনু এসেছিস ? কাছে এসে বোস মা— বাবা ডাক দিয়েছেন। চোখে দেখতে পান না, তবু কি করে যে বোঝেন টুনু যখন ঘরে আসে

টুনু কাছে চলে আসে। খাটের ওপরে উঠে বাবার কাছে বসে। বেড্-কভারটা তার পাছার নিচে কুঁচকে গেছে। একটু আলগা দিয়ে সেটাকে সমান করে দেয়— এটা বেড্-কভার, এটাই বিছানার চাদর। বড্ডো ছিঁড়ে গিয়েছে— নতুন একটা না কিনলে আর চলছে না। এটার নীচে যে তোষকটা আছে তাও টুনু কাল দেখেছে— তোষক আর বলাই চলে না। শক্ত ডেলা ডেলা কিছু তুলো গলে যাওয়া কাপড়ের মধ্যে কোনমতে আটকানো। তার নীচে যে গদি আছে তা শুধু চাপড়া-বাঁধা নারকেল ছোবড়ায় যেন একটা পাথর।

টুনুকে এ সবই নতুন করতে হবে— এক একটা করে। খাটটা অমনিই থাক— টুনুর সাধ্যে কুলোবে না। পুরনো জিনিষ— এখনও আছে, থাকবে আরও কিছুকাল। ময়লা জমে পালিশটা যেন কালো শ্যাওলার মতো হয়ে আছে— থাক।

টুনুদের এই ঘরটা একদিন কী সুন্দর ছিলো। সব ঝকঝকে— নতুন। বাবার মুখেও সব সময় সেই উজ্জল হাসিটা ছিলো— টুনু, তোর জন্যে এই সিল্কের ফ্রকটা আনলাম— বাবা বলছেন সেই এক পুজোর আগে।

পুজো তো এসেই গেলো। টুনু এখনও বাবার জন্যে ধুতি কিনতে পারে নি। বাবা বসে আছেন টুনুর সামনে— ময়লা একটা মার্কিনের কাপড় লুঙ্গির মতো করে জড়ানো। সেই মার্কিন কাপড়েরই ফতুয়া একটা গায়ে— বাবা বলেন, ওতেই আমার বেশ চলে যায় রে টুনু।

বাবা, তোমার কী একটাও ভালো ধুতি নেই ?— সে হঠাৎ কী ভেবে যেন প্রশ্ন করে বসে।

আছে একটা, পুজোর সময় পরবো, কিন্তু তোর মায়ের সবগুলোই এমন ছেঁড়া যে—

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গিয়েছেন। এই ছোট একটা মেয়ে এতগুলো লোকের পেট ভরাচ্ছে, তাকে আর কিছু বলা উচিত নয়— কী লাভ বলে ? আর কতো কাজ সে করবে ? ফুরোনের কাজ যে খুবই পরিশ্রমের তা কে আর না জানে ?

টুনুও আর কথা বাড়ায় না। বাজারটা খারাপ চলছে, তবু তার আশা আছে যে পুজোর আগে সে বাবা-মা দুজনেরই জন্যে কিছু অন্তত কিনতে পারবে।

দাদার জন্যে কিন্তু কিছুতেই নয়! সেদিন বলছিল, তুই তো অনেক টাকা রোজগার করছিস টুনু, আমাকে পুজোয় এবারে কি দিবি ?

হ্যাঁ, দেব তোমাকে ভালো করে।

লজ্জা নেই। চোরও আবার। মায়ের শেষ গয়না সেই সরু হারটার কী হয়েছে তা কি টুনু জানে না?

সেটা হারিয়ে যাবার পরেই তো একটা টেরিলীনের প্যান্ট আর সার্ট হলো। কোন এক বন্ধু দিয়েছে— বাড়িতে বলল। মা বিশ্বাস করেছেন, বাবা তো সবাইকার সব কথাই চিরকাল বিশ্বাস করেন, কিন্তু টুনু ঠিক বুঝতে পেরেছে— সে এখন এই পৃথিবীর মধ্যে চলাফেরা করে— কিসে কী হয়, তা জানে। সে শিখেছে অনেক কিছু—

ঠিক সেই সময়ে ওর লুকনো সিগারেটের টিনটাও না টুনু আবিষ্কার করেছিল। তার একটা প্যাকেটের দামই তো দেড় টাকা। দামটা সে কি ভাবে জেনেছিল তাও মনে পড়ছে— হোটেলের বেয়ারাকে ডেকে লোকটা একটা দু-টাকার নোট দিল। একটা আধুলি ফেরৎ এসেছিল তা সে নেয় নি— বেয়ারা সেটা বখশিষ্ পেয়ে গেল।

লোকটার হাত বড়ো ছিল। কিংবা হয়তো মেজাজটাই তার ভালো ছিলো সেদিন— টুনুও তার আশায় থেকে কিছুটা বেশিই পেয়েছিল।

এক মুহূর্তে টুনুর ভাবনাটা আবার তার তলপেটের কাছে চলে গিয়েছে। আজকাল এমনিই চলছে— যা কিছু নিয়ে চিন্তা সে করুক, সেটা শেষ পর্যন্ত তলপেটের কাছে গিয়ে থামবে। সে যতো ভুলে থাকার চেষ্টা করে—ভোলা যায় না কিছুতেই।

আজই এ বিষয়ে একটা কিছু করতে হবে। কী করবে? নিজে কোনো ডাক্তারের কাছে যাবে? কিন্তু এখন তার হাতে টাকাই বা কোথায়? হ্যাঁ মনে পড়ছে— টুনু আজ লীলার কাছে যাবে। তারও এরকম হয়েছিল। সে টুনুকে বলেও ছিল— যদি কখনও কিছু খারাপ বুঝিস, আমাকে বলবি।

লীলাকে কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না। বড্ডো বাজে কথা বলে, ভীষণ ডাঁট দেখায়। তবু টুনু যাবে—

হঠাৎ চমকে ওঠে টুনু— তার দেহের ওপরে কিসের একটা স্পর্শ। তখনই বুঝতে পেরে স্থির হয়— বাবার একটা হাত এসে তার কোলের ওপরে পড়েছে। বাবার এতো কাছে বসে সে এতোক্ষণ কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল? হাতটা

কোথায় ঠেকেছে ? প্রায় তো তার তলপেটেরই ওপর। টুনুর আজকের সন্দেহটা যদি শেষ পর্যন্ত ঠিকই হয়, তাহলে বাবার হাতটা তো অশুচিই হয়ে গেল। টুনু তাড়াতাড়ি একটু সরে বসে।

তারপর খাটের ওপর থেকে নেমে এসে বলে— যাই, একটু দেখে আসি, মা কী করছে—

কিস্‌মিস্‌ খেজুরগুলো তুলে রেখে মা এখন বসে বসে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। টুনু সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মায়ের শাড়িটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে— বাবা ঠিকই বলেছেন, এটার কিছুই আর নেই। টুনু এতো চেষ্টা করছে তবু সবকিছু সামলাতে সে পারে নি। মায়ের দিকে তাকিয়ে এখন করুণায় তার মন ভরে ওঠে— একটু আগে সে মায়ের ওপরে রাগই করেছিল। তা হয়তো ঠিক হয় নি—

টুনু মায়ের পাশে বসে— দাও, আলুগুলো আমিই কাটছি, পুজোর ফলগুলো শুধু তুমি কেটো।

বঁটিতে বসিস তো সবই কাটবি, না হলে আমিই পারবো।

টুনু জানে যে মা পারবে। টুনুও পারে। কিন্তু কেন যে সে পুজোর ফল কাটতে চায় না, সেকথা মাকে এখন বলা যায় না।

সন্দেহটা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে তো হবেই একদিন।

আজ যেমন চলছে, তেমনি চলুক।

কিন্তু মা কি একটুও বোঝে না ? মেয়েরা মায়ের কাছ থেকে কবে কী লুকোতে পেরেছে ? কোন মেয়ে পারে ?

টুনু রান্নাঘর থেকে বের হয়ে আসে।

॥ পাঁচ ॥

পারচেজ অফিসার সুহাস ভৌমিক তখন তার চেম্বারে বসে কয়েকটা কোটেশনের রেট, কণ্ডিশন, স্পেসিফিকেশন মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিল। আপাত-দৃষ্টিতে নিতান্ত নিরীহ-দর্শন কোটেশনের মধ্যেও অনেক ফাঁক থেকে যায়, কিংবা ফাঁকে ফাঁকে এমনি কিছু শব্দ গোঁজা থাকে যা ভাল করে খুঁটিয়ে না দেখে নিলে শেষে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়।

'রীড্ বিটুইন দ্য লাইনস্' বলে ইংরেজি কথাটা রাজনীতির ক্ষেত্রে হামেশাই ব্যবহার হয়, কিন্তু সুহাস তার নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে যে ওই কথাটা আসলে পারচেজ অফিসারদের শেখানোর জন্যেই যেন বলা হয়েছিল। সুহাস ওই উপদেশটা মেনে চলে।

চোখের ওপরে ওই সব চিঠিগুলো রয়েছে— তাদের হরেক রকম রঙের লেটার হেড্— বেশির ভাগই মনোগ্রাম করা, কিন্তু চিঠির ওই সব সূক্ষ্ম প্যাঁচগুলো ঠিক মতো আজ ধরতে পারছে না সুহাস। অফিসে আসার সময় অনুপের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সেইসব দিনগুলোর কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ভুলতে পারছে না অলকার কথা। অমন জীবন্ত মেয়ে সে আজ পর্যন্ত আর একটাও ছাখে নি। যেখানে যখন সে থাকতো, সেখানেই যেন হাসির আর খুশির বন্যা বইয়ে দিতো।

সুহাসও মনে মনে তাকে একদিন চেয়েছিল। সরে এসেছে শুধু অনুপের জন্যে। আচ্ছা, অনুপটা ওরকম হয়ে গেল কেন ? অলকা মরে গিয়েছে বলে ? না, আরও কিছু কারণ আছে ? কিন্তু সুহাসের সঙ্গে অনুপের আজকের ব্যবহারের কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। অলকা মারা গিয়েছে, কিন্তু তার কী হয়েছিল সে প্রশ্নের জবাব দিতে ও কিছুতেই রাজি নয়।

কাগজগুলো সুহাসের সামনে নড়ে চড়ে চলে যায়। সুহাস মগ্ন হয়ে থাকে কতোদিন আগেকার সেইসব পুরনো দিনের মধ্যে। শেষে কাগজগুলোকে সে সরিয়ে রেখে দেয়— আজ থাক, কাল দেখা যাবে, নাহলে কোথায় কী ভুল করে বসবে তার কোনো ঠিক নেই—

টেলিফোন বেজে উঠেছে। সুহাস রিসিভার তুলে বলে— হ্যালো, ভৌমিক হীয়ার।

আমি দত্ত বলছি মিঃ ভৌমিক।

কী বলছেন বলুন।

আমি একটু আপনার অফিসে আসছি, আপনি কিছুক্ষণ আছেন তো ?

আছি ছুটি পর্যন্ত।

আমি দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি। আচ্ছা, নমস্কার মিঃ ভৌমিক—

নমস্কার—

রিসিভারটা সে নামিয়ে রাখে। ভদ্রলোক আসছেন। ওর কিছুই করার নেই। তবু বার বার আসছেন।

সামনের একটা ফাইল টেনে নেয় সুহাস। গুরুরী আর খুব জরুরী চিহ্ন লাগানো চিঠিপত্র এর মধ্যে আছে। অন্য কাজ কিছু হোক বা না হোক, এগুলোকে দেখে নিতে হবে। টেবিলের গায়ে লাগানো সুইচটা টিপে বেয়ারাকে ডাকে। সে এলে এক গ্লাস জলের জন্য বলে। জল খাওয়া শেষ করে আবার চিঠিগুলো দেখতে থাকে।

একটু পরে বেয়ারা একটা ভিজিটিং কার্ড হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। সুহাস ছাখে— মিঃ দত্তর কার্ড।

আচ্ছা, ওঁকে ডেকে আনো— সুহাস আবার চিঠিগুলো দেখতে থাকে।

দত্ত ঘরের মধ্যে ঢুকলেন— নমস্কার মিঃ ভৌমিক।

নমস্কার।

ভালো আছেন ?

হ্যাঁ, বসুন।

দত্ত বসে পড়েন।

এক মিনিট বসুন, এই চিঠিটা দেখে নিচ্ছি—

কিছুক্ষণ পরে সেটা সরিয়ে রেখে বলে— হ্যাঁ, বলুন।

দত্তর হাতে একটা দামী সিগারেটের টিন। সেটা বাড়িয়ে ধরে বলেন— হ্যাভ এ স্মোক্!

ধন্যবাদ, আমি নিজের ব্রাণ্ড ছাড়া অন্য কিছু খাই না।

সুহাস টেবিল থেকে নিজের প্যাকেটটা তুলে একটা সিগারেট বের করে নেয়। দত্ত ততক্ষণে জ্বালানো গ্যাস-লাইটারের আগুন ওর দিকে বাড়িয়ে

দিয়েছেন। সিগারেটটা তাতেই জ্বালিয়ে নিয়ে সুহাস বলে— আপনার চিঠিটা দেখেছি।

কিছু ঠিক করলেন?

আমার তো কিছু করার নেই মিঃ দত্ত, আমি আগেই বলেছি আপনাকে, যে টেণ্ডার আমাকে করতেই হবে শুধু আরেকটু দেখে—

আপনি কিন্তু ইচ্ছে করলেই পারেন, আগে যখন একবার টেণ্ডার হয়ে গিয়েছে, আমার এবারের কোটেশনও এসেছে—

সে অল্প টাকার ব্যাপার হলে পারতাম, কিন্তু এতো বড়ো একটা কাজে তা হয় না, করা আমার উচিতও নয় মিঃ দত্ত।

একটু সময়ের জন্যে চুপ করে দত্ত কি যেন ভেবে নেন, তারপর অনুনয়ের সুরে বলেন— মিঃ ভৌমিক, আমি কিন্তু খুবই আশা করেছিলাম। আর জানেন, এই অর্ডারটার দিকে তাকিয়েই আমি সেবার আমাদের রেটটা দিয়েছিলাম—

সুহাস একটু বিস্মিত হয়ে বলে—কিন্তু তখন তো এটার কোন স্কীম ছিলো না।

স্কীম থাকেই একের পর এক; আর, এর পরে আরও স্কীম আসবে—

সুহাস বেশ অবাক হয়ে গিয়েছে— এই অফিসে ও একজন অফিসার, সে জানতো না, অথচ দত্ত জানতেন? কিন্তু এ-বিষয়ে কোন কথা না বলে সে বলে— সেবারে ছিলো একটা স্মল রিকোয়্যারমেণ্ট, এখন দস্তুরমতো এক বাল্ক্ অর্ডার, তাতে রেট অনেক তফাৎ হবে আমার ধারণা।

কিন্তু ওদের তো উত্তর আসে নি—

তা আসে নি অবশ্য, তাই আজকের দিনটা অপেক্ষা করে কাল ওদের ফোন করবো, তারপরে টেণ্ডার তো আছেই—

প্লীজ্, মিঃ ভৌমিক, দেখুন আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী। তাই একটু কন্সিডারেশন আপনার কাছে আশা করেছি, আর জানেন, এই অর্ডারটা না হলে আমার খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে, কেন না এটারই ভরসায় আমি বড়ো অফিস নিয়েছি, লোক নেবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছি, কাজটা আমি পেলে কতগুলো বাঙালীর চাকরি হবে তা একবার ভেবে দেখুন—

এই একটা নরম জায়গা সুহাসের মনে। বড়ো পিছিয়ে যাওয়া জাত আজ বাঙালী, সব দিক থেকে চাপে পড়া— তবু সুহাস তার কী করতে পারে এই অফিসে বসে। ওর এখানকার চাকরি হলো শুধু তাদের কোম্পানীর স্বার্থ দেখাতে— অন্য কিছু ভাবার জন্যে ওকে মাইনে দিয়ে রাখা হয় নি—

দত্ত তখনও সুহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে তার উত্তরের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। সুহাস মৃদু গলায় উত্তর দেয়— আমি দুঃখিত মিঃ দত্ত, আমাদের একটা আইন আছে, আমার ওপরে একজন বস্ আছেন, তারপর বছরের শেষে অডিটও আছে, আর কি জানেন, এ আমার নিজের টাকা নয়, যে আমি যা খুশি করতে পারি—

ঠিক এখনই আপনার ফাইন্যাল কথাটা বলবেন না প্লীজ মিঃ ভৌমিক, আরেকটু ভেবে দেখুন দয়া করে, আপনার বাড়িতে আমি দেখা করবো, আরো কিছু কথা আছে যা এখানে বলা যায় না—

না, না বাড়িতে কেন? বাড়িতে আমি কারও সঙ্গে অফিসের কথা বলি না—

দত্তর দেওয়া ছোট্ট ইঙ্গিতটুকু ফেরৎ হয়ে গেছে। তিনি ভাবতে থাকেন এর পরেও কী বলা যায়? তারপর তিনি বলে ওঠেন— আপনি কিন্তু পারতেন! আপনার বস্ বাসু-সাহেবের কথা বলছিলেন, আমার মনে হয় তিনি কোনো আপত্তি করবেন না—

আপনি তো তাহলে সবই জানেন— দেখছি! যেমন আপনি জানতেন যে আমার বাড়িতে গিয়ে কথা বলা যায়—

সুহাসের কথার মধ্যে যে সুরটা ছিল তার মুখে চোখে যে বিরক্তির চিহ্ন ছিল, তা দত্তকে বিস্মিত করে। তিনি বোঝেন যে সুহাস রেগে গিয়েছে। কোনো মানুষ একবার রেগে গেলে তাকে দিয়ে কাজ আর হয় না তা তিনি জানেন। তাই যথাসাধ্য নরমভাবে লজ্জা মেশানো গলায় বলেন— আই অ্যাম ভেরি সরি মিঃ ভৌমিক। আমাকে মাফ করবেন ভুল যদি কিছু বলে থাকি। প্লীজ, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কিছু মানে করে ও কথা বলিনি।

সুহাস আর কোনো কথা বলে না। দত্তও চুপ করে আছেন। এতো দ্রুত তাঁর বলা উচিত হয় নি। সত্যিই, বড়ো ভুল তিনি করে ফেলেছেন। সেটা আরও একবার বুঝিয়ে বলবেন কিনা ভাবছেন, তখনই সুহাস বলে— আর কিছু কথা আছে মিঃ দত্ত?

এটা দত্তকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত তা তিনি বোঝেন, বলেন— না, আর কি কথা।

তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠেন— নমস্কার মিঃ ভৌমিক, এখন আসি তাহলে?

নমস্কার— সুহাস বলে।

দত্ত চলে গিয়েছেন। সুহাস একটু আগেকার কথা ভাবছে। একটু লজ্জাই লাগে ওর। বড়োই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল সে হঠাৎ। শুধু সুহাসের বস্

বাসু-সাহেবের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্যে। সুহাসের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার কথা শুনে নয়— সেটা কোন নতুন ব্যাপার না। এই চেয়ারে বসে ও রকম সে কতোবার শুনেছে।

সুহাসের একটু খারাপই লাগছে ওই মানুষটার কথা ভেবে — যদি সত্যি উনি কাজটার আশায় বড়ো অফিস নিয়ে থাকেন, তাহলে কিছু ক্ষতি ওঁর হতে পারে। কিন্তু তাই বা উনি নিলেন কেন ? আগে তো কাজ। তারপরে অফিস—

আর সুহাসই বা কি করতে পারতো ? তার চাকরির আইন আছে, আছেন ওপরে বস্ বাসু-সাহেব, আরও আছে তার নিজের প্রিনসিপল্— যে কোম্পানীর চাকরি সে করছে তার স্বার্থই শুধু দেখবে— কোয়ালিটি, আর রেট। তাছাড়া শুধু একটা ব্যাপার আছে— ডেলিভারির সময়। আর কিছুই নেই— বাঙালী-অবাঙালী, চেনা-অচেনা, আত্মীয়-অনাত্মীয় নেই—ঘুষ তো কিছুতেই নয় !

ঘুষের কথাটা বলার জন্যেই না দত্ত তার বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। সুহাস বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাঁকে ফেয়ার এণ্ড ফ্রী কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়েই আসতে হবে। এলে সুহাসের আপত্তি কি আছে ?

বরং সে খুশি হবে — দত্ত যখন এতো চেষ্টা করছেন। অন্যেরা তো চিঠির উত্তরই দেয় নি—

কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা এসে খবর দেয়, বাসু-সাহেব ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সারাদিন ডাক আসে এ-রকম— পারচেজ অফিসারকে কনট্রোলার অফ স্টোরস এ্যাণ্ড পারচেজের সব সময়ে দরকার। সুহাসের হাতে একটা সন্ত-ধরানো সিগারেট জ্বলছিল। সেটাকে এ্যাশ-ট্রের ওপরে জ্বলন্ত রেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বাসু-সাহেবের ঘরে ঢুকে সুহাস দ্যাখে যে— দত্ত-ও ওখানে বসে আছেন। কী যেন কথা হচ্ছিল, সুহাস ঢুকতেই তা থেমে গিয়েছে।

আপনি আমাকে ডেকেছেন স্যার ?

হ্যাঁ বোসো— একটা চেয়ার চোখের ইঙ্গিতে দেখান বাসু-সাহেব, তারপর দত্তর দিকে ফিরে বলেন— আচ্ছা, মিঃ দত্ত, আপনি এখন আসতে পারেন, আমাদের একটু কাজ আছে—

দত্ত উঠে তাঁকে নমস্কার করেন। করেন সুহাসকেও। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

দত্ত একজন পাকা করম্যাল মানুষ— সুহাস ভাবে— নমস্কার উনি সব সময়ে করেন। বড়র সামনে ছোটকে নমস্কার অনেকেই করে না— দত্ত কাউকে বাদ দেন না কখনও।

দত্ত যাবার পরে বাসু-সাহেব সামনের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত।

সুহাস বসে থাকে তাঁর কথা শোনার অপেক্ষায়— খুবই কাজের মানুষ— এমনিভাবে কাজ করতে করতে কথা বলেন। ফোনে কথা বলার সময় কাগজ উল্টে সই করে যান— সুহাস বিস্মিত হয় তাঁর কাজের ক্ষমতা দেখে। সে শ্রদ্ধাও করে তাঁকে—

—দত্তর ব্যাপারটা কী হলো? বাসু-সাহেব চোখ কাগজে রেখেই প্রশ্ন করেন।

এখনও কিছু হয় নি স্যার। চিঠি দিয়েছিলাম তিনটে কোম্পানীকে, আপনাকে তো বলেছি। মিঃ দত্তর কোটেশন এসেছে, আগেরবারের থেকে একটু কম রেট। অন্য দুটো কোম্পানীর জবাব এখনও আসে নি স্যার—

তাহলে তো আর অপেক্ষা করা উচিত নয়!

তাই ভাবছি ওদের একবার ফোন করবো, তাতেও উত্তর না এলে টেণ্ডার ডাকবো ঠিক করেছি—

ফোন করার কিছু দরকার আছে?

কিন্তু চিঠি দেওয়া আর ঠিক হবে কি স্যার? না হলে আবার তো চিঠি দিতে হবে।

তা না করে দত্তকেই বলো না, আরও কয়েকটা কোটেশন ওই নিয়ে আসুক—

তা ঠিক হবে না স্যার। এটা অনেক টাকার কাজ। অবশ্য ওই দুটো লীডিং পার্টির রেট থাকলে টেণ্ডার না করলেও চলতো—

আমার মনে হয় ওদের ফোন না করাই উচিত, কেন না চিঠির উত্তর যখন ওরা দেয় নি—

তাহলে টেণ্ডার ডাকি স্যার?

তাতে তো অনেক সময় নষ্ট হবে। এদিকে যখন আর্জেন্সী—

আর্জেন্সী তো তেমন কিছু নেই স্যার—

তুমি ঠিক জানো?

জানি স্যার—

তবু কিছু দরকার ছিলো কী? দত্তরা যখন আগের থেকেই আছে, আর

সেবারে টেণ্ডারও হয়েছে, তাতে তো ওরাই লোয়েস্ট হয়েছিল, তাছাড়া মালও যখন ওদের ভালো—

সুহাস ক্রমেই বুঝতে পারছে যে বাসু-সাহেব দত্তর দিকে টানছেন। এ-ঘরে ঢোকার সময় দত্তকে বসে থাকতে দেখেই তার প্রথম মনে হয়েছিল, বাসু-সাহেবের সঙ্গে তাঁর কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতেও, তারপর থেকে এতোক্ষণ যতো কথা হয়েছে তাতে সে ধারণাটা তার বদ্ধমূল হয়েছে। মনে পড়ছে দত্তর ওপর কি রকম রেগে উঠেছিল সুহাস বাসু-সাহেবের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্যে, তার উত্তরে সে কি বলেছে— সব।

তারপর বাসু-সাহেব এখন দত্তকেই কাজটা দিতে চান। দিতে উনি পারেন। তবে সুহাসকে ওই ফাইলটা কেন দেওয়া হয়েছে? এতো বড়ো একটা কাজের সমস্তটাই তো বাসু-সাহেবের ডীল করার কথা।

মালটা ওদের খুবই ভালো ভৌমিক—

রিপোর্টটা ভালো ছিলো স্যার— কিন্তু মালটা সে রকম নয়।

তাহলে রিপোর্ট ভালো হলো কি করে?

তা আমি বলতে পারবো না স্যার। তবে মালটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। স্যাম্পেলের থেকে অনেক খারাপ—

তবু কাজ তো চলেছে?

চলেছে স্যার, কিন্তু চলা উচিত ছিলো না, তাই আমি ভেবে রেখেছি যে এবারে যারাই অর্ডার পাক, প্রতিটি ডেলিভারি স্যাম্পেলের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আমি করবো।

কোনো কোম্পানীর মালই যে স্যাম্পেলের মতো হয় না তা তোমার জানা উচিত!

সেটা আমি জানি স্যার, ইনস্পেকসন ঢিলে হওয়ার জন্যেই তা হয়ে থাকে। কিন্তু তা স্যাম্পেলের মতোই হওয়া উচিত!

এই উচিত শব্দটা কানে ঠেকতেই সে একটু চমকে ওঠে। বাসু-সাহেব বলেছিলেন— জানা উচিত। সে বলেছে হওয়া উচিত— ঠিক একই শব্দে। একই রকম সুরে। সে আশ্চর্য হয়— যে বাসু-সাহেবকে সে এতো শ্রদ্ধা ও সমীহ করেছে বরাবর— তাঁরই সামনে সুহাস এতক্ষণ সব উত্তর ঠিক ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে — এই প্রথমবার সে পারছে। সুহাস তার কথাটা শেষ করে— তা না হলে আর স্যাম্পেল নেওয়ার কি দরকার স্যার?

বাসু-সাহেব এতক্ষণে কাগজ থেকে চোখ তুলে তাঁর নীচের অফিসার—বরাবরের কথা-শোনা, স্যার বলে কথা-বলা এই অদ্ভুত লোকটিকে দেখছেন। এর পরে কী বলা উচিত তা সঠিক না ভাবতে পেরে তিনি বলেন—জিনিষ দেখলেই চলে না, রেটটাও তো দেখা দরকার—

সুহাস উত্তর দেয়— সেজন্যই তো টেণ্ডার ডাকবো ঠিক করেছি স্যার।

টেণ্ডার তো ডাকাই হয়েছে একবার।

সেটা দশ হাজার টাকার ব্যাপার ছিলো। এবারে বাইশ লক্ষ— এক কথা নয়। রেট অনেক কমতে পারে—

সুহাস বলেই চলেছে। তার গলার স্বরও বদল হয়ে যাচ্ছে, এখন একটু জোরের সঙ্গে সে বলে— আরও একটা কথা আছে স্যার— এটা শুধু আমার-আপনার ব্যাপার নয়। এর পরে আছে অডিট— যা সব কিছু খুঁটিয়ে ছাখে—

বাসু-সাহেব রেগে উঠেছেন অনেকক্ষণ আগেই। তিনি গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলেন— ভৌমিক, সেটা তোমার ভাববার বিষয় নয়।

সুহাসের গলাও নরম হয়ে আসে, সে ঠিক তেমনি ভাবেই বলে— তাহলে স্যার, আমার আর স্টেটমেণ্ট্ তৈরি করার কী দরকার? এর সবটাই আপনি ডীল করুন। ফাইলটা আমি আপনার কাছে দিয়ে যাচ্ছি।

ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, বিরক্ত বাসু-সাহেবের চোখে মুখে বিস্ময়—ফাইলটা দিয়ে যাবে?

হ্যাঁ স্যার, বারোশো টাকা মাইনের এক চুনো-পুঁটি আমি। বাইশ লক্ষের ধাক্কা সামলাতে পারবো না—

বাসু-সাহেব এই উদ্ধত নি॰ র অফিসারের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নেন সামনের কাগজগুলোর দিকে। একটু চুপ করে থাকার পরে বলেন— ফাইলটা এখন তোমার কাছেই থাক।

কয়েকটা কাগজ উল্টে উল্টে সই করে যান। তারপর বলেন— আচ্ছা তুমি এখন এসো ভৌমিক।

সুহাস উঠে পড়ে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, কান দুটো গরম, এয়ার-কুলার-চালানো এই ঘরটাও কি অসহ্য গরম! বাসু-সাহেব ভালো করেছেন তাকে যেতে বলে।

তারপর সুহাস নিজের কামরায় ফিরে এসেছে। তার সামনে সব যেন

গোলমাল। কী হয়ে গেল! সুহাস ঠিক এরকম চায় নি। বাসু-সাহেব যদি অন্তভাবে ওকে বলতেন তাহলে সে ভাবার সময় পেতো— ভেবে দেখতো।

কিন্তু সবকিছু ভাবার পরেও কী করতো সে?

সুহাস ভেবে পায় না। সে চাকরি করে তাদের কোম্পানীর। তারই স্বার্থ ও প্রথম দেখতে বাধ্য। বাসু-সাহেবের কথাও মেনে চলা তার উচিত। কিন্তু তিনিও তো ওই কোম্পানীর একজন বড়ো চাকর— সুহাসের ওপরের। এ টাকা কী তাঁর নিজের যে সুহাসকে দিয়ে তিনি যাকে খুশি দেওয়াতে পারেন?

তবু খুব খারাপ করেছে সুহাস তার বস্-এর সঙ্গে ওইভাবে কথা বলে। একটা সম্পর্ক— প্রায় নিজের বড়ো দাদার মতো সে এতোদিন দেখেছে বাসু-সাহেবকে! তাঁরই সঙ্গে এরকম হয়ে গেল।

সুহাস স্থাণুর মতো বসে। সে ভাবছে। ভাবছেই। বেয়ারা এসে বাসু-সাহেবের ডাক জানিয়ে দেয়। সুহাস উঠল। তাঁর সামনে গিয়ে এখন কীভাবে সে কথা বলবে? চোখের দিকে তাকাতেই তো পারবে না—

সুহাস ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাসু-সাহেব মাথা নীচু করে কাগজ উল্টে যাচ্ছেন। এ-রকমই ভালো—সুহাস বেঁচেছে।

শোনো ভৌমিক, তোমাকে বলা হয় নি, আমাদের ম্যাড্রাস অফিস থেকে একজন ভালো লোক চেয়েছে। ওদের ওখানে পারচেজের কাজ ভালো হচ্ছে না,— তাই একজন এক্সপিরিয়েন্সড্ ভালো লোক চায়। আমি ভাবছি তোমারই নামটা রেকমেণ্ড করবো, তুমি নিশ্চয় রাজি আছো?

সুহাস কোনো উত্তর দিতে পারে না। বাসু-সাহেব তাকে আণ্ডার বেল্টে নক্-আউট পাঞ্চ দিয়েছেন— এখন দাঁড়িয়ে থাকাই তার পক্ষে মুস্কিল— কথার উত্তর দেওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার—

আচ্ছা, তুমি এখন এসো ভৌমিক। কাল তোমার উত্তরটা জানিয়ে দিও—

সুহাস ফিরে আসে। সে এখন একটা অর্থহীন সুন্দর ঘরের মধ্যে বসে— কাচ আর প্লাইউড দিয়ে তৈরি, দেয়ালে সুন্দর রং করা, দামী একটা সেক্রেটরিয়েট টেবিলও সামনে, তার ওপরে টেলিফোন আর কাগজ, ফাইল—

এ-সব ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে কোথায় সেই ম্যাড্রাসের অফিসে। ছেড়ে যেতে হবে তার জন্মের কলকাতা— তার পাড়া— সেই সব চেনা পথ,

চেনা গলি, চেনা মানুষ— যাদের সঙ্গে সুহাসের আত্মার যোগ কোনদিনও যাবার নয়, যারা আজও সুহাসকে দেখলে কুশল প্রশ্ন করে, যাদের দেখে সুহাসও বলে, ভালো আছো ? ভালো আছেন ?

সেই সব মানুষ হয়তো সুহাসের থেকে অন্য স্তরের— কেউ উঁচু, কেউ বা নিচের, তবু তারা সবাই ওর পাড়ার লোক। তাদের কাউকে ও জ্যাঠামশাই বা কাকাবাবু বলে, ওকে কেউ দাদা কিংবা কাকাবাবু বলে— এটাও একরকমের আত্মীয়তা বলে তার বিশ্বাস, তাই তাদের পাড়ার মধ্যে কতো নিজের মানুষ সুহাসের। তাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে—

ছেড়ে যেতে হবে তার জন্মের বাড়িটা যেখানে আজ পর্যন্ত তার জীবনের আটত্রিশটা বছরের সবটাই কেটেছে। সুহাসের ছেলেটাকে এখানকার স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, তার জন্যে সুস্মিতাকে থাকতে হবে, থাকবে রিনকুও, আর সুহাস চলে যাবে এক অনাত্মীয় নির্বান্ধব অপরিচয়ের শহরে যেখানে সে শুধু একজন অমুক অফিসের অমুক অফিসার, অমুক রাস্তার অতো নম্বর বাড়ির এতো নম্বর ফ্ল্যাটের এক বাসিন্দা। কিন্তু এই কলকাতার সব কিছু কতোকাল ধরে তার আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। ওদের পাড়াটা আজ হয়তো অন্যরকম হয়ে গেছে, তবু সেখানকার প্রতিটি নতুন বাড়ি দেখলে তার আজও মনে পড়ে যায়— আগে সেখানে কোন মাঠ ছিলো, কোন পুকুর ছিলো— তাদের ধারে ধারে কী সব গাছ ছিলো—

ঠিক এই মুহূর্তে সুহাসের মনে হচ্ছে তার এই কলকাতা আজ যতো কুৎসার শহর হোক, যতো নোংরা হোক, যতো শব্দের বা ধোঁয়ার হোক, তবু তাকেই সুহাস ভালোবাসে— যেমন মানুষ মাকে ভালবাসে তাঁর রূপের কথা না ভেবে—

কলকাতা ছেড়ে গিয়ে সুহাস কোথাও থাকতে পারবে কী ? যেতে তো হবেই। বাসু-সাহেব কম কথা বলেন, কিন্তু যা বলেন তা করেই ছাড়েন। আর আজকের মতো এতো কথা সুহাস তাঁর মুখে কোনোদিন শোনে নি।

ওঁর সঙ্গে গোলমাল করে সে ভালো কাজ করে নি— যদিও মনের মধ্যে ভাবতে পারছে না, এ ছাড়া আর কী সে করতে পারতো, কি করা উচিত ছিলো ? যখন তার প্রিন্‌সিপল্ একদিকে, ওর ব্যক্তিত্বও সেদিকে, আর অন্যদিকে শুধু অন্যায়— যে অন্যায়কে সুহাস ঘৃণা করে সমস্ত অন্তর দিয়ে— না হলে এই কলকাতায় সে আজ অন্তত দুটো বাড়ি করতে পারতো। তাই সুহাস এখনও জানে যে সে ঠিক কাজ করেছে। তবুও—

এই ভবুটা ওকে এতো পেয়ে বসছে কেন? সুহাস কী এখনও বাসু-সাহেবের সঙ্গে মিটিয়ে নিতে চায়? কে জানে! সে এখনও কিছুই বুঝতে পারছে না।

তবু সুহাস ভেবেই চলেছে—

ফোন বেজে ওঠে— শুধু ফোন আর ফোন! সুহাস বিরক্ত হয়ে রিসিভার তুলে নেয়— হ্যাঁ বলুন,

আমি দত্ত বলছি মিঃ ভৌমিক—

চমকে ওঠে সুহাস— আবার দত্ত! সেটাকে সামলে নিয়ে বলে— বলুন—

আপনার টেবিলে কি একটা সান-গ্লাস ফেলে এসেছি?

সুহাস টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে, কই নেই তো?

তাহলে কোথায় ফেললাম কে জানে! বাসু-সাহেবকেও ফোন করলাম— ওখানেও নেই, উনি টেবিলের তলা চেয়ারের তলা সমস্ত দেখে বললেন। গাড়িতেও ফেলি নি, ড্রাইভার বলল—

সুহাস বলে ওঠে— একটু ধরুন, আমি ওদিকটা একটু ভালো করে দেখে আসি—

বলে ফোন নামিয়ে যেদিকে দত্ত বসে ছিলেন সেখানে চেয়ার আর টেবিলের তলায় দেখে এসে রিসিভারটা আবার তুলে নিল— না মিঃ দত্ত, আমার ঘরে নেই—

তাহলে হয়তো রাস্তায় কোথাও ফেলেছি—

হতে পারে— সুহাস বলে।

আচ্ছা নমস্কার মিঃ ভৌমিক—

নমস্কার—

সরি ফর ডিসটারবিং ইউ মিঃ ভৌমিক—

না, তাতে আর কি আছে—

আচ্ছা তাহলে রাখি এখন?

ঠিক আছে—

রিসিভারটা নামিয়ে রাখে সুহাস। দত্তর সান-গ্লাসটা সুহাস আগেও ছাখে নি। উনি যখন ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলেন সে সময়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করে— সান-গ্লাস তো ছিলো না! ওঁর টেরিলীনের দামী সার্টটায় কোন বুক-পকেট ছিলো না— থাকে না আজকাল কোনো দামী সার্টেই। প্যান্টের সাইড-পকেটেও থাকার কথা নয়। কেন না, আজকালকার ছাঁটের কোনো প্যান্টের পকেটে

একটা সান গ্লাস রেখে চেয়ারে বসা যায় না। টেবিলের ওপরেও রাখেন নি দত্ত—ওখানে শুধু তাঁর সেই সিগারেটের টিনটা ছিলো—সুহাসের বেশ মনে আছে—কয়েকবার সে ওটার দিকে তাকিয়েছে— টেবিলের ওদিকটা পরিষ্কার— কোনো সান-গ্লাস থাকলে সুহাসের চোখে পড়তো নিশ্চয়ই—

হঠাৎ সুহাসের মনে আরেকটা চিন্তা আসে—তবে কি সান-গ্লাসের ব্যাপারটা দত্তরই কল্পিত, সুহাসকে আরেকবার বাজিয়ে দেখার জন্যে, কিংবা তাকে একথা জানাতে যে বাসু-সাহেব ওঁর সান-গ্লাস খুঁজতে চেয়ার ছেড়ে উঠে এদিকের চেয়ার আর টেবিলের তলা নিজে খুঁজে গেছেন— সুহাস যাতে বুঝতে পারে—

আর, তারই মধ্যে এটুকুও একভাবে জানানো যে বাসু-সাহেবের সঙ্গে এর মধ্যে তাঁর একটু যোগাযোগ হয়ে গিয়েছে টেলিফোন-মাধ্যমে, আরও তার ফলে তিনি জানতে পেরেছেন বাসু-সাহেব এখন কোন রাস্তা ধরেছেন।

হতে সবই পারে। আর যদি সুহাসের এই চিন্তাটা ঠিক হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে দত্তর মাথায় যা বুদ্ধি আছে তাতে সুহাসকে অনেকবার তিনি কিনে বেচতে পারেন।

তাছাড়া আরও একটা কারণ থাকতে পারে, তা হলো সুহাসের সঙ্গে আরেকবার কথা বলে সেই আগেকার মতো সুন্দর একটা নমস্কার জানিয়ে একরকমভাবে জানানো যে ম্যাড্রাস-অফিসে বদলি না হওয়ার পথ এখনও খোলা আছে—দত্তর হাতটা বাড়ানোই রয়েছে।

কিন্তু দত্তর সঙ্গে বাসু-সাহেবের ঠিক কতোটা আঁতাত? কি জন্যেই বা হতে পারে? সুহাস যতোদূর জানে তাতে ওর ধারণা যে বাসু-সাহেব ঘুষ নেন না— কন না এখনও তিনি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। অথচ মাইনেও উনি কম পান না। তার ওপরে ঘুষ নিলে ভালো একটা বাড়ি তো নিশ্চয়ই হতো ওঁর। কিন্তু এ কথার জবাব ওকে কে দেবে? পারতেন দিতে দত্ত—যদি সুহাস তাঁকে বাড়িতে আসার কথা বলতো। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

আবার ফোন। তবে কি দত্তরই নাকি? রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়ে ভাবে, যদি দত্তই হন, তাহলে সুহাস একটু অন্যভাবে কথা বলবে। ম্যাড্রাসে চলে যদি যেতেই হয়, যাবে। কিন্তু তার আগে জেনে যাবে এখানকার ব্যাপারটা আসলে কি-রকম চলছে?

হ্যালো—সুহাস বলে—ভৌমিক বলছি।

কে সুহাস? আমি অনুপ বলছি রে!

অনুপ, তুই?—সুহাস চমকে উঠে বলে।

হ্যাঁ, শোন, তোকে তখন একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। একটু ভাঁট দেখিয়েই তো নেমে এলাম, অথচ বলারও ইচ্ছে ছিলো, আমার জন্যে একটা কিছু তুই করে দিতে পারিস ভাই? লেখাপড়া তো শিখেছি কিছুটা। যা হোক একটা গতি আমার করে দে, যা করি তা আর পারছি না—

কী আমি করে দিতে পারি বল?

যে কোনো একটা চাকরি। শ'দুয়েক টাকা মাইনে হলেই চলবে—কিছু একটা বাঁধা আয় আমার খুবই দরকার রে ভাই।

কিন্তু চাকরি আমার কাছে কোথায়? চাকরির যা বাজার তা তো জানিস।

কতো জায়গায় তো তোর চেনাশোনা, অতো বড়ো একটা পোষ্ট-এ যখন আছিস।

অনুপের কথা শুনে ম্লান একটা হাসি ফুটে ওঠে সুহাসের মুখে। অনুপের পক্ষে তা দেখা সম্ভব নয়, সে শুধু সুহাসের কথাগুলো শুনতে পায়—পোষ্টটা যে কী রকম বড়ো তা যদি জানতিস।

সুহাস প্লীজ, আমাকে ভুল বুঝিস না—খুব দরকার না হলে আমি তোকে বলতাম না, এতবছর পরে আজ প্রথম তোর সঙ্গে দেখা হলো! জানিস—আসলে তোর সঙ্গে দেখা হবার পরেই আমার মনে হয়েছে যে যা আমি করছি তা উচিত নয়—

এতো সব কারণ দেখবার কোনো দরকার নেই। তোর জন্যে যদি কিছু করতে পারি তাহলে আমি নিজেই খুব খুশি হবো, কিন্তু আমার যে কী ক্ষমতা—

না-না, ক্ষমতার বাইরে গিয়ে তোকে আমি কিছু করতে বলছি না, আমার উচিতও নয় বলা। শুধু যদি তোর সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে আমার কথাটা যেন ভুলিস না—

ঠিক আছে আমি চেষ্টা করে দেখবো অনুপ, যদি পারি। আর, যদি এখানে কিছুদিন থাকতে পারি—

কেন, যাবি আবার কোথায়?

না, এখনই যাচ্ছি না। তবে ঠিক কিছুই নেই। শোন, তুই সামনের সপ্তায় আর একবার ফোন করিস, তখন যা খবর থাকে দেবো—আর শোন অনুপ, এখন তুই কোথায় আছিস?

তোর অফিস থেকে কিছুটা দূরে—

পাঁচটার পরে একবার দেখা করতে পারবি? যেখানে তোর পছন্দ, বল, আমি সেখানেই যাবো।

না, আজ উপায় নেই রে। বড্ডো কাজ আছে, আচ্ছা, তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত কী বল?

না-না, লাইনটা ছাড়িস না অনুপ—সুহাস ব্যস্তভাবে বলে ওঠে। তার চোখে তখন অনুপের সেই ছেঁড়া চটি আর আধময়লা পাজামা-পরা চেহারাটা ভেসে উঠেছে—কতোটা ঠেকায় পড়ে অনুপ ওকে ফোন করেছে কে জানে।

সুহাসের তো মনে হচ্ছে—

এক লহমার ভাবনার পরে সুহাস বলে ওঠে—অনুপ, তোকে তখন বলা হয় নি, তোর কী আজই কিছু ঠেকা আছে?

কিসের ঠেকা?

এই ধর না কেন— আমার অবশ্য বলা উচিত নয় তোকে, তবু বলছি— কিছু টাকার ব্যাপার যদি হয়— আর আমার সাধ্যের মধ্যে যদি কুলোয়—

অনুপের গলা একটু গম্ভীর শোনায়— কতো টাকা তুই দিতে পারিস?

এই ধর পঞ্চাশ কি একশো। একটা একশো টাকার নোট তো আমার ব্যাগেই আছে।

উল্টো দিক থেকে অনুপের হাসির শব্দ আসে। তার মানে আমার এই তার দিয়ে বাঁধা চটিটা, একটা সার্ট আর একটা পায়জামার দামের ওপরে আরো কিছু ফাউ— এই তো?

হাসির শব্দ থেমে এবারে একটু বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর— ছেঁড়া আমার আরও অনেক জায়গায় রে। সব জোড়া দিতে পারবি না, যদি পারিস তো যা হোক একটা কাজ দেখে দিস।

অনুপের কথায় সুহাস একটু লজ্জা পায়, সে বলে— চেষ্টা করে দেখবো। টাকার কথা বললাম বলে কিছু খারাপ ভাবলি না তো?

বাঃ খারাপ কেন ভাববো। তোর আর আমার অবস্থা অদল বদল হয়ে গেলে আমিও তো তোকে দিতে চাইতাম, মানে দিতে চাওয়া আমার উচিত ছিলো— যদি আমি তোর মতো উদার পারতাম।

তুই এখন বেশ কথা গুছিয়ে বলতে পারিস দেখছি।

এটুকু না পারলে কবে আমি ধুয়ে মুছে যেতাম রে, যেখানে রয়েছি সেখানেও থাকতাম না।

আচ্ছা, তাহলে রাখি— সুহাস বলে—

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ তোকে আটকেছি।

রোজ রোজ এ রকম আটকাবি বুঝেছিস—

দেখা যাবে, ছাড়ছি এখন— অনুপের শেষ কথা।

রিসিভার নামিয়ে রাখার পরে সুহাসের মনে পড়ে দত্তর সেই কথাটা— অফিসে অনেক বাঙালীর চাকরি হবে। অনুপের কথা তাঁকে বলা চলতো— দত্ত সুহাসের কথা নিশ্চয়ই রাখতেন— কিন্তু উপায় নেই। সুহাস আজ তার সারাজীবনের প্রিন্‌সিপল্‌-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একটা লড়াই সুরু হয়েছে— শব্দহীন, রক্তহীন। তার ফলটা যে কী হয়, কোনো ঠিক নেই। সুহাস নিজের জন্যেই হাত মেলানোর কথা ভাবে নি, অন্য কারও জন্যে তা সে করবে না—

॥ ছয় ॥

বুটি বেরিয়ে এল রাস্তায়—

একটু এগিয়ে ছোট্টুলালের দোকান। দুটো বাড়ির পরে সুহাসদের বাড়ি। তারপরে আরও কয়েকটা বাড়ি আর রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে দুটো গলি ছাড়িয়ে এসে রেলের লাইন। ডান দিকে ঢাকুরিয়া স্টেশন। লাইনের ওপারে একটু এগিয়ে বুটিদের বস্তি।

বস্তির সামনে হরেক রকমের দোকান। এখানকার দোকানগুলোর চেহারা অনেক আলাদা— ওপরে টালি অথবা পিচের ড্রাম-কাটা টিনের চাল, দরমা বা মুলিবাঁশের বেড়ার দেওয়াল। সামনের কাউন্টার অধিকাংশই বাঁশ-বাখারির বা পেরেক-ঠোকা কাঠের। আলমারি শো-কেস বেশির ভাগই পুরনো প্যাকিং-বাক্স দিয়ে তৈরি।

দোকানগুলোর মাঝে এক জায়গায় কয়েক হাত চওড়া একটা মাটির পথ ভিতরের দিকে চলে গেছে যেখানে জমিদারের দেড় বিঘা জমিতে প্রায় আড়াইশো ঘরের প্রতিটি ঘরে এক একটি পরিবার বাস করে।

এই বস্তিটা ঢাকুরিয়া ও বালিগঞ্জের একটা বিরাট অংশে বহু রকম মানুষের জোগান দেয়— ঠিকে ঝি, চাকর, রাঁধুনী, জোগাড়ে, রং কল ও রাজমিস্ত্রী,

ছুতোর, তরকারি ও মাছঅলা, ফেরিঅলা, মসলা-মুড়িঅলা, অভাব ও স্বভাব ভিখারী, ছিঁচকে চোর, বৈরাগী-বাবাজী— এমন অনেক ধরনের মানুষ।

ওখানে বুটির মতো পুরুষ-জাগানো স্বাস্থ্যবতী মেয়ে আছে কয়েকটি, আছে কয়েকজন স্বাস্থ্যবান যুবক যারা স্বভাবতই উচ্চাকাংখী হওয়ার কখনও ওয়াগন ভাঙে, কখনো বা ছিনতাই, মদ চোলাই ইত্যাদির কাজ করে।

অনেক ধরনের কুটীর-শিল্পও ওখানে আছে— ঘুঁটে-তৈরির, ঘিয়ের— 'খুব ভালো ঘি আছে মা। দেশ থেকে আনা'— অর্ধেক ঘি আর অর্ধেক দালদা দিয়ে যা তৈরি হয়, দই-য়ের কারখানাটা লগনশার বাজারে খুবই কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে। চোলাই মদের ঘাঁটিটা পুলিশকে যথোচিত সেলামী না দেওয়ায় উপস্থিত ভালো মতো চলছে না।

ওখানেই রকমারি মানুষের ভিড়ে বুটিরা একটা বারো টাকা ভাড়ার ঘরে থাকে— পুরনো ভাড়াটে হওয়ায় মাসে তিনটাকা কম। ওদের বাড়িটার এক সারিতে বাইশটা ঘর— দৈর্ঘ্যে ছ-হাত, প্রস্থে পাঁচ হাত, শাল বল্লির খুঁটির মাথায় বাঁশের ওপরে টালির ছাদ, দেয়াল বাঁশ, বাগারি ও দরমার। মেঝের মাটির ওপরে ইট, একফালি মাটির বারান্দা প্রতিটি ঘরের সামনে যার এক কোণে চট টাঙিয়ে বৃষ্টির সময় ছাড়া অন্য সব সময়ে রান্নার কাজ চলে।

বাড়ির পথে যাওয়ার সময় বুটি প্রথম বাধা পেল রেল লাইনের ওপরে দাঁড়ানো মালগাড়িতে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে যখন পেছন দিয়ে চলে যাবার কথা ভাবছিল, তখনই গাড়িটা চলতে শুরু করে এক সময় পথ খালি করে দিল। বুটি উদভ্রান্তের মতো চলতে লাগল আবার ওদের বস্তির পথে।

তারপর বস্তির মধ্যে ও যখন ঢুকে গিয়েছে তখনই পায়ে একটা হোঁচট খেয়ে মাটিতে বসে পড়ল বুটি। মাটিতে বসানো জোড়া জোড়া ইটগুলোর একটায় হোঁচট খেয়েছে সে। বর্ষার দিনে জমা জল-কাদার মধ্যে হাঁটার জন্য ওগুলো পেতে দেওয়া হয়েছিল। এখনও আছে সেখানেই। উনুন পাতার জন্য কেউ তা তুলে নিয়ে যায় নি।

ইস্, নখের কোল দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। বুটি হাত দিয়ে আঙুলটা চেপে ধরে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে রক্তের দিকে তাকায়—আজ দিনটাই খারাপ।

ওর আশেপাশে দু'একজন মানুষ ও কয়েকটি উলঙ্গ শিশুর দল এক মুহূর্তে জমা হয়ে যায়—কী হয়েছে রে বুটি? একজন বলল।

খুব লেগেছে নাকি? দেখি, দেখি— বলে আর একজন ওর সামনে ঝুঁকে পড়েছে— কেষ্ট।

বুটি তার দিকে চোখ তুলেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। কেষ্ট ওয়াগন ভাঙার সর্দার ছিলো, এখন বড়ো পার্টিতে ঢুকেছে।

কেষ্ট আবার বলে— শালা, ইটগুলো সব উপড়ে তুলে দিতে হবে।

বুটি কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়। পায়ের যন্ত্রণায় একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে বস্তির গলি ঘুরে ঘুরে ওদের ঘরের দিকে চলে। কেষ্টকে সে একটুও পছন্দ করে না।

ঘরের দরজাটা বন্ধ। মা শুয়ে পড়েছে হয়তো। ভিতরের হুড়কো কি লাগানো আছে? নাকি ভেজিয়েই রেখেছে মা? দরজাটায় ঠেলা দিলো বুটি— কাঠের ওপরে লাগানো কেরোসিনের টিনগুলোয় ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠলো। মা সাড়া দিলো না। তবে কি ঘরে এখন কেউ নেই? দরজাটা তাহলে খোলা কেন?

ঘরের মধ্যে ঢুকেই বুটি দরজাটা বন্ধ করে দিলো। কেষ্ট যে ওর পিছনে পিছনে এগিয়ে আসছে বলে মনে হয়েছিল তা যে ভুল নয় সেটা বোঝা গেল দরজা বন্ধ করার সময়। ওদের তিনজন এখন গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে— বুটি দেখতে পেল। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সেদিকে একটু চেয়ে থাকে। মনে মনে বলে—বদমাইশ।

তার পিছনে মা শুয়ে ছিল বুটির ভাইটাকে নিয়ে পুরনো ঢালাই তক্তার চৌকির ওপরে। ইটের ওপরে তক্তাগুলো সাজানো। তার ওপরে একটা মাদুর— উপরটা একটু অসমতল, তবু খুব মজবুত চৌকি। বুটিরা এজন্য নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে, কেন না এই বস্তির অনেকেই শুধু মেঝের ওপরে শোয়।

দরজার কাছ থেকে সরে এসে মায়ের গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে বলে—একটু সরে শোও। মা নড়ে না, উত্তরও দেয় না,। এই দুপুরে কি যেন ঘুম লেগেছে মায়ের।

বুটি আবার ঠেলা দিয়ে গলা একটু চড়িয়ে বলে— মা, সরো না। আমাকে একটু জায়গা দাও।

মা হঠাৎ চোখ খুলে বুটিকে দেখে বলে— কি রে, তুই ককোন এলি?

এই তো এলাম, এখানেই শোবো, সরো একটু।

বাবুদের বাড়ীতে না শুয়ে একানে চলে এলি যে—

মা বুটির জন্তে একটু জায়গা করে দিয়ে বলে— তুই তো বলেছিলি দুপুরে

থাবার পরে এতোদূর আসতে ইচ্ছে করে না। তাই না আমি গিন্নিমাকে বোলে—

মা কথা শেষ করার আগেই বুটি বলে ওঠে— না, ওদের বাড়িতে দুপুরে আর কোনদিনও থাকবো না।

বুটির মা এতক্ষণে উঠে বসে মেয়ের মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে— শুধু শুতে আসার জন্তেই নয়— বুটির কথার ভঙ্গি, তার গলার সুর সবই যেন অন্যরকম লাগছে।

কী হয়েছে বল তো ?

কিছুই হয় নি।

কিছু হয় নি মানে ? মা আবার প্রশ্ন করে।

বুটি হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে— আঃ। অতো চেঁচাচ্ছো কেন তুমি ?

মা অবাক হয়ে যায়— বুটি বলছে, অতো চেঁচাচ্ছো কেন— অথচ সে নিজেই চেঁচিয়ে বলছে। ব্যাপারটা কী ? মেয়ের মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে বলে— বলবি নি ? লুকোচ্চিস্।

বুটি এতক্ষণ ধরে অনেকবার ভেবেছে মা-কে বলা উচিত হবে কিনা ? একবার মনে হয়েছে মা-কে তো সব কথাই বলা যায়। তখনই মনে পড়েছে মেজদাবাবুর সেই পায়ে ধরার কথা। আবার ভেবেছে— মা-কে বললে আর কি আছে। তবু শেষ পর্যন্ত স্থির করেছিল মা-কেও সে বলবে না, অথচ এই মুহূর্তে সব গোলমাল হয়ে যায়— মেজদাবাবু ঘরে ঢুকে আমার গায়ে হাত দিয়েছে—

গায়ে হাত দিয়েচে ? —চমকে উঠে মা বলে। তারপর পাশে ঘুমন্ত ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে, দুধারের বেড়ার দিকে চোখ বুলিয়ে আবার বলে— কোন্ জায়গায় হাত দিয়েছে ?

বুটি এতক্ষণে তার ভুলটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু কথাটা ফিরিয়েই বা আর নেবে কি করে ? তাই মাঝখানের পথটা ধরে মায়ের কথার উত্তর দেয়— এই বুকের কাছটায়, শুধু একটু ছুঁয়েছিল, আর কিছু নয়—

মায়ের গলা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে— নয় মানে ? বুকে হাত দিয়েচে— তার আবার— বলতে বলতে বুটির ব্লাউজের দিকে চোখ পড়তে আরও জোর গলায় বলে ওঠে— ইস্ জামাটা যে একেবারে ছিঁড়ে দিয়েচে রে।

হয়তো তার এই উঁচু-গলার শব্দের ফলে, হয়তো বা দরমার বেড়ার ভিতর দিয়ে শব্দ-তরঙ্গ সহজেই চলতে পারে বলে কথাগুলো দেওয়ালের অন্য পারে চলে

যায়, আর সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘরের বিনুর মায়ের গলা শোনা যায়— বোলিস 'কি রে বুটির মা। জামা ছিঁড়ে দিয়ে বুটির গায়ে হাত দিয়েছে ?

তারপর টিনের দরজার শব্দ ওঠায় বোঝা যায় সে ঘর থেকে বের হচ্ছে, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বুটিদের ঘরে ঢুকে সে বলে— কই দেকি কি রকম ছিঁড়ে দিয়েচে ?

তারপরেই চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে সে বলে ওঠে, হ্যাঁ গা, এ যে মাংসও ছিঁড়ে নিতে গিয়েছিলো !

বুটি ভয়ে যেন পাথর। —কী থেকে কী হয়ে গেল। বিনুর মায়ের মুখ এবারে কে থামাবে ? এক্ষুণি তো সবাই জেনে যাবে। মা-টা যে কি করে ফেলল !

যা ভাবছিল বুটি তাই ফলে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। বিনুর মা ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিলো— ওগো তোমরা দেকে যাও, বুটিকে একবারে ছিঁড়ে দিয়েছে ওদের বাবু—

বুটি আর তার মা দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে দ্যাখে ওদের ঘরের সামনে এক এক করে মানুষ চলে আসছে— এবাড়ি-ওবাড়ির মানুষ— এঘর ওঘরের—

বিনুর মা ততোক্ষণে আক্ষেপের সুরে চেঁচাচ্ছে— কী ঘেন্না ! কী ঘেন্না— মা গো ! বড়লোক বলে যা ইচ্ছে করবে ? বেলাউজ ছিঁড়ে মেয়েটাকে একেবারে—

আরও অনেক কথা সে বলতে থাকে— বুটির ছেঁড়া ব্লাউজের নিচের অংশটার চলিত নামটা সরবে উচ্চারণ করে সে 'বাবু' এবং 'ভদ্দরনোকদের' অন্যায়ের পরিমাণটা বোঝাবার চেষ্টা করে, আর আস্ফালন করতে থাকে সেই সব দূর শত্রুকে লক্ষ্য করে। তাদের জাতির ও শ্রেণীর উদ্দেশ্যে তার আজন্ম আক্রোশের উদ্‌গীরণ চলতেই থাকে—

বুটি এক সময় মা-কে বলে— এ কী তুমি করলে মা !

মা এতক্ষণে তার মন স্থির করে নিয়েছে। সে-ও বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে— তা তোমার কী হয়েচে ? তুমি এতো চেঁচাচ্চো কেন ?

বুটির ভালো লাগে মায়ের কথা শুনে। কিন্তু তখনই সে ভয় পায় কেষ্টর গলা শুনে— এই বিনুর মা, তুমি থামো তো !

সে আরও শোনে— ডেকে আনো তোমার মেয়েকে। ওর মুখেই শুনবো কী হয়েছে ?

বুটি চৌকির একপাশে সরে গিয়ে বসে। বিনুর মায়ের গলা— হ্যাঁ ডেকে আনো মেয়েকে, সবাই দেকুক আমি ঠিক বোলচি কি না—

কেষ্ট আস্ফালন করছে— শালা বুটি কতো বড়ো মস্তান হয়েছে আমি দেখবো। দেখে নেবো—ডাকো তোমার মেয়েকে।

কেষ্টর এই কথার পিছনে বুটি ছাড়া আরও অন্য কারণ ছিলো। ও যখন ওয়াগনের কাজ করতো সে সময় ওদের দলকে লাইনের এঁপারে কুট্টিদের পাড়ার ছেলেদের খুশি করে চলতে হতো. ঠেলা গাড়ি বা লরিতে মাল পাচার করার জন্যে, ভয়ও পেতো কুট্টিকে তার গায়ের জোরের জন্য— যদিও কুট্টি ওই সেলামীর ভাগ কোনদিন নেয় নি তা সে জানে, তবু তার ইচ্ছে ছিল, আশাও আছে যে, শুধু কুট্টিকে নয়, এ দিককার সব ছেলেকেই সে একদিন দেখে নেবে—আর সেই সুযোগই আজ কিছুটা পেয়ে গিয়েছে কেষ্ট, তাই সে আবার বলে— শালা কুট্টি রুস্তম। দেখে নেবো ওকে—

বুটি সব শুনছে। আরও সব নারী কণ্ঠের কোলাহল। বিমুর মায়ের চিৎকার। ওর মায়েরও। পুরুষদের গলার শব্দ— কোনোটা চেনা, কোনোটা চেনা নয়— অতোগুলো শব্দের মধ্যে কিছু আলাদা করে বোঝাই যায় না আর— শুধু এটুকুই বোঝে বুটি, যে সে ও তার মা দুজনেই খুব ভুল করে ফেলেছে।

শেষে বুটির এক সময় মনে হয় যে মা বড়োই একা পড়ে গিয়েছে। অতো শত্রুর মধ্যে মা একলা পেরে উঠেছে না আর, তাই বুটিরও বাইরে গিয়ে মায়ের পাশে দাঁড়ানো উচিত। বুটি চৌকি ছেড়ে ওঠে। শাড়ির আঁচলটা বুকের ওপরে জড়িয়ে নেয়।

ততক্ষণে বাইরে ওই বস্তির প্রায় সব মানুষই জমা হয়েছে— যে নতুন এসেছে সে অন্যকে প্রশ্ন করে জানতে চাইছে— ব্যাপারটা কী? যে আগে এসেছে সেও আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করছে। যারা প্রথমে এসেছিল তাদের কেউ বিমুর মা-কে থামতে বলছে, কেউ বা বুটির মা-কে। আরও অনেকে এ ওকে থামতে বলছে, ও বলছে একে। কৌতূহলী শিশুর দল ভিড় ঠেলে সবচেয়ে সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং কেষ্টর দল একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজাই দেখছে উপস্থিত।

এমনি সময়ে সবাইকে অবাক করে বুটি বের হয়ে এসে বলে— তোমরা সব কি পেয়েছো আমার মা-কে? কে তোমাদের ডেকেছে?

জনতার কোলাহল একটু যেন কমে যায়। তারপরে চিৎকার করে ওঠে বিমুর মা— দেকেচো আমি ঠিক বলেচি কি না?

কি ঠিক বলছো তুমি? অসভ্য মেয়েছেলে কোথাকার।— বুটি চিৎকার করে ওঠে।

বিন্নুর মা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কেষ্টরা বুটির ব্লাউজের ছেঁড়া জায়গাটা দেখার আশায় সেদিকেই তাকায়। তখনই আরেকজন মানুষ ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে আসে— খাঁটি-ঘি কারখানার মালিক সুরেন— সুরেন দা, সুরেন বাবু। একজন মাঝ বয়েসী শক্ত চেহারার মানুষ— বুটি তাকে সুরেন কাকা বলে ডাকে।

সুরেন কাকা বুটিদের বারান্দায় উঠে এসেছেন, উঁচুতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন— যাও, যাও তোমরা। সবাই ঘরে যাও। তারপর সামনে চোখ ফিরিয়ে সেখানকার ছেলেমেয়েগুলোকে বলেন— এই ভাগ্, ছোঁড়ারা সব।

এই মানুষটাকে অনেকেই খাতির করে, ভয় করে। কেষ্টর দলও সমীহ করে অনেক কারণে— সুরেনদা কিছুকাল আগে সেই সময়ে যা পেরেছে কেউ তা পারতো না। কেষ্টর দলই প্রথমে বাঁকের আড়ালে চলে যায় সুরেনের কথা শুনে। তারপর একে একে সবাই সরতে শুরু করে। সুরেন আবার বলে— যাও বলছি তোমরা—

তারপর গলা নামিয়ে আফশোষের সুরে বলে— একেই বলে বস্তি।

বিন্নুর মা গুটি গুটি পায়ে নিজের ঘরের মধ্যে চলে যাচ্ছে। ভিড় অনেকটা হাল্কাও হয়ে এসেছে— শুধু শিশুর দল একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েই থাকে। সুরেন বুটির মায়ের দিকে ফিরে বলে— যাও, দাঁড়িয়ে দেখছো কী? মেয়েকে নিয়ে ঘরে যাও—

ওরা ঘরে ঢুকলে সে বলে— দরজাটা বন্ধ করে দাও।

তারপর সেই শিশুর দলের দিকে হাত নাড়িয়ে ছুটে যাওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলে সুরেন— যা, ভাগ্, তোরা। গেলি?

শীর্ণকায়, গায়ে চিট ময়লা-ধরা সেই উলঙ্গ বা ইজের পরা শিশুর দলও এবারে সরে যায়। খেলাহীন বৈচিত্র্যহীন তাদের প্রতিদিনের জীবনে আজ একটু যে রঙ বদল হয়েছিল—তামাসাটা বেশ জমেই উঠেছিল, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা সবচেয়ে ম্রিয়মাণ। মুখে হতাশার স্পষ্ট চিহ্ন ফুটেছে তাদের—

গলির মধ্যে তাদেরই শেষ প্রাণীটকে শাসাচ্ছে সুরেন— কিরে, গেলি?

তারপর সুরেন ছাখে যে গলির বাঁকে এই বস্তির সবচেয়ে বয়স্কা নারী সুরমার মা নামের বুড়ি এখনও দেয়ালের গায়ে ঘুঁটে দিচ্ছে। তাকে উদ্দেশ করে সে বলে ওঠে— কাকীমা, তুমি এই রোদের মধ্যে কেন? যাও ঘরে যাও—

যাই বাবা, আর শুধু এইটুকুন বাকি আছে— সে বলে তার হাতের দিকে তাকায়।

হাতটা বাড়িয়ে গোবরের পরিমাণটা দেখানোর জন্যে বাড়তি কোন পরিশ্রম করার দরকার তার নেই। কিছু লাভও নেই। তাকে আজও নিজেরটা নিজেই চালিয়ে নিতে হয়। তার হাড়ের ওপরে কোঁচকানো এক প্রস্থ চামড়াই শুধু জড়ানো। মাংস বলতে কিছুই নেই কোথাও। নাম বুড়ি এই পাড়াতে। আগে ছিল সুরমার মা তাদের গ্রামের মধ্যে। তারও আগের নাম ছিল সুহাসিনী— সেটা বহুদিনের অব্যবহারে সে ভুলেই গিয়েছে।

শুধু সে ই বুটিদের ঘটনায় কোনো কৌতূহল প্রকাশ করতে তার ঘুঁটে দেওয়া বন্ধ করে কাছে এগিয়ে আসেনি।

বুটিরা ঘরের মধ্যে থেকে সুরেনের শেষ কথাগুলো শুনতে পায়— তোমরা দরজা বন্ধ করে রেখো, আমি একটু বেরুচ্ছি, কেউ কিছু বললে আমাকে সন্ধেবেলা জানিও।

বস্তির সব ঘরে ঘরেই এক অচেনা স্তব্ধতা। বুটির ব্যবহারের রহস্যময়তা অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। বিনুর মা নিজের ঘরের মধ্যে বসে মনে মনে গর্জন করছে— অভিশাপও দিচ্ছে। আর, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত হয়েছে যে বুটি একটি দেহ-ভাঙানো মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, সে এবারে খুব জোরে চেঁচিয়ে বলতে চায়—সুরেনের কথা মনে পড়তে খুব আস্তে শুধু নিজেকেই শুনিয়ে বলে— খানকি!

কেষ্টরা চায়ের দোকানে বসে সুরেনের বাপান্ত করছে নিচু গলায় যাতে দোকানী সুবল না শুনে ফ্যালে। কেষ্ট অবশেষে বলে— আসলে ওরই সঙ্গে লটঘট্ চলছে জানিস রে। শালাকে দেখে নেবো শিগিগরি, পার্টিতে আরেকটু সেঁটে যাই, তারপর শালা সুরেনকেও—

বুটির মা ভাবছে একেবারে অন্যরকমের কথা। মেয়ের শরীরের দিকে সে এখনই আরেকবার তাকিয়ে দেখেছে— মেয়ে বড়ো হয়েছে— নারী হয়েছে— 'সোমত্ত'। মাদুরের ওপরে শরীর এলিয়ে সে ক্লান্তস্বরে বলে— শো বুটি; এবার তোর একটা বে দিতে হবে—

. বুটি এই কথাটা অনেকদিন ধরে অনেকবার শুনেছে। সে এখন আমল দিল না— ভাবলও না সে বিষয়ে—ও আরও অনেক কথা ভাবছে, ভাবার চেষ্টা করছে—

একটা চিন্তার মধ্যে অন্য আরেকটা এসে সব গোলমাল করে দেয়। একটা আলোর ওপরে আরেকটা এসে পড়লে যেমন, সে আলোগুলো মিলিয়ে হঠাৎ অন্ধকার হলে যেমন, ঠিক তেমনিই— মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে গেছে বুটির—

এ যে কী হয়ে গেল। এ সবের কিছুই ও চায়নি। ভাবেওনি যে শেষে এই রকম হয়ে যাবে— কী লাভ হলো ? কেন সে বললো। মেজদাবাবুতো—

বুটিও মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে।

চোখের সামনে দেয়ালে লাগানো কেষ্ট ঠাকুরের ছবি। বাবুদেব বাড়ি থেকে ক্যালেণ্ডারের এই ছবিটা চেয়ে এনে বুটিই দেয়ালে লাগিয়ে রেখেছিল।

কেষ্ট ঠাকুর বাঁশী হাতে পা বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশে রাধিকার কী সুন্দর হাসি হাসি মুখ। ঠাকুরদের সবই সুন্দর— যা করেন সব ঠিক করেন। মানুষ সে রকম পারে না। বুটি তো আজ যা করেছে সব উল্টো— সবই ভুল। মেজদাবাবুও খুব অন্যায় করেছেন— কেন ওরকম করলেন ? শেষে আবার মুখও চেপে ধরেছিলেন। বুটি যদি দম বন্ধ হয়ে মবেই যেতো ?

বুটিও খুব ভুল কবেছে— হঠাৎ ভয় পেয়ে যা চেঁচিয়ে সে উঠেছিল। যদিও সে ভেবে পায় না, অমনি অবস্থায় আর কী সে করতে পারতো, তবু মনে হয়, ঠিক ওই ভাবে চেঁচিয়ে ওঠা উচিত হয়নি। আর যদি তার চিৎকারটা শুনে পাড়ার সব লোক ছুটে আসতো ? তারাও তো একটু আগে এখানকার সেই ভিড়ের মতো এসে দাঁড়াতো বাড়িটার সামনে।

বুটি তো ভুল করেছেই। মেজদাবাবুও করেছেন। শেষে এই বকম পায়েই ধরলেন কেন ? ঠাকুর যদি পাপ দেন বুটিকে।

ছবির শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বুটি মনে মনে প্রার্থনা কবে— আমার যেন পাপ না হয়— তুমি দেখো কেষ্ট ঠাকুর—

কেষ্ট ঠাকুর! —চমকে উঠল বুটি— ওই বদমায়েশ গুণ্ডা কেষ্টটার নামও তো কেষ্ট ঠাকুরের নাম।

একেবারে বদমাইশ্। তোরা সবাই মিলে ওয়াগন-ভাঙা কাজের সময় কি

করেছিল তা কি তুই ভুলে গেছিস কেষ্ট। এখানকার কোন ভালো মেয়ে তোদের হাতে পার পেয়েছে তখন? তোদেরই জন্যে না বুটিকে খাওয়া থাকার কাজ নিয়ে বাবু-বাড়িতে চলে যেতে হয়েছিল। মাসের মধ্যে একদিনও সে-সময় সে মায়ের কাছে আসতো না।

এখন তোরা সব সাধু হয়েছিস খুব। আগেকার পার্টি ছেড়ে নতুন পার্টিতে ঢুকেছিস। পাড়ার সবাই এ-কথা বলে। কিন্তু বুটি পার্টি টার্টি কিছু বোঝে না— শুধু ভোট দিন, ভোট দিনের সময় তাদের নাম শোনে। ও শুধু জানে ভালো আর খারাপ— পৃথিবীতে এই দু-রকমের মানুষ আছে। ভালো— যেমন সুরেন কাকা। ওঃ যা বাঁচানোই বাঁচিয়েছে। আর, যেমন মা। যেমন আরও আছে। কিন্তু ঠিক এখনই ভেবে পাচ্ছে না কার কথা যেন মনে আসছিল বুটির—

একটু পরে মনে পড়ে— হ্যাঁ, যেমন সুহাস মামাবাবু—

খারাপ আছে অনেক— যেমন কেষ্টা আর ওর দলের সবাই। যেমন— বিনুর মা।

কিন্তু মেজদাবাবু? —যার জন্যে আজকের এতো সব কাণ্ড। সে কোন দলে? খারাপ নিশ্চয়। তা না হলে আর—

বুটির চিন্তা থেমে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই নিচু-হওয়া, বুটির পায়ে-ধরা চেহারাটা— মেজদাবাবু বলছেন, বুটি তুই আমাকে ক্ষমা কর।

ছি ছি! অতো বড়ো একটা মানুষ— বুটির চেয়ে না কতো বড়ো। আর সেই মেজদাবাবু কিনা? ইস্—

বুটির আজ হয়েছে কী? ও কিছুই বুঝতে পারছে না— মেজদাবাবু খারাপ সেটাও ঠিক বুঝতে পারছে না সে—

মায়ের গলার শব্দে চমকে ওঠে বুটি— তোকে আজ থেকে আর ওদের বাড়িতে কাজ কোরতে হবে না।

বুটি চুপ করে শুনতে থাকে— পোড়া কপাল তো আমাদের। তাই লোকের বাড়িতে কাজ করতে হয়।

বুটি এখনও কোনো কথা বলে না।

কি রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

বুটি নিঃস্তব্ধ হয়ে ঘুমেরই ভান করে। মা পাশ ফিরে শোয়। বুটির দিকে পিছন ফিরেছে তা না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পারে বুটি।

বুটির দেহটা আবার শিথিল হয়। খুব আস্তে সে মাথাটা একটু ঘোরায়,

চোখ পড়ে যায় বেড়ার গায়ে ঘরের চাল থেকে তার দিয়ে ঝোলানো একটা কাঠের ওপর ওদের ভাঁড়ারের দিকে—কিছু টিনের কৌটো, শিশি, মাটির হাঁড়ি, মালসা আর খুরি—বুটি আর তার মা দুজনেরই সংগ্রহের জিনিষ এগুলো। তাকটার এক কোণে বুটির সেই স্কুলের বই আর খাতাগুলো ধুলোয় ভর্তি হয়ে পড়ে আছে। ওগুলো সব এতোই ছেঁড়া আর নোংরা যে আজ আর ঠোঙা হওয়ারও যোগ্য নয়, তবু মা-কে বুটি ওগুলো ফেলে দিতে দেয়নি। বইগুলোর দিকে তাকিয়ে আজ সেই স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল বুটির— মনটা খারাপ হয়ে যায় তার সেই হারিয়ে ফেলা স্বপ্নের দিনগুলোর জন্যে—

চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে। সামনেই ঘরের মাথানি-বাঁশটার থেকে ঝোলানো সেই কতোকালের দড়ির শিকেটা ঝুলছে— ছ-টা দড়ির দুটো ছিঁড়ে গিয়ে হাঁড়িটা একটু কাৎ হয়ে গিয়েছে। ওটার মধ্যে আজকাল আর কিছুই থাকে না— থাকতো সে অনেকদিন আগে। বুটিরা তখন গ্রামে থাকতো; বাবা বেঁচে ছিলেন। বুটি তখন খুব ছোট।

মা যে কেন শিকেটাকে নিয়ে এল এখানে। ওই খালি হাঁড়িটা আর একটা দড়ি ছিঁড়লেই কারো মাথায় ভেঙ্গে পড়বে। আজ বিকেলে কিংবা কাল ওটাকে নামিয়ে ফেলে দেবে টি।

এবারে একটু যেন ঘুমের মতো লাগছে। কেষ্টরা কী করছে এখন? মেজদাবাবুকে ওরা কি সত্যিই কিছু করবে? অতো সোজা নয়। লেগে দেখুক না এক বার।

মাদুরের ছেঁড়া জায়গাটা বাঁ-পায়ের হাঁটুর কাছে ফুটছে। পা সরিয়ে নিল বুটি— উঃ। হোঁচট খাওয়া আঙুলটায় লেগে গিয়েছে আবার।

এটাকেও যদি চুণ চিনি দিয়ে বেঁধে নেওয়া যেতো। হাতের কাটাটা মেজদাবাবু কিন্তু খুব ভালো বেঁধে দিয়েছেন।

তারপরে আরও কি যেন ভাবতে গিয়ে বুটির একটু নেশার মতো লাগে— সুখের মতো। ঘুমের মতো। সেটা যে ঠিক কী তা বুঝতে পারে না সে— তবু আজ এতো গোলমাল, এতো অশান্তির পরে সবটুকু যেন খারাপও লাগে না তার।

॥ সাত ॥

টুনুর পিছনে মা দরজার কাছে এগিয়ে এসে বলেন— আজ আবার দেরি করবি না তো ?

মা রোজই এ রকম কথা বলেন, টুনুও যা হোক কিছু উত্তর দিয়ে বেরিয়ে যায় কিন্তু আজ হঠাৎ রেগে উঠে সে বলতে যাচ্ছিল শক্ত কোনো কথা —সেটাকে সামলে নিয়ে বলে— দেরি একটু হতে পারে।

আটটার মধ্যে ফিরবি ? না আরও— বলতে বলতে তিনি থেমে যান টুনুর মুখের দিকে তাকিয়ে। ওর চোখে মুখে যে ভাবনা ফুটে উঠেছে তাতে কথাটা শেষ করতে ভরসা তাঁর হয় না। এই মেয়েটাকে আজকাল একটু ভয়ই করছেন তিনি—ওর মনের নাগাল যেন খুঁজেই পাচ্ছেন না আর। কাজ তো কতোদিন ধরে করছে, কিন্তু এ রকম তো দ্যাখেন নি আগে। সেই শান্ত টুনু আজ কোথায় হারিয়ে গেছে— মেজাজটা যা হয়েছে।

আমি কি ইচ্ছে করে দেরি করি নাকি ? —টুনু হাঁটতে হাঁটতে ভাবে— চলো, একদিন না হয় সঙ্গে গিয়ে দেখেই আসবে যে দেরি আমার কী জন্তে হয়।

যে টুনু আজ ওই পথ দিয়ে হাঁটছে সে অন্য দিনের থেকে অনেক আলাদা। মনের মধ্যে সেই অশুভ চিন্তাটা কিছুতেই ছাড়ছে না— বাথরুমে নিজের শরীরটা যা দেখেছে তাতে সন্দেহটা বেড়েই গিয়েছে, আর তা যদি সত্যি হয়। তার পরে ?

কালো মেঘের মতো সেই ভাবনাটা টুনুর বিষণ্ণ মনে। পা-দুটো তার শরীরকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাড়ার পথ দিয়ে যেখানে পিঠে বেণী দুলিয়ে এক কালে সে ছুটোছুটি করতো, খেলতো, স্কুলে যেতো, এবাড়ি-ওবাড়ির মাসীমা কাকীমা আর বন্ধুরা ওকে দেখলেই ডাকতো। টুনুও এগিয়ে গিয়ে বলতো— মাসীমা ভালো আছেন ? কিংবা তাঁরাই বলতেন— কিরে টুনু অনেকদিন তো আমাদের বাড়ি আসিস নি। অথবা টুনুই কোন মেয়েকে বলতো— কিরে গীতা, কেমন আছিস ? আসিস না ভাই একদিন আমাদের বাড়িতে।

কিন্তু আজকাল এই রাস্তাটুকু চলতে সে খুবই ভয় পায়— কখন কোন চেনা মানুষ যে ওকে ডাক দিয়ে বলে ওঠে— কি রে টুনু, কোথায় যাচ্ছিস ?

ওই প্রশ্নের উত্তরটা মনে মনে তার ঠিকই করা আছে। সে বলবে— যেখানে কাজ করি সেখানেই।

কিন্তু তার পরেই তো সুরু হবে আরও সব প্রশ্ন— কোন্ অফিসে কাজ করিস ?

তোদের অফিস এতো দেরিতে সুরু হয় কেন ?

অফিস থেকে বেরিয়ে কোথাও যাস বুঝি ? এতো দেরিতে ফিরিস যে রোজ।

এমনি আরও কতো প্রশ্ন যে তারা করতে পারে যার উত্তর দিতে ওকে নাজেহাল হতে হবে। তাই টুনু এভাবেই চলে যেন এ পাড়ার সে কাউকে চেনে না, কোনদিন চিনতো না, চিনে থাকলেও না আসা-যাওয়ায় ভুলেই গিয়েছে, যাতে ওকে ডেকে কেউ আর কোন প্রশ্ন না করতে পারে। সেজন্য মাথা নামিয়ে চোখ সামনে রেখে এই পথটুকু পার হয়ে যায় টুনু।

আজ সুহাসদাকে দেখে টুনুই কথা বলেছিল তা মনে পড়ে যায়—অনেক কথা সে বলে ফেলেছে, কিন্তু তখনই বাড়ি ফেরার সময় ভেবেছিল, এখনও ভাবল, যে আর ওরকম ভুল সে কোনদিনও করবে না— সুহাসদাকে দেখলে এবার থেকে রাস্তার অন্যদিকে চলে যাবে।

টুনুর সবচেয়ে বেশি ভয় পাড়ার বারান্দাগুলোকে। ওখানে পাড়ার ছেলেরা বসে থাকে, দাদাটাও থাকে এক এক সময়। দুপুরে যদিও বারান্দাটা সাধারণত খালি থাকে, কোন কোনদিন বসেও থাকে দু-একজন। ওই জায়গাটা টুনু ঘাড় শক্ত করে যেন পায়ের দিকে চোখ এঁটে কোনমতে পার হয়— না দ্রুত, না বেশি ধীরে সে হাঁটে—যাতে একটুও বিশেষ দৃষ্টি ওর দিকে কারও না পড়ে।

টুনুর বয়স ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে চায়, কিন্তু সে বেশ বুঝে নিয়েছে এতোদিনে যে পেটই পৃথিবীর প্রথম তাগিদ—যৌবন নয়। আর সেই পেটের ওপরেই আঘাত পড়বে টুনুর, যদি তার কোন ভুল আচরণে এ পাড়ার কোন ছেলেকে একটুও প্রশ্রয় দেওয়ার ভাব দেখিয়ে ফ্যালে।

আজই তো কুন্টিদা জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। টুনু ঠিকই বুঝতে পেরেছিল সেদিকে না তাকিয়েও। কুন্টিদাকে ওর ভালো লাগতো একদিন— যখন দাদার কাছে আসতো, লুডো বা ক্যারাম খেলতো টুনুকে দলে নিয়ে। সেদিন ওর কিশোরী মনে কুন্টিদা যেন স্বপ্নের মতো এসেছিল। কিন্তু আজ বোঝে টুনু যে তাঁর গায়ের জোর, সুন্দর শরীর— ও-সব কিছুই কাজে লাগে না এই পৃথিবীর। তাই সকাল বিকেল ওরা যখন বারান্দায় বসে থাকে, টুনুরা এগিয়ে যায় অনেক-দূরের সেই সব সক্ষম মানুষদের কাছে যারা ওদের পেট চালাতে পারে।

কুট্টিদা কিন্তু কোনদিন জানতে পারেনি যে টুনুর তাকে ভালো লেগেছিল। জানলো বেশ মুস্কিলই হতো এখন। কুট্টিদা তাহলে ওর পিছন নিতো নিশ্চয়—জানতে চাইতো টুনু কোথায় যায়, আর সেইভাবে পিছু নিলে জানতে কী পারতো না?

কী হতো তাহলে? টুনুর আর তাদের বাড়ির সবাইকার পেট চলতো কি করে?

আবার মনে পড়ে গিয়েছে সেই কথাটা—কী হবে ওর সন্দেহটা যদি সত্যি হয়? হে ভগবান। দয়া করে এটা তুমি মিথ্যে করে দিও।

টুনু এতক্ষণে বাস-স্টপে এসে পৌঁছেছে। এবারে সে পিছনের দিকে দেখার সুযোগ পেয়েছে— পাড়ার কোনো লোক তো পিছন পিছন আসেনি?

যদি কেউ আসতো তাহলে টুনু এক্ষুণি বাস না ধরে গোটাকতক বাস ছেড়ে দিয়ে তাকে চলে যাওয়ার সময় দিতো। শেষে তাতেও যদি সে না যেতো তাহলে টুনু আর একটুও দেরি না করে প্রথম বাসটায় উঠে পড়তো। তারপর কয়েকটা স্টপ পর্যন্ত গিয়ে সে নেমে পড়তো কোনো জায়গায়। ঢুকতো গিয়ে যে কোনো একটা দোকানের মধ্যে। এ-জিনিষ ও-জিনিষ দেখে, দাম জিগ্যেস করে কিছুটা সময় কাটিয়ে, তারপর নেমে আসতো পথের ওপর— দেখতো সেই মানুষটা তখনও কাছাকাছি রয়েছে কিনা। থাকলে টুনু সোজা বাড়ি ফিরে যাবে, না থাকলে আবার বাসে উঠবে সে।

এ রকমই হিসাব ওর করা আছে। সেটা সব সময়ে মেনেও চলে, আর সেজন্যেই আজ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটেনি— কেউ জানতে পারেনি বলে টুনুর তো মনে হয়।

কিন্তু বাস থেকে চৌরঙ্গী বা সেনট্রাল এ্যাভেনুতে নামার পরে আর তেমন ভয় নেই। সমুদ্রে এক বিন্দু জলের মতো, জঙ্গলে একটা পাতার মতো সে মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়— এদিকে সেদিকে ঘোরে, বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে যেন একটা বাস ধরার জন্যেই সেখানে এসেছে, কিন্তু কোনো বাসে না উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মানুষ ছাখে টুনু— কতো রকমের মানুষ। তারাও ছাখে টুনুকে। শেষে যে বোঝার সে বোঝে। যার দরকার সে ডেকে নিয়ে যায়।

টুনু শুধু দেখে নেয় সে কোনো মুখ-চেনা মানুষ কি না। আর কিছু ভাবার তার দরকার নেই।

আজও টুনু দেখলো যে পাড়ার দিক থেকে কেউ ওর পিছন-পিছন আসেনি।

দেখলো শুধু অভ্যাসের ফলে, নাহলে আজ কোনো দরকার ছিলো না দেখার। ও এখন সোজা চৌরঙ্গীতে যাবে না— যাবে লীলার বাড়ি প্রথমে, তারপরে যাবে তার জানা সেই ডাক্তারের কাছে— যাঁর কথা বলেছিল লীলা।

কালিঘাট-মুখো প্রথম বাসটায় টুনু উঠে পড়ল। নামল কালীঘাটের মোড়ের কাছে। লীলার বাড়িতে সে একবার এসেছে। সেই রাস্তায় ঢুকে কিছুদুর চলল— ডান দিকে একটা সরু গলিকে ও খুঁজতে খুঁজতে চলেছে।

এমনি ভাবে অনেকটা হাঁটার পরে একটা হলদে রঙের তিনতলা বাড়ি দেখে টুনুর মনে হলো— কই, এ বাড়িটা সে তো আগের বার ছাখেনি। তবে কি ভুলই হয়ে গেল রাস্তাটা ?

টুনু এবারে থেমে দাঁড়ালো। এখান পর্যন্ত ডান দিকে সে তো ভালো করেই দেখতে দেখতে এসেছে। সেই গলিটা তো ছাখেনি। আর, এই হলদে বাড়ির পাশটা যেন অচেনা মতন লাগছে—রাস্তাটাই তাহলে ভুল হয়েছে নিশ্চয়। নাকি বাস-স্টপটাই ভুল হলো ? সেটা পার হয়ে অন্য স্টপে নামেনি তো ? টুনু কি আবার ফিরে গিয়ে দেখবে ?

কিন্তু তখনই ওর মনে পড়ে যায় যে লীলা একবার তার ঠিকানা লিখে দিয়েছিল একটা কাগজে, আর সেটা টুনু তার ব্যাগের ভেতরে রেখে দিয়েছিল। হাতের ব্যাগটা খুলে সে খুঁজতে থাকে— একটা চিরুণী, ছোট্ট একটা কৌটোয় একটু পাউডার আর একটা রুমাল। এছাড়া একটা এক-টাকার নোট আর কিছু খুচরো পয়সা ওর ব্যাগের ভিতরে থাকে। আর এর-ওর ঠিকানা লেখা কয়েকটা কাগজের টুকরো।

সব জিনিষই বেরিয়ে আসছে, কিন্তু সেই কাগজটা কোথায় ? একটা ক্যাশ-মেমো বের হয়ে এল— আগের বছর পুজোর সময় কেনা শাড়িটার— আরে। সেটাই তো টুনু আজ পরে আছে। এটা ওর শেষ কেনা শাড়ি— খুব ভালো খোল, এখনও একটুও ছেঁড়ে নি।

এই সব কাগজের অনেকগুলোই এখন আর রেখে লাভ নেই। একদিন সব দেখে দেখে ফেলে দিতে হবে— কিন্তু লীলার ঠিকানা লেখা সেই কাগজটা কোথায় গেল ?

শেষে ব্যাগটার নিচে লেগে-থাকা ছোট্ট একটা কাগজ চোখে পড়ে টুনুর। সেটাকে বের করে ভাঁজ খুলে ছাখে। হ্যাঁ, পাওয়া গিয়েছে এতক্ষণে। আঠারোর তিন নীলমণি রায় রোড। এ রাস্তাটা নয়। টুনুর ভুলই হয়েছিল।

সামনে এগিয়ে একটা মুদির দোকানে টুনু ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করে। লোকটা একটা বস্তার মুখের দড়ি খুলছিল। টুনুর প্রশ্নে এগিয়ে এসে বাইরের দিকে ঝুঁকে হাত দেখিয়ে বলে— ওই যে একতলা লাল বাড়িটা, ওর পাশ দিয়ে দেখবেন, ডান দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে, সেটা ধরে সোজা এগিয়ে দেখতে পাবেন আর একটা রাস্তায় পড়েছে—ওটাই নীলমণি রায় রোড। বলুন, আমি দেখিয়ে দিয়ে আসবো ?

না, না, আপনি কেন যাবেন। আমিই দেখে নিচ্ছি—বলে টুনু এগিয়ে যায়। লোকটার ব্যবহার একটু যেন গায়ে-পড়া মতো, না ? টুনুর বয়সী মেয়েদের দেখে সবাই এরকম গায়ে পড়তে চায়।

আবার শব্দ আসছে পিছন থেকে—ওখানে গিয়ে বিশ্বাসদের বাড়ি বলে জিগ্যেস করবেন, সেটা কুড়ি নম্বর, তার কাছেই কোথায়ও হবে।

টুনু এবারে ফিরে তাকায়। গোল-গোল মুখের সাদা সার্ট পরা নিরীহ দেখতে একজন মানুষ। ঠিক সেরকম নয়—যা টুনু ভেবেছিল। সব লোক এক রকম হয় না। ভালো মানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে। কিন্তু কী যে কপাল টুনুর—মানুষকে অন্য রকম দেখতে দেখতে তার মনটাই বদলে গিয়েছে। মানুষকে সেরকম দেখতে ওর ইচ্ছেও করে না—কিন্তু উপায় কী ?

টুনু এবারে ঠিক রাস্তায় পৌঁছেছে। লীলাদের বাড়িও খুঁজে পেয়েছে। সামনে একটা পুরনো কালের নক্সা-করা দরজা—রং উঠে গিয়ে তার সবুজটা ঠিক বোঝা যায় না। একটা পাল্লার মাথায় নক্সা-করা কাঠটা খুলে পড়ে গিয়েছে। দরজাটা বন্ধ দেখে টুনু কড়া নেড়ে ডাক দেয়।

কে ?—ভিতর থেকে নারী কণ্ঠের শব্দ শোনা যায়—এ লীলার গলা নয়।

আমি। লীলা আছে ?

ভাখো, কে আবার তোমার মেয়েকে ডাকে—স্পষ্ট এক বিরক্ত পুরুষ-কণ্ঠস্বর। এ কী লীলার বাবার গলা ? মনে আছে সেবারে টুনু যখন লীলার সঙ্গে বাড়িতে ঢুকছিল, এই গলাটা শুনে লীলা ওকে বাড়িতে ঢুকতে বারণ করেছিল, বাইরে দাঁড়িয়েই কথা সেরে নিয়েছিল।

দরজাটা ঘড় ঘড় শব্দ করে খুলে গেল—একদিকের কবজা ভেঙে সেটা মাটিতে ঝুলে পড়েছে। বয়স্কা এক ঘোমটা ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিয়েছেন— হয়তো লীলার মা-ই হবেন। টুনু তাঁকে বলল—লীলা আছে ?

তোমাকে তো চিনতে পারলাম না ?

আমি লীলার বন্ধু কমলা—টুনু উত্তর দিল—ঠিক এই মুহূর্তেই ওর মনে পড়ে গিয়েছে যে লীলাদের মহলে ওর নাম আর টুনু নয়—কমলাই টুনুর বাইরের পৃথিবীর নাম। লীলারও এ-রকম একটা নাম আছে, সেটাই সে জানতো, কিন্তু আসল নামটা টুনু জেনে ফেলেছিল সেবারে ওদের বাড়ি আসার সময় লীলা যখন সাবধান করে দিয়েছিল—শোন্, বাড়িতে আবার আমাকে নন্দা বলে ডেকে বসিস না যেন। আমার আসল নাম লীলা। বুঝলি ? কী রে, মনে থাকবে তো ?

লীলার মা বলেন—এখানেই কোথাও গিয়েছে, এক্ষুণি আসবে, তুমি ভিতরে এসে বসবে কী ?

টুনু বাড়ির মধ্যে ঢোকে।

তোমারই সঙ্গে লীলা তো ডায়মণ্ড-হারবারে গিয়েছিল, না ?

হ্যাঁ—টুনু উত্তর দেয়।

লীলার মায়ের পিছনে সে এগিয়ে যায় প্রকাণ্ড একটা উঠোনের মধ্যে দিয়ে—টুনুদের বাড়ির মতো ছোট্ট আর চাপা নয়। এক রকমের লালচে রঙের পাথর বসানো উঠোনটা— তার কতকগুলো আছে, কয়েকটা খুলে গিয়ে মাটি বেরিয়ে এসেছে— সেখানটায় ঘাস আর ছোট ছোট গাছ গজিয়ে উঠেছে— লীলাদের আজকের অবস্থার মতো— টুনুর মনে হয়, আগে লীলারা যে বড়োলোক ছিলো সেটা টুনু তারই মুখে শুনেছে, কিন্তু বিশ্বাস করেনি— মিথ্যে কথায় লীলার জুড়ি কেউ নেই। আজ বুঝল, কিন্তু এই কথাটা মিথ্যে সে বলেনি।

টুনুকে রোয়াকে দাঁড় করিয়ে লীলার মা আগেকার কালের একটা মোটা চেয়ার ঘর থেকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসছেন— এই রকমের চেয়ার টুনু এর আগে কোথায়ও ছাখেনি।

লীলার মায়ের পিছনে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। টুনুকে দেখেই বলে ওঠেন— একে তো চিনিনা। এ কে ?

ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে টুনু অবাক হয়ে যায়— একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে— টুনু খুবই অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে—

আঃ, তুমি আবার বের হয়েছো ?—লীলার মা ধমকের সুরে বলেন— যাও, ঘরের মধ্যে যাও, ও লীলার বন্ধু কমলা।

বন্ধু! কোথাকার বন্ধু ?

লীলার মা টুনুর মুখের দিকে এবারে বিব্রত চাউনিতে তাকিয়ে ভদ্রলোকের

দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন— চলো, ঘরে চলো, বললাম তো ও লীলার বন্ধু কোথাকার বন্ধু তাতে কি দরকার তোমার?

ভদ্রলোক আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, লীলার মা তাঁর হাত ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যান। টুনু এবারে দেখতে পায় যে ভদ্রলোকের শরীরের একটা দিক যেন নড়ছে না, পিঠের শিরদাঁড়াটা যেন কাঠের মতো— এমনিতে কিছু বোঝা যায় না, তবু হাঁটার সময় মানুষের শরীর যেটুকু দোলে সেটা ওঁর চলার মধ্যে নেই। কই, লীলা তো একথা কিছু বলেনি।

ওঁরা দুজনে এখন দরজাটা পার হয়ে যাচ্ছেন। দরজার মাথার ওপরে দেয়ালটার ফুল পাতার নক্সা করা, বালি খসে গিয়ে অনেক জায়গায় নিচেকার ইট বেরিয়ে পড়েছে, তবু নক্সাগুলো যে আগে খুব সুন্দর ছিলো তা বুঝতে পারা যায়।

ঘরের ভিতরের দিকে চোখ পড়ে তার— খুব মোটা কাঠের মাথা-উঁচু একটা খাট— এমনি খাট টুনু সিনেমার ছবিতে দেখেছে— পুরনো বড়লোকদের বাড়ির ছবিতে। আরও সে দেখতে পায় দেয়ালের গায়ে একটা বিশাল ছবি— সুন্দর একজন পাকানো-গোঁফের কম বয়সী পুরুষ — গলায় নক্সা-পাড় চাদর ঝোলানো, হাতে একটা ছড়ি নিয়ে তিনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এই ছবিটা কার? লীলার বাবার মতো নয় তো। তাহলে আর কারই বা হতে পারে? লীলা এলে তাকে জিজ্ঞাসা করবে টুনু।

ঘরের মধ্যে আবার চিৎকার উঠেছে— এতো বন্ধু কেন তোমার মেয়ের? এরও তো দেখছি বিয়ে হয়নি তোমার মেয়ের মতন! বিয়ে করবো না! বিয়ে করবো না! ঘুরে ঘুরেই যেন চ-াবে সারাজীবন।

আঃ! অতো চেঁচাচ্ছো কেন? আস্তে কথা বলো না—

কেন? তোমার ভয়ে? না, তোমার মেয়ের?

কি মুস্কিলে যে পড়েছি! হে ভগবান— লীলার মায়ের গলা শোনা যায়।

টুনুও তখন ঠিক অমনি কথাই মনে মনে বলছিল— কি বিপদেই যে পড়েছি এখানে এসে— হে ভগবান।

টুনু কি এখন উঠে যাবে? তাই তো যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, চলেই যাবে সে— লীলার সঙ্গে দেখা হোক বা না হোক—

ঘরের মধ্যে তখনও জোরে জোরে কথা চলছে। তখনই দরজাটা হঠাৎ ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল, বোঝা যায় যে লীলার মা এভাবেই সমস্যার

সমাধান করলেন। আর, ভালই হয়েছে টুনুর। এই ফাঁকে সে বেরিয়ে যেতে পারে। দ্রুতপায়ে উঠোনটা পার হয়ে এল টুনু—

কিন্তু দরজার সামনে লীলার সঙ্গে দেখা। লীলা ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়ে বলল— কিরে, তুই কখন এলি ?

এক্ষুণি এসেছিলাম—

লীলা ততক্ষণে ভিতরের দিকে তাকিয়ে ঘরের সেই বন্ধ দরজার দিকে দেখল আর ওখান থেকে এখনও যে শব্দ বেরিয়ে আসছিল, তা শোনার চেষ্টা করে হঠাৎ হেসে উঠে বলল— কিরে! খুব লেগে গিয়েছে, না ? আয়, চলে আয়, এখনও অনেকক্ষণ চলবে—

লীলা টুনুর সঙ্গে দরজার বাইরে এসে বলে— কী ব্যাপার ? হঠাৎ যে—

তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল— টুনু বলল।

কী কথা বল ?

সে অনেক কথা— টুনু একটু চাপা গলায় চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে বলে— এখানে তো বলা যাবে না ভাই—

—ঠিক আছে, বিকেলে তাহলে সেই জায়গায় আসিস।

না রে, লীলা খুবই দরকারে এসেছি, কোথাও একটু বসি গিয়ে চল।

টুনুর কথার মধ্যে যে মিনতির সুরটুকু ছিলো তা লীলার কানে ধরা পড়ে। টুনুর মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে সে যেন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে, তারপরে বলে— চল, তাহলে কোথাও গিয়ে বসি। বাড়িতে তো আবার যা চলছে—

বসার জায়গা পাওয়া সহজেই যায়। খোঁজাও সহজ, কিন্তু বসতে পারা যায় না অতো সহজে। এখানে কোন চায়ের দোকানে বা মিষ্টির দোকানে টুনুর বসা চলে, কিন্তু লীলা তা পারে না, যেমন টুনুদের পাড়ার কাছাকাছি লীলা পারতো, টুনু পারবে না। তাই ওরা দুজনে হাঁটতেই থাকে— এগিয়ে চলে বড়ো রাস্তা ধরে।

এখনও কিন্তু কোন কথা নয়— লীলা সাবধান করে দেয়—

এবারে ওরা ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে চলে আসে। একটা রাস্তা বেছে নিয়ে একটু ভিতরে গিয়ে এক জায়গায় থেমে লীলা বলে— এটাই ভালো জায়গা— কিরে, কোনো পার্টি পেয়েছিস বুঝি টুনু ?

টুনু একটু ম্লান হেসে বলে—না, তার ঠিক উল্টো। খুবই বিপদে পড়ে গেছি রে।

কী বিপদ—কোনো অসুখ টসুখ?

না, অসুখ নয়— বলে টুনু একটু থামে। কি ভাবে লীলাকে কথাটা বলবে তাই সে মনে মনে ভাবতে থাকে।

তবে কি হয়েছে? বাধিয়ে বসেছিস নাকি? লীলা হাসি হাসি চোখে বলে— কি রে টুনু, কথা বলছিস না যে?

ওই রকমই তো ভয় হচ্ছে। আমাকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবি ভাই? সেই যে তুই বলেছিলি—মনে আছে?

লীলা হেসে উঠে টুনুর পেটের ওপরে শাড়িতে একটা খামচা দিয়ে তার নিচে চিমটি কাটার চেষ্টা করে বলে— তা বেশ ভালো ব্যাপার তো। ক-মাস?

টুনু উত্তর দিতে গিয়ে কাছাকাছি একজন লোককে দেখে থেমে যায়।

লোকটা চলেই যাচ্ছে, টুনু তার মাসের কথাটা বলতে যায়, তার আগে লীলা বলে ওঠে—

তুই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিস না রে টুনু? এ-রকম একটা মজার ব্যাপার, আর তুই কিনা—ওরকম—

ইয়ারকি করিস না ভাই, কখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবি বল? টুনু গম্ভীর মুখে বলে।

তার আগে বল মিষ্টি খাওয়াবি কখন? আজই, না অন্নপ্রাশনে?

লীলা সব সময়েই এরকম মজার কথা বলে। টুনুর ভালো লাগে অন্য দিন, কিন্তু আজ এই সব রসিকতা একটুও ভালো লাগছে না টুনুর। কিন্তু বিরক্তিটা প্রকাশ করার উপায় নেই—লীলাকে ওর খুবই দরকার। তাই সে শুধু বলে—বল ভাই কখন নিয়ে যাবি?

লীলা ওর দিকে এবারে একটু চোখের ইসারা করে চাপা গলায় বলে—আরেকটু এগিয়ে যাই চল, দুটো কুত্তা আবার পিছনে লেগেছে।

টুনু মুখ ঘুরিয়ে ভাখে—লীলার কথামতো 'কুত্তা' হলো দুজন যুবক যারা ওদের দিকে এগিয়ে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

চল—টুনু বলে।

ওরাই হলো টুনুদের আসল বিপদ— যেখানেই যাও, ওরা আছে। পিছনে হাঁটে। বাসেও ওঠে পিছন ধরে। কাছে এসে ইসারা করে—কিন্তু এক কাপ চা

খাওয়ানোর মুরোদ নেই। পারে শুধু জালাতন করতে। টুনু এদের ভয় পায়, লীলার দারুণ আক্রোশ ওদের ওপরে –

কুত্তা শব্দটা টুনু তার মুখে এর আগেও শুনেছে।

ওরা দুজনে একটু এগিয়ে গেল।—ছেলে দুটো তবু পিছনই রয়েছে, মুখ ফিরিয়ে দেখে লীলা চাপা গলায় বলে— এখানে একটু থাম তো টুনু।

বলে, সে ছেলে দুটোর দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখে চোখ রেখে একটু হাসল— ইসারার মতো ভঙ্গী করল ভ্রূ-দুটো নাচিয়ে। তারপরে একটি ছেলে যখন কাছে এগিয়ে এসেছে, লীলা হঠাৎ জোরে একটা শব্দ করল, হ্যাক্। সঙ্গে সঙ্গেই মাটির দিকে মুখ করে থুতু ফেলার শব্দ— থুঃ।

তখনই ছেলেটা পালাতে পথ যেন আর পায় না।

লীলা হেসে উঠে বলে— দেখলি টুনু?

টুনুর খারাপ লাগে। তবু উত্তরও সে দেয় না—ছেলেগুলো জ্বালাতন করছিল তা ঠিক। তবু এতোটা অপমান করা উচিত হয়নি লীলার।

লীলা বলে— ঠিক এই রকম ওষুধ ওদের দরকার—শিখে রাখ টুনু—

টুনু এটা কোনদিনই পারবে না। সে চুপ করে থাকে।

বলেছিলাম না কুত্তা। না হলে আর এক থুতুতেই লেজ গুটিয়ে পালায়?

॥ আট ॥

কুন্তি বের হয়ে এল বাড়ির থেকে। এখানে এখন আর থাকা ঠিক নয়, শুধু এটুকুই বুঝতে পারছে, বাকি আর কিছুই ভাবতে সে পারছে না। একটু পরেই তো দুপুর শেষ হবে, মা ঘুম থেকে উঠে বুটির খোঁজ করবেন। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে কুন্তিকেই বস্তিতে তার খোঁজ করতে পাঠাবেন—ওখানে হয়তো জানাজানি হয়ে গেছে, ওখানকার মস্তানগুলোও জানতে পেরেছে— যদিও কুন্তি ওদের পরোয়া করে নি কোনদিন, কিন্তু আজ সবই অন্য রকম—কী যে হয়ে গেল। একটু ভুলের ফলে—

কুন্তি এখন কী করবে? কোথায় যাবে? কিছুই ঠিক করতে পারছে না, শুধু উদ্দেশ্যহীন দুপুরের এই খালি রাস্তার মধ্যে হাঁটছে। একটু আগে সে একটু দাঁড়িয়েছিল। কিছুদূর এগিয়ে পুজোর প্যাণ্ডালের কাছে থেমেছিল— শুধু বাঁশই বাঁধা হচ্ছে, ওখানে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই—ত্রিপল

চাপানো হলে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ থাকতো। কাউকে কী বাড়ির থেকে ডাকবে কুন্তি? না, তারও দরকার নেই— ও একটু নিজের মধ্যে থাকবে— কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালোই লাগবে না এখন।

কুন্তি এগিয়ে চলতে থাকে। পথের দু পাশে পাড়ার সব চেনা বাড়ি। এইটে লোটনদের, এই বারান্দাটায় ওরা আগে বসতো—এখন পাঁচিল ঘিরে দিয়েছে। পাশের বাড়িতে দু তলার বারান্দায় ওই সুন্দর মেয়েটি বীরুর বৌ। কুন্তিদের সঙ্গে এক কালে ভাব ছিল বীরুর— চাকরি পাবার পর থেকেই বদলে গিয়েছে। বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক হলো। কুন্তিরও হতো যদি সে বীরুর মতো রোজগার করতে পারতো। মাঝে মাঝে হিসাব করে কুন্তি ছাখে, যে ওর এখন যা বয়স বাবার সেই বয়সে কুন্তির বড়দি আর বড়দা দুজনেই পৃথিবীতে এসে গিয়েছিলো।

বীরুটা লেখা পড়ায় একটু ভালো ছিল; তবে ভীষণ স্বার্থপর—কুন্তিকে দারুণ খাতির করতো ওর গায়ের জোরের জন্যে— কিন্তু কী হলো শেষে? কুন্তিই সেই রোগা ডিগ্‌ডিগে ছেলেটাকে হিংসে করে আজকাল— শালা আছে ভালো। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে রোজ বৌকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় যখন কুন্তিরা এ-বারান্দা ও-বারান্দা বদল করে শেষে ক্লান্ত হয়ে উঠে, মোড়ে দাঁড়িয়ে গ্যাজাল করে, কিংবা গড়িয়াহাটার মোড়ে ভিড় বাড়িয়ে মেয়ে দেখতে যায়। শুধু ও টুকুই মুরোদ ওদের— আর কিছু নয়।

নিজেকে আর একবার ধিক্কার দেয় কুন্তি— কিছুই করতে পারলো না; পৃথিবীর কোনো কাজে এলো না আজ পর্যন্ত শুধু মায়ের আর দাদার ফরমাশ খাটা, বাজার করা, আর তার থেকে রোজ চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ পয়সা সরানো ছাড়া। ওতেই তার যা কিছু নিজস্ব খরচ চালাতে হয়।

কথাটা ঠিক এই সময় তাকে অন্যভাবে আঘাত দেয়, আর তখনই হঠাৎ মনে পড়ে যায় আজ সকালে সুহাসদার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা— আসিস যে কোনো দিন। কোনদিন নয়—কুন্তি আজই যাবে—কিছু একটা সুহাসদা নিশ্চয় করে দিতে পারবেন। মুখে যাই বলুন না কেন, সব কোম্পানীরই পারচেজ অফিসারের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে তা কুন্তি অনেকের মুখে শুনেছে— কতো লোক ওদের কাছে তেল দিতে আসে, ঘুষ দিতে চায়, আর শুধু একটা চাকরি সুহাসদা করে দিতে পারেন না?— যে কোনো চাকরি— পিওনের হোক, বেয়ারার হোক, বিল-কালেকটরের হোক—কুন্তি যা পাবে তাই করতে রাজি। বিজনেস ও পারবে

না—অনেকদিন ধরে লেগে থেকে তা শিখতে হয়। অতো দেরি তার সইবে না। আজ থেকেই ও নিজের অভ্যাসের জীবনে ছেদ টেনে দেবে— যে ভাবেই হোক। আর সে সারাদিন ওইভাবে বসে বসে কাটাবে না— ছোটবেলার পড়া বইয়ের সেই কথাগুলো এখনই মনে পড়ে যায় কুট্টির— এ্যান আইডল ব্রেইন্ ইজ এ ডেভিলস্ ওয়ার্কশপ—বসে থাকো তো যতো সব বাজে চিন্তা আসবে, অন্যায় করে ফেলবে—যেমন আজ সে করেছে। ও-রকম চুপচাপ বাড়িতে শুয়ে না থাকলে কি হঠাৎ সে ঝিয়ের গায়ে হাত দিতে যেতো ?

কিন্তু— হঠাৎ মনে পড়ে যায় কুট্টির— সেই সময়ে তো মাথাটা তার সত্যিই অলস ছিলো না। ও তো একটা উপন্যাসের একটা জায়গা পড়ছিলো। আর, তা পড়তে পড়তেই হঠাৎ পাগলের মতো হয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল—

কথাটা মনে পড়তেই কুট্টি আবার রেগে ওঠে সেই লেখকের ওপর— ঠিক আছে। আগে দেখা যাক ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। তবে খারাপ যদি কিছু হয়— কুট্টিকে ভুগতে হয়, তাহলে তাকেও ছেড়ে দেবে না সে।

তুমি চাঁদু-ভাই টাকা পাবে ওইসব লিখে, আর শুধু আমি তার খারাপ ফলটা ভোগ করবো ? না, সেটা কিন্তু হবে না। একটু খোঁজ করলেই তোমার ঠিকানাটা আমি পেয়ে যাবো, তারপরে দেখা করবো তোমার সঙ্গে—

ভাবতে ভাবতে বাসে উঠেছিল কুট্টি। মুঠোর মধ্যে তখন বাসের হাতলটা ধরা ছিলো, তাতেই একটু মোচড় দিয়ে সে মনে মনে বলে নিজের কব্জির দিকে তাকিয়ে— এই টুকুন। ব্যস্। তোমার ডান হাতটাকে শুধু এ-টুকুই ঘুরিয়ে দেব যা দিয়ে তুমি ওই সাহিত্য লিখেছিলে। তারপরে তুমি বাঁ-হাতে আবার লিখতে শিখো চাঁদু।

বাস থেকে নেমে একটু খুঁজতেই সুহাসদাদের অফিস বাড়িটা পেয়ে গেল কুট্টি। সামনের দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতে সে লিফটের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল— ছে তল্লামে যা কর ভৌমিক সাহাব নাম লেকর পুছিয়েগা—

সুহাসদার দারুণ পজিসন্ তাতে কুট্টির সন্দেহ ছিলো না, কিন্তু এই দারোয়ানের মুখে ভৌমিক সাহাব নামটা ওকে আরও বুঝিয়ে দিলো যে ওদের পাড়ার সেই সুহাসদা এখানে অন্য মানুষ— খাতির তাঁর অনেক।

ভিজিটিং স্লিপে নাম লিখে সেটা বেয়ারার হাতে দেবার অল্পক্ষণ পরে সে এসে বলল— আইয়ে আপকো বোলা রহে হৈঁ—

কুট্টি তার পিছনে পিছনে এসে ঢুকল সুন্দর এক ঘরের মধ্যে। বড়ো একটা টেবিলের উ:ল্টাদিকে যে মানুষটা বসে আছেন তাকে কুট্টি:দর সুহাসদা বলে ভাবতেও ভালো লাগে তার।

বোস কুট্টি ওই চেয়ারটায়— সুহাস বলে।

কুট্টি বসল। ওর নিজের যে সার্ট আর প্যাণ্ট তা এই ঘরের মধ্যে এরকম একটা চেয়ারে বসার পক্ষে একটু বেমানান বলেই মনে হচ্ছে কুট্টির—সে সুহাসদার মুখের দিকে তাকিয়ে। সামনের একটা কাগজ সরিয়ে রেখে কুট্টির দিকে আবার চোখ তুলে বলেন— আজই চলে এলি ?

হ্যাঁ সুহাসদা, ভেবে দেখলাম দেরি করে আর কী লাভ।

ভালোই করেছিস, তবে কাগজগুলো সব খুঁজে বের করতে হবে, জানিনা ঠিক কোনখানে কী রাখা আছে—

কুট্টিকে সুহাসই তো আসতে বলেছিল, এসেছে সে। কিন্তু আজ একটু আগে যা হয়ে গিয়েছে তারপরে কুট্টির জন্য কোন কিছুই কী করতে পারবে সে ? সুহাস নিজেই এখন যে অবস্থায় পড়েছে তার থেকে বেরুতে পারলে তবেই তো—

কুট্টি সুহাসদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল — সুহাসদার মুখটা কেমন লাগছে। মুখে সব সময়কার সেই হাসিটা নেই— যেজন্য সুহাসদাকে তার বরাবর ভালো লাগে। কুট্টি এর মানে বোঝার চেষ্টা করে— তবে কি সকালে অফিসে আসার পথে সেই রাস্তার মধ্যে চাকরির কথা বলার জন্ত ? কিন্তু তাহলে তো কুট্টির পিঠের ওপর হাত রেখে হাঁটতেন না। তবে আর কী হতে পারে ? কুট্টির এ-রকম পোষাক পরে এই ঘরে সোজা ঢুকে পড়ার জন্তে ?— যেখানে উনি কারও সুহাসদা নন— অফিসের এক ভৌমিক সাহেব।

সে সুহাসদার মুখের ভাবটা বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু তখনই ছাখে সুহাসদার মুখে মৃদু একটা হাসি— দেখি খুঁজে যদি পাওয়া যায়—

কুট্টি বলে ওঠে— না সুহাসদা, আপনাদের সেই পারচেজ লিষ্ট যা বলেছিলেন তা খোঁজার কোনো দরকার নেই। আমি ভেবে দেখেছি ও-সব বিজনেসের ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকবে না। শুধু একটা চাকরি যদি দেখে ছান—

চাকরি! চাকরিটা মোটেও ভালো জিনিষ নয় রে! —সুহাস ক্লান্তস্বরে ম্লান হেসে উত্তর দেয়।

কুট্টি অবাক হয়ে যায় সুহাসদার কথার সুরে— ওই হাসিটাও কেমন অদ্ভুত লাগে— কিছু একটা হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই—

কিন্তু কুট্টির আজ বড়োই দরকার। সে মনে মনে স্থির করে এসেছে সুহাসদাকে আজ বুঝিয়েই যাবে তার অবস্থাটা। সে বলে— ক্ল্যারিকাল না হোক, কোনো পিওন বা বেয়ারার কাজও যদি হয়, আমি রাজি আছি সুহাসদা।

সুহাসও কুট্টির মধ্যে নতুন কিছু দেখছে— আজ সকালে দেখা সেই কুট্টি যেন নয়— যার চাকরি চাওয়ার মধ্যে তাগিদ ছিলো, কিন্তু এই সুরটা ছিলো না। পিওন বা বেয়ারার চাকরি করবে? করতে পারে। তবে তার জন্য সুহাসের কাছে কেন আসা? কুট্টি কি আশা করছে যে সুহাস তার অফিসে পাড়ার একজন ছেলেকে বেয়ারা-পিওনের কাজ দিয়ে নিজের কাছে রাখবে?

সুহাসকে নিরুত্তর দেখে কুট্টি আবার বলে ওঠে— আপনাদের পিওন বেয়ারাদের মাইনে কতো সুহাস দা?

ডি, এ, টি, এ, মিলিয়ে প্রায় দু শো টাকার মতো হবে।

সে তো অনেক টাকা সুহাস দা! তার চেয়ে অনেক কমও যদি হয়, আমি রাজি আছি—

এই হলো সব বাঙালী ছেলের দোষ— চাকরিতে অনেক কমে রাজি। ব্যবসায় নয়। অথচ এই কলকাতায় যে কতো রকমের ব্যবসা চলছে! কিন্তু সেটা ওদের বোঝানো যাবে না কিছুতেই। তবু সুহাস ভাবতে থাকে কুট্টির জন্য কোথাও বলে দেওয়া যায় কি না।

প্রথমেই মনে পড়ে দত্তর কথা— একটা চিরকুট লিখে দিলে এখনই কুট্টির চাকরি হয়ে যেতো। কিন্তু তার কোনো পথ নেই— সুহাসেরই এখন চাকরি থাকে কিনা কে জানে! এই মুহূর্তে সে আবার তার নিজের ভাবনায় পৌঁছে যায়— দত্ত, বাসু সাহেব—ম্যাড্রাসে বদলি হওয়া—

কুট্টি চুপ করে বসে থাকে সুহাসের উত্তর শোনার জন্য। ও সুহাসকে ঠিক মতো বোঝাতে পারেনি কী দারুণ দরকার তার। বসে বসে সময় রগড়ে-রগড়ে চলে আজ কি অবস্থা হয়েছে তার। কি করে এসেছে বাড়িতে। বুটি তো এখন বস্তির সবাইকে বলার ফলে একটা গোলমাল সুরু হয়ে গেছে। সেটা কুট্টিদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে হয়তো। কুট্টিকে সেখানেই আজ ফিরতে হবে—মা, বড়দা, আরও সব পাড়া-ভর্তি মানুষের মধ্যে— বেকার অবাঞ্ছিত একটা রাস্তার কুকুরের মতো—খাওয়ার জায়গায় যে ঠিক হাজির হয়, তারপর ঘুরতেই থাকে—

সুহাসদা, কিছু একটা করে দিন— সে বলে ওঠে— রোজ বাজার করার

আশার দিকে তাকিয়ে, তার থেকে ওজন চুরি করে চল্লিশ কি পঞ্চাশ পয়সা সরিয়ে, তার মানে—চুরি করে যাদের হাত খর্চা চালাতে হয়। আপনি তো এতো বড়ো চাকরি করেন। কি করে বুঝবেন আমাদের জীবনে আজ আছে কী? কি হচ্ছে, কোথায় চলে যাচ্ছি আমরা!

তুই থাম তো এখন! যা চেঁচাচ্ছিস, সারা অফিসের লোক ছুটে আসবে—

কুন্তি পিছন ফিরে ঘরের দরজাটার দিকে তাকায়। মুখ ফিরিয়ে বলে—মাফ করবেন সুহাসদা, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটা আমাদের পাড়া নয়, আপনার অফিস, আপনি যেখানে—

আবার তুই থিয়েটারী কথা বলছিস। বলছি একটু চুপ করে থাক।

কুন্তি সত্যিই ভুল করছে। বার বার শুধু ভুলই করছে সে। চোখ ফিরিয়ে নেয় সুহাসের মুখ থেকে। সুহাসদা ওকে ধমক দিয়েছেন, তবু তার মধ্যে একটু আশ্বাসের সুরও যেন শুনেছে সে। আড়চোখে এবারে ঘরটার দেয়ালের দিকে ছাখে! বড়ো সুন্দর এই ঘরটা। পালিশ করা কাঠের দেয়ালে— তার ওপরে কাচ—

কুন্তি, একটু চা কিংবা কফি কিছু খাবি?

না, না, ও সব কিছু লাগবে না—

শুধু তোর জন্যে নয়, আমি এ সময়ে রোজই এককাপ কফি খাই, তাই বলছিলাম—

আনান তাহলে যা আপনার খুশি—

সুহাস বোতাম টিপে বেয়ারাকে ডাকে। তাকে দু-কাপ কফির জন্যে বলে। সে বেরিয়ে যাবার পরে বলে এই ছেলেটা কি পাশ জানিস?

কুন্তি শোনার অপেক্ষায় থাকে—

সুহাস একটু হেসে বলে— বি-এ, পাশ করে এম-এতে ভর্তি হয়েছিল। চাকরিটা পেতে পড়া ছেড়ে এখানেই আছে!

একটু থেমে সে আবার বলে, এইতো চাকরির বাজার, আর তুই তো সবে আজই আমাকে বললি! একটু সময় দে, ভেবে দেখি কাউকে যদি বলা যায়—

সুহাসদা ভুল বলেননি। চাকরির বাজারটা কুন্তিও জানে। সে খবরের কাগজ পড়ে— এই সেদিন তো পড়েছিল চাকরির জন্যে আঠারো লক্ষ দরখাস্ত পড়ার কথা। তবু তার এ বিশ্বাসও আছে যে সুহাসদার মতো একজন মানুষ যদি ভালো ভাবে চেষ্টা করেন, তাহলে কুন্তির একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

সুহাসও ভাবছিল— দত্তকে বললে হয়েই যেতো, কিন্তু তা সম্ভব নয় সুহাসের পক্ষে। তবে অন্য কাকে বা বলা যায়? আজ পর্যন্ত এই চেয়ারে বসে কাউকে সে তো বাড়তি সুবিধা দেয়নি। তাকে আজ কে দেবে? তবু সামান্য একটু আশা যে অনেকে সুহাসের ওপরে এমনিতেই খুশি হয়। তাদের মধ্যে কিছু বড়ো মানুষও আছেন। তাদের কয়েকজনকে বলে দেখবে সে— যদিও একথা জানা আছে যে, যাদের সে বলবে তাদেরও অনেক কাছের মানুষ নিশ্চয়ই আছে— আত্মীয়, দেশের লোক, পাড়ার ছেলে— সব বড়ো গাছের যেমন ছোট ডাল, ছোট ছোট পাতা থাকে— তেমনি সব বড় মানুষদের পাশে অনেক প্রার্থীর ভিড়! তাই, আশা যদিও খুব নেই। তবু, বলে সে দেখবে—

অবশ্য যদি সে এই অফিসটায় আরো কিছুকাল থাকতে পারে। আর গোলমাল তো সেখানেই। কুট্টিকে সে কথা বলা যায় না— ও বিশ্বাস করবে না। আর, দরকারই বা কী?

বড়োই খারাপ লাগে সুহাসের। মনে পড়ে যায় একটু আগেকার সেই কুট্টির কথাগুলো— কোথায় চলে যাচ্ছি আমরা! সুহাসও মনে মনে বলে— কোথায় যে চলে যাবো আমি!

কফি এসে গিয়েছিল। কাপ দুটো খালি হয়ে গেছে। সুহাস বলে ওঠে— খেলার লাইনে তো যেতে পারতিস কুট্টি! তোর যা খেলা ছিলো— বিশেষ করে ফুটবল—

খেলা তো বন্ধ হয়ে গেছে মাঠের জন্যে সুহাসদা! মাঠগুলো সব চলে না গেলে, কিংবা তার আগে একটু নাম হলে খেলাতেই আমি যেতে পারতাম, কিন্তু তার কোনো আশা আর নেই, বয়সটাও পার হয়ে গেল—

পাড়ায় মাঠ নেই বটে, তবু অন্য জায়গায় কোনো মাঠে গিয়ে তো খেলতে পারতিস।

অন্য জায়গায়! অন্য কোথায় আর যাবো সুহাসদা? এদিকের কাছাকাছি মাঠ তো বিবেকানন্দ পার্ক, আর দেশপ্রিয় পার্ক— সেটাকেও যদি ধরেন। কিন্তু ঢাকুরিয়া বালিগঞ্জ কসবা সব মিলিয়ে কতো লাখ ছেলে আছে ভাবুন তো! এক একটা মাঠে খেলা নিয়ে যে কতো মারামারি হয়েছে, ছুরি চলেছে তা তো আপনি জানেন না।

ছুরি চলেছে?

তা চলবে না? মাঠ দখলের কি কম লড়াই হয়েছে! খোঁজ নিয়ে দেখবেন

পার্কের কাছে যারা থাকে তাদের কাছে, আর আমাদেরই তো বন্ধু একজন হিন্দুস্থান পার্কের— ডান হাতটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে সুহাসদা—অবশ্য ছুরিতে নয়, বাঁশ আর হকি স্টিক। তখন বোমার সময় ছিলো না— তাই—

শুনে সুহাসের ভয় লাগে। মাঠের সমস্যার কথা সে আজ সকালে ভেবেছিল, কিন্তু সে ব্যাপারটা যে এতোদূর পর্যন্ত যেতে পারে তা ওর ধারণাও ছিলো না। থাকবেই বা কি করে? কী খবরই বা আর রাখে সে? শুধু বাইরের থেকে তাখে আর ভাবে—

তবুও সুহাস তার পুরনো কথার খেই ধরে বলে— কিন্তু গড়ের মাঠ?

কুট্টির মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে— হ্যাঁ, ওখানে খেলতে গেলে দুদিকে ইট সাজিয়ে গোল পোষ্ট তৈরি করে হয়তো খেলা চলতো, কিন্তু অতো দূরে গিয়ে কে খেলবে সুহাসদা? পায়ে হেঁটে অতোটা রাস্তা যাওয়া-আসা করে?

পায়ে হেঁটে— কুট্টির এই কথাটার মানে সুহাসের কাছে স্পষ্ট। সে অনুমান করতে পারে কুট্টি আরও কী বলবে। আর প্রায় সে কথাই যেন বলে উঠল্ কুট্টি—আপনাকে তো বলেইছি সুহাসদা, যে বড়দা বাজারে না গিয়ে আমাকে পাঠালে আমার সেদিন চল্লিশ পয়সা ইনকাম। তার সবটাই খরচ হয়ে যেতো বাসে আসা যাওয়া করতে—

সুহাসের একটা টেলিফোন আসায় কুট্টিকে থামতে হয়। ফোন শেষ হবার পরে কুট্টি আবার বলতে যাচ্ছে— বেয়ারা একটা ফাইল নিয়ে ঢুকল। সুহাস সেটা খুলে ত্যাখে। মাথা নামিয়ে সই করতে করতে বলে— বল, থামলি কেন?

আমি হেঁটে যেতে রাজি ছিলাম। কিন্তু ওদের বলিনি, কেননা এটাও আমি জানতাম যে অন্য ছেলেদের বললে ওরা হাসবে, ঠাট্টা করবে—

তা হয়তো করবে, কিন্তু তুই নিজে যদি রাজি ছিলি, তাহলে ওখানে যে-সব ছেলেরা খ্যালে তাদেরই কোনো দলে তো ভিড়তে পারতিস।

ওদের সঙ্গে কি খেলবো সুহাসদা! ওরা কেউ খেলতে জানে? ওরা হলো সব পার্ক-স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর বড়লোকদের ছেলে— দামী বল কিনে স্কুলের মাঠে না খেলে, কলেজের মাঠে না গিয়ে ময়দানে শুধু মজা করতে আসে। আর ধরুন যদি খেলতেই বা জানতো ওরা, আমাকে কেন নেবে তাদের দলে?

সুহাস চুপ করে যায়। তার মনে পড়েছে যে একটু আগে সে একটা ভুল প্রশ্ন করেছিল। কুট্টির সেই ইট সাজিয়ে কথাটাই তো যথেষ্ট উত্তর ছিলো— সে

নিজে তো একদিন খেলেছে। ক্লাবও চালিয়েছে। তাই, তার মনে থাকা উচিত ছিলো যে গোল-পোস্টের সঠিক মাপ না থাকলে কোনো আসল ফুটবল খেলা হতে পারে না— যেমন হতে পারে না কোনো ক্রিকেট ওই সব গলির খেলায়। ওখানে কোনো খেলোয়াড় কখন তৈরি হবে না— মাপটাই হলো আসল কথা সব খেলার মধ্যে— শুধু চোখে দেখা মাপ নয়— মনের মধ্যে সেই মাপটা তৈরি হয়ে যায় খেলার অভ্যাস করতে করতে— তাই, সঠিক মাপের গোল-পোস্ট ছাড়া ফুটবল, আর বাউণ্ডারী-লাইন ও পিচ ছাড়া ক্রিকেট— খেলা নয়, শুধু ছেলে-ভোলানো সময় কাটানো ব্যাপার।

কুন্তি নিশ্চয় সেই কথাটা বলেছিল। সুহাস তখন বুঝতে পারেনি—

কুন্তিও থেমে গিয়েছে। তার মনে পড়েছে যে সে এসেছে শুধু একটা চাকরির কথা বলতে। তার বদলে সে আজ কতো কথাই না সুহাসদাকে শুনিয়ে দিলো। এখানে আসার পর থেকে সে শুধু অনর্গল কথাই বলছে— কী একটা ঝোঁকই যেন তাকে পেয়ে বসেছিলো। সত্যি, এক এক সময় এরকম হয়। কতো কথা যে জমে থাকে মনের মধ্যে। বলার মতো লোক নেই। কে শুনতে চায় কুন্তির কথা? শুধু সুহাসদা আজ কিছু জানতে চেয়েছেন— তারই সূত্র ধরে বেরিয়ে এসেছে এতক্ষণ সে যা বলেছে। আরও অনেক কথা এখনও তার বলতে ইচ্ছে করছে। তবু আজ থাক! সে অন্যদিন বলবে— আজ শুধু একটা চাকরি চাই কুন্তির।

সুহাস আরও ভাবছিল— অনেক লোকের মতো সেও আজ কুন্তিদের বাইরে দেখে ভাবে— ওরা এটা করে না কেন? ওটা করলে তো ভালো হতো। কিন্তু যা বলা যায়, কাজে তা করা চলে না, কেননা ওদের এমন সব সমস্যা আছে যা সুহাসরা জানে না, চেনে না। তাই, আজ এ-পর্যন্তই থাক। আজ সকালে টুনুকেও সে প্রশ্ন করতে গিয়েছিল— পড়া ছাড়লি কেন? ভালো হয়েছে যে সেটা করেনি শেষ পর্যন্ত। তাহলে কুন্তির মতোই কিছু উত্তর তাকে শুনতে হতো। টুনুদের বাড়িতে যাবে সে পুজোর ছুটির মধ্যে একদিন। দেখা করবে সত্যসন্ধবাবুর সঙ্গে। সত্যি, উনি বড্ডো বুড়ো হয়ে গিয়েছেন।

সামনেই কুন্তি বসে আছে। ওকে এক কাপ কফি খাওয়াতে পেরে সুহাস মনে মনে খুশি হয়েছিল। কিন্তু ও এসেছে একটা চাকরির জন্য— যে কোন চাকরি —কুন্তি বলেছে। অথচ সুহাস তো ভেবে পায়নি এখনও যে কাকে সে বলতে পারে— তবে সুহাস দেখবে যদি কিছু করতে পারে। কুন্তির দিকে চেয়ে সে বলে — আচ্ছা কুন্তি, আজ তুই আয়, কয়েকদিন পরে একবার দেখা করিস—

কুন্তি উৎসাহের সুরে বলে— কবে আসবো বলুন ?

আমাদের তো ষষ্ঠীর দিন থেকে ছুটি হয়ে যাচ্ছে, তার আগে— আচ্ছা পঞ্চমীর দিন আসিস।

কোথায় ? এখানে ?

না, বাড়িতেই আসিস।

তারপর কি যেন ভেবে সে বলে ওঠে— থাক, তারও দরকার নেই— আমিই তোকে ডাকবো।

কুন্তি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুহাসদার কাছে কিছুটা যেন আশার ইঙ্গিতই সে পেয়েছে। লিফট্-এর সামনে এসে ভাখে— জায়গাটা খালি। দাঁড়ানোর কোনো দরকার নেই। সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। তখনই আবার মনে পড়ে যায় বাড়ি আর পাড়ার কথা— ওখানে এতক্ষণে কী কাণ্ড যে সুরু হয়েছে কে জানে। কুন্তি কি বাড়িতেই ফিরবে ? সেটা উচিত হবে কী ?

কিন্তু যাবার আর জায়গাই বা কোথায় ? কী মুস্কিলে যে পড়ে গেছে কুন্তি।

কুন্তি চলে যেতেই সুহাসকে আবার তার নিজের ভাবনাটা পেয়ে বসেছে। তারই মধ্যে সে কাজ করছে যন্ত্রের মতো। মাঝে মাঝে ফোন আসছে। উত্তরও দিচ্ছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে চিন্তাগুলো মনের মধ্যে ঘুরছে। ভালো লাগছে না একটুও— কুন্তি যতোক্ষণ ছিলো— সে ভুলেই ছিল একরকম। ভালোও ছিলো— অন্যের দুঃখের কথা শোনা, আর নিজের জন্য ভাবনা ঠিক এক রকম নয়—

আবার ফোন।— বিরক্ত হয় সুহাস রিসিভারটা তুলে বলে, ভৌমিক হীয়ার।

আমি দত্ত বলছি মিঃ ভৌমিক—

শুনেই চমকে ওঠে সুহাস— আবার দত্ত। কী চায় এবারে ? সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে অভ্যস্ত সুরে বলে— হ্যাঁ, বলুন—

সান-গ্লাসটা পেয়ে গেছি মিঃ ভৌমিক, সেটাই জানাচ্ছি—খুবই দুঃখিত আপনাকে তখন ডিসটার্ব করার জন্যে। জানেন, ব্যাপারটা কী হয়েছিল। পিছনের সীট আর পিঠের গদির মধ্যে যে ফাঁকটা আছে তারই মধ্যে কিভাবে যেন ঢুকে গিয়েছিল। লাঞ্চ থেকে ফেরার সময়ে গাড়িতে উঠে বসতেই মনে হলো কোমরের নিচটায় কী যেন শক্ত মতো লাগচে। তখনই হাত দিয়ে দেখি কিনা—

সুহাস বলে ওঠে তাঁর কথার মধ্যেই— যাক ভালোই হয়েছে, পেয়েছেন যখন—

তা তো হয়েছেই মিঃ ভৌমিক। কিন্তু জানেন, ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হলো আমার, যে গাড়ির মধ্যে ওটাকে নিজের দোষে ফেলে আপনাকে কি রকম জ্বালাতন করেছি— আপনাদের বাবু-সাহেবকেও—

সুহাসের মুখে একটা উত্তর ঠেলে এলেছিল— আর এখন যা করছেন, সেটা তবে কী ?

কিন্তু তা বলে না সুহাস। তার মনে পড়ে গেছে— সান-গ্লাসটা আসল ব্যাপার নয়— উপলক্ষই। দত্ত আর একবার কথা বলতে চেয়েছেন। আর, সুহাসও কি ঠিক এটাই চায়নি ? সে বোঝে এবারে ওঁর কথাগুলো ঘুরতে ঘুরতে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। খুবই সম্ভব— সে অপেক্ষা করে দেখবে তার অনুমানটা ঠিক কিনা।

আমাকে একটুও জ্বালাতন আপনি করেননি মিঃ দত্ত, সেটা আমার দিক থেকে অন্তত বলতে পারি— সুহাস বলে।

না, দেখুন, আপনাকে আমি তো আজ অফেণ্ড করে এসেছি।

অফেন্সের আর কী আছে ? আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম, তাই হয়তো কথা বলতে পারিনি।

না, আমারই ভুল হয়েছিল মিঃ ভৌমিক, আপনার বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে।

বাড়িতে তো অনেক রকমের অসুবিধে। তা বুঝতেই পারবেন আশা করি—

আমার উচিত ছিলো বাইরে কোথাও দেখা হওয়ার কথা বলা।

সুহাস ভাবছিল ঠিক কী উত্তর এবারে দেওয়া যায় ? কিন্তু দত্তই বলে ওঠেন— আশা করি তাতে আপনি অফেন্স নিতেন না ?

কী আপনি অফেন্স্, অফেন্স্, বারবার বলছেন মিঃ দত্ত। অফেন্স্ নেওয়ার মতো হয়েছে কী ?

আসুন না তাহলে, লেট আস মীট।

কোথায় ? সুহাস বলে।

যেখানে আপনার ইচ্ছে, বলুন, আপনি যেখানে বলবেন, যে সময়ে বলবেন— দত্ত উইল বী দেয়ার।

সুহাস বলে— আপনার অফিস ছুটি কটায় ?

এমনিতে সাড়ে পাঁচটায়, কিন্তু তারপরে কিছু কাজ চলে, তবে আপনি যদি বলেন তাহলে আরও দেরি আমি করতে পারি।

ঠিক আছে, আপনি অফিসেই থাকবেন, ছটা নাগাদ আমি ওখানেই যাবো।

তাহলে তো খুব ভালো হয়— দত্তর খুশি-গলায় উত্তর শোনা যায়— গাড়িটা কী আপনাদের অফিসের গেটের সামনেই পাঠাবো ?

গাড়ির কোন দরকার নেই। আমি নিজেই যাবো।

মিছিমিছি কেন কষ্ট করবেন মিঃ ভৌমিক, আমার একটা গাড়ি যখন আছেই—

না, মিঃ দত্ত, গাড়ি আপনি পাঠাবেন না—

সুহাসের মনে পড়েছিল—অতো লোক দেখিয়ে নয়, তাতে ক্ষতি হতে পারে।

ঠিক আছে, আমি ওয়েট করবো মিঃ ভৌমিক—

আচ্ছা, তাহলে এখন রাখি ?

নমস্কার, মিঃ ভৌমিক।

নমস্কার— সুহাস বলে—

টেলিফোনটা নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই সুহাসের মনে হয়— একটা ভুল সে করে ফেলেছে। দত্তর অফিসে গিয়ে দেখা করার কথা বলা তার উচিত হয়নি। তবু যা হয়ে গেছে— গিয়েছেই। তা নিয়ে তার না ভাবাই ভালো—

দত্তর সঙ্গে দেখা হবে। দারুণ বুদ্ধির একজন মানুষ—যিনি একটা সান-গ্লাসকে উপলক্ষ করে দু-বার কথা বলতে পারেন—হারিয়েছি। পেয়েছি। সুহাসকে এবারে মাথাটা খুব স্থির রাখতে হবে— নিজের চেম্বারের মধ্যে বসে সুহাস ভাবতে থাকে।

না, এখানে আর নয়, সে এক সময়ে স্থির করে— সুহাস এই ঘরটার থেকে বের হয়ে লাট-ভবনের দক্ষিণে যে কোন ফাঁকা জায়গায় ঘাসের ওপরে গিয়ে বসবে। তারপর ছটা নাগাদ যাবে দত্তর অফিসে। তার আগে মনের মধ্যে সে সব কিছু ঠিক ভাবে সাজিয়ে নেবে।

এ্যাটাচির মধ্যে তার সবগুলো জিনিষ ভরে নিয়ে সুহাস ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। চোখের সামনে প্রথম যে বেয়ারাকে দেখতে পায় তাকেই বলে— বাসু-সাহেব খোঁজ করলে বোলো আমি একটু কাজে বাইরে যাচ্ছি।

সুহাস দরজার দিকে দ্রুতপায়ে হাঁটে। আজ অনেকক্ষণ পরে তার মনে প্রথম একটু স্বস্তি — বারো-শো টাকা মাইনের অফিসার সে— এইটুকু সুবিধা— তার বেশি কিছু বলতে তাকে হলো না। ঢুকতে হলো না ওই বড়ো ঘরটার মধ্যে যেখানে বাসু-সাহেব রয়েছেন।

বড়ো দরজাটা দিয়ে বেরিয়েই সামনে লিফট্। সুহাস তার গায়ে লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে ছাখে— সেটা নামছে, না উঠছে। নিচের দিক নামতে দেখলে সে দাঁড়ায়। উধ্বগামী থাকলে সিঁড়ি দিয়ে নামে। এখন নিচের দিকেই নামছে। সুহাস দাঁড়িয়ে থাকে। লিফট্ সামনে এসে থামতেই সুহাস ছাখে ওদের পুরনো লিফট্ম্যান বুধন সিং দরজাটা খুলে দিচ্ছে। বুধন ছুটিতে গিয়েছিল, আজই হয়তো ফিরেছে—

সুহাসকে দেখামাত্র সে হাত তুলে বলে— সেলাম সাব্।

ঘরসে কব আয়া বুধন ?

কল্ আয়া সাব্—

খবর সব আচ্ছা হ্যায় ?

জী হাঁ সাব্, আচ্ছা হ্যায়।

ঘরকা সবকোই ঠিক হ্যায় তো ?

জী হাঁ সব, আপকো দোয়াসে—

লিফট্ নামছে। এক একটা তলায় থামছে। বুধনেরও ইচ্ছে করছে কোন ফাঁকে তার সাহেবকে কুশল প্রশ্ন করার। সে একসময়ে সঙ্কুচিত ভাবে বলেও ফ্যালে— সাব্, আপকো খবর সব আচ্ছা হ্যায় তো ?

হাঁ বুধন সবহী আচ্ছা—

লিফট্ ততোক্ষণে অনেক নিচে নেমে এসেছে। বুধন তখনই বলে— ভাগ চল্ আয়া মুল্কসে সাব্, ছুট্টি খতম হোনেকা পহ্‌লেই। খেতি বিলকুল নষ্ট্ হো গয়া—

বিলকুল ? সুহাস একটু চমকে উঠে বলে— ক্যা হুয়া থা বুধুন ?

বারিশ্, ইস্ সালমে ঠিক নহী হুয়া সাব—

সুহাস আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। বুধনও আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু লিফট্ ততক্ষণে নিচের তলায় থেমেছে। ওপরে ওঠার যাত্রীরা ভিতরে ঢুকছে। সুহাস বের হয়ে এল—

॥ নয় ॥

লীলা ফিরে আসতেই টুনু বলে— আমার সঙ্গে আজ কিন্তু টাকা নেই ভাই।

টাকা নেই ? তাহলে এলি কেন মিছিমিছি ?

টুনু চুপ করে থাকে একটু সময়। তারপর কুণ্ঠার সুরে বলে— কদিন ধরেই একটাও কাজ পাইনি, যা হাতে ছিলো সব আজ লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে গিয়ে খরচ হয়ে গেছে, তুই কদিনের জন্যে ধার দিতে পারিস না ?

লক্ষ্মীপুজো ? লীলার চোখে মুখে বিস্ময়।

হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে বরাবরই হয় কিনা ? প্রত্যেক বিষ্যুদবারে।

লক্ষ্মীপুজো করতে করতে শেষে লাইনে চলে এলি ?— লীলার কথার মধ্যে ব্যঙ্গের সুর।

টুনু এর উত্তর দিতে পারতো। বলতে পারতো, দেবতার কাছে মানুষের শুধু চেয়ে যাওয়ার অধিকার— আর কিছু নয়। তিনি যখন দেবেন নিজেই দেবেন তাঁর পছন্দমতো সময়ে। তবু দিলেন কি না তা নিয়ে অভিযোগ করা মানুষের উচিত নয়। ব্যঙ্গ তো নয়ই। আর টুনু তো লাইনে এসেছে অনেক কারণে। সব দোষটা দেবতার নয়। কিন্তু কিছুই না বলে সে লীলার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

আমাদের বাড়িতেও হতো। আমি বন্ধ করিয়ে দিয়েছি।

টুনু এ-প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায়। বলে— তুই যদি ধার না দিতে পারিস তাহলে আজ বরং থাক, কাল কিংবা পরশু আসবো।

লীলা কি যেন ভেবে নিয়ে বলে— না, চল, এসেছিস যখন—

কতো নেয় রে ?

এমনি দেখতে ষোলো টাকা নেয়, কারো কারো কাছে বেশিও, তবে আমার তো চেনা, কিছু কমই দেবো।

কতো দিবি।

সে পরে দেখা যাবে, এখন চল তো আগে—

বাস-এ এখনও বিকেলের ভিড় সুরু হয় নি। সামনের দিকে লেডিস সীটে বসার জায়গা ওরা দুজনেই পেয়ে যায়।

কনডাকটর এগিয়ে এসে ভাড়া চায়। লীলা ব্যাগ খুলে পয়সা

করেছে। টুনুর হাতেও একটা এক টাকার নোট, কিন্তু হঠাৎ লীলা পয়সাগুলো ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে বলে— আমার ভাড়াটাও তুই দিয়ে দে।

একটু অবাক লাগে টুনুর। দুজনের ভাড়া দেওয়াটা কিছু কঠিন নয় তার পক্ষে— একটা টাকা যখন আছেই, কিন্তু লীলা কখনও এ রকম করে না। ওরা একসঙ্গে থাকলে সেই সব সময় বেশি খরচ করে, আর ভাড়া যদি টুনুকেই দিতে বলবে তা হলে পয়সা ও বেরই বা করেছিল কেন?

লীলাটা যেন কী রকম। টুনু বসে বসে ভাবে— ঠিক এ রকম একটা মেয়ে সে আজও ছাখেনি— দেখতেও ওদের মধ্যে খুব থেকে সুন্দর লীলা— তা হওয়ারই কথা, ওর বাবার চেহারা তো আজ দেখেছেই টুনু— যা রঙ! তার সবটা পেলে ওকে আরও কতো সুন্দর দেখতে হতো। বাবার মুখটা শুধু অনেকটা পেয়েছে। কিন্তু কতোটা? ঘুরে দেখতে গিয়ে টুনু দেখল লীলা এখন বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাস্তার মানুষ জন দেখছে। টুনুও ছাখে অন্য দিন, কিন্তু আজ সে তার নিজের চিন্তার মধ্যে ডুব দিল।

বাস থেকে নেমে নিউ মার্কেট পিছনে ফেলে টুনু লীলার পিছন পিছনে চলে। একসারিতে কতকগুলো কাপড়ের দোকান। তার পাশ দিয়ে চলতে চলতে মাঝখানে একটু ফাঁকের সামনে লীলা থামল। টুনুর দিকে ইসারা করে তারই মধ্যে ঢুকে বলল— চলে আয়।

সরু একটা সিঁড়ি। লীলার পিছনে পিছনে সেটা দিয়ে ওঠে টুনু দু তলায় চলে এল। বারান্দা দিয়ে একটু এগিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল লীলা। টুনু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লীলা ডাক দিল— কি রে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভিতরে আয়।

টুনুর বুকটা দুরদুর করছে। কিছু একটা অজানার সামনা সামনি সে এখন। ঘরের মধ্যে ঢুকল টুনু। ভিতরে শুধু লীলা আর একটা বারো তেরো বছরের খাকি হাফ-প্যান্টের ওপরে আধময়লা শাদা সার্ট পরা ছেলে। লীলা তাকেই বলছে— কব্ আয়েগা ডাক্তার সাব্?

আনেকো টাইম তো হোগিয়া, আপ বৈঠিয়ে না।

বোস টুনু— লীলা সেখানকার একটা সোফার ওপরে বসে পড়ে বলে।

এটা ডাক্তারের ঘর তা দেখেই বোঝা যায় — দেয়ালে দুটো বড়ো বড়ো

রঙীন ছবি টাঙানো— টুনুর ছোটবেলার স্বাস্থ্য বইয়ে মানুষের দেহের ছবির মতো, কিন্তু আরও অনেক বেশি এগুলোর মধ্যে রয়েছে— ভিতরে কালো রেখার মধ্যে কঙ্কাল, তার ওপরে সরু মোটা নীল-লাল রঙে শিরা ধমনী আঁকা ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড—সব কিছু দেখানো। বাইরে দিয়ে সরু সূক্ষ্ম রেখায় মানুষের চেহারাটা।

ভিতরে আমরা ওই রকম— বাইরে শুধু আলাদা আলাদা মানুষ—টুনু, লীলা সামনের ওই টুলে বসে পা-দোলানো ছেলেটা—সবাইকার মধ্যে একই জিনিষ— বাইরে তবু কতো তফাৎ—

টুনুর ভাবনাটা থেমে যায় লীলার কথায়—কি দেখছিস— ছবি ?

হ্যাঁ—

কোনটা দেখছিস ? ফুলেরটা, না সুরজ কুমারীর ?

ওই ছবিগুলোকে আগে লক্ষ্য করে নি টুনু। এখন ত্যাখে— ক্যালেণ্ডারের পাতায় একটা সুন্দর লাল গোলাপের ছবি, তারই পাশে ফ্রেমে বাঁধানো এক চিত্র-তারকার ছবি।

ডাক্তার শর্মার সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিলো জানিস। একটা এ্যালবামে ওর কতো ছবি যে আছে।

লীলা বলতে থাকে আরও কিছু কথা— কিন্তু টুনুর চোখ ততক্ষণে আরেকটা ছবির ওপরে পড়েছে — একটা বড়ো রঙীন ছবিতে বিভিন্ন বয়সের ভ্রূণের ছবি— প্রথমে তালগোল পাকানো অদ্ভুত একটা পিণ্ডের মতো, তারপর বদল হয়ে শেষে কিছুটা মানুষের মতো চেহারা- ছবিটা দেখা মাত্রই সেই ভয়টা ফিরে এসেছে আবার— টুনুরটা তবে কি রকম ? ওর কি সত্যিই—

টুনুর চিন্তা থেমে যায় লীলার কথায়— এ রকম তো দেরি হয় না ডাক্তার শর্মার কোনদিন।

তারপর টুলের ওপরে বসা সেই ছেলেটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে লীলা বলে— এই ছোঁড়া! কোনো জায়গা থেকে দেখে আয় তো কটা বাজে এখন—

ছেলেটার পা দোলানো বন্ধ হয়ে একটু ঢুলুনির মতো এসেছিল— চোখ দুটো আধ বোজা, মাথাটা একটু কাৎ হয়ে দেয়ালে হেলানো—

এই ছোঁড়া, উঠলি ?— লীলা আবার বলে—

ছেলেটা মাথা ঝাঁকি দিয়ে সোজা হয়ে বসে, তারপর উঠে দাঁড়ায়। শরীরে

একটু আড়মোড়া ভেঙে যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বাইরে চলে যায়। লীলা একটু হেসে ওঠে, ঘুম-চ্যাম্পিয়ন।

তারপর হাতের পত্রিকাটা সরিয়ে রেখে টুনুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে— পূজোয় কি কি শাড়ি কিনলি রে টুনু?

একটা নিঃশ্বাস ফেলে টুনু উত্তর দেয়— এখনও কিছুই হয়নি রে। সময়টা সব দিক থেকেই এমন খারাপ যাচ্ছে— জানিস, আজ কাদন হয়ে গেল কাজ একটাও পাইনি।

বলিস কি। এই পূজোর বাজার চলছে, আর তুই কিনা কাজ পাচ্ছিস না?

হ্যাঁ রে, মন টনও তেমন ভালো নেই যে খুঁজে একটু দেখবো—

তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মতো নিচু গলায় বলে— এদিকে বাবার একটাও পরার মতো ধুতি নেই। মায়ের তো প্রায় গামছা-পরা চলছে— কি যে করি।

তা আমাকে বলিসনি কেন? আমি বলে এদিকে কতো পার্টি ছেড়ে দিচ্ছি রোজ—

একটু থেমে লীলা আবার বলে— তোর তো একটা দাদা আছে না রে?

হ্যাঁ, তবে না থাকলেই ভালো ছিলো—

লীলার কণ্ঠস্বরে একটু বিষণ্ণতার সুর ফুটে ওঠে এতক্ষণে— শুধু যদি আমাদের বাড়িগুলো না থাকতো রে টুনু। বাবা মা ভাই বোন—যতো সব অপোগণ্ডের দল—

ঘরের দরজায় শব্দ উঠতেই ওরা দুজনে একসঙ্গে ফিরে সেদিকে তাকায়। টুনু দেখল, দীর্ঘকায় একজন মাঝবয়সী সুন্দর চেহারার মানুষ ঘরের মধ্যে ঢুকছেন। প্রথমে টুনুর দিকে চেয়ে, চোখ সরিয়ে লীলাকে বলেন— কী খবর লীলা?

তাঁর দৃষ্টি আবার টুনুর দিকে ফিরে আসে— এ কে? নতুন কেস?

হ্যাঁ, আপনার জন্যে অনেকক্ষণ বসে আছি।

একটা অপারেশন ছিলো। তা তোমার কখন এসেছো?

ঘড়ি তো নেই যে সময়টা বলবো। তবে সে অনেকক্ষণ—

ডাক্তার শর্মা বলেন— ফজলুটাকে দেখছি না তো? দরজা তবে খুললো কে?

আমি ওকে ঘড়ি দেখতে পাঠিয়েছিলাম, গিয়ে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে কোথাও—

টুনু একটু অবাক হয়ে যায় ডাক্তার শর্মার সঙ্গে লীলাকে এভাবে কথা বলতে

দেখে। আর উনিও যেন রসিকতাটা উপভোগ করছেন— সেভাবে একটু হেসে বলেন— আচ্ছা, তোমরা এক মিনিট বোসো, আমি একটু ঠিক হয়ে নিই।

ডাক্তার শর্মা আর একবার টুনুর দিকে তাকিয়ে ঘরের অন্যদিকে একটা দরজা ঠেলে ভিতরে চলে যান।

ঘরে এখন একটাও মানুষ নেই তবু লীলা একটু চাপা গলায় বলে— জানিস, দারুণ প্রাকটিস্ ডাক্তার শর্মার। এটা ছাড়া আরও একটা চেম্বার আছে— নার্সিং হোমে, সেখানে নার্স, এ্যাসিস্‌টেন্ট সব আছে।

একটু থেমে লীলা আবার বলে—এই জায়গাটা শুধু আমাদের মতো মেয়েদের জন্যে— তাতে আমাদেরও সুবিধে, বেশি ভিড়ের মধ্যে যেতে হয় না—

টুনু ভাবছিল অন্য একটা কথা— সেটাই বলে ওঠে— বেশ ভালো বাংলা বলেন, না ?

শুধু বাংলা নয় আরও অনেকগুলো ভাষা উনি বলতে পারেন, এর আগে তো বোম্বেতে ছিলেন। সেখানে মারাঠী আর গুজরাটি, দিল্লীতেও কিছুকাল কাটিয়েছেন— উর্দু-হিন্দী পাঞ্জাবী—

ভিতরের দরজাটা তখনই খুলে যায়। ডাক্তার শর্মা বেরিয়ে এসেছেন।

টুনুর দিক থেকে চোখ সরিয়ে লীলাকে বলেন— এসো।

টুনুকে বসার ইঙ্গিত করে লীলা ভিতরে চলে যায়। দরজাটা এবারে আগের মতো পুরো বন্ধ হয়নি। ভিতর থেকে অস্পষ্ট কথার শব্দ শোনা যায়। টুনু একটু শোনার চেষ্টা করে। এক একটা শব্দের টুকরোই শুধু— বোঝা যায় না। তবু টুনু শোনার চেষ্টা করছিল, কিন্তু দেয়ালের সেই ভ্রূণের ছবিটা আবার তার দৃষ্টি টেনে নিয়েছে— সেই অমঙ্গলের ভাবনাটাও চলে এসেছে মনে। ভয় পেয়ে টুনু ছবিটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তবু চিন্তাটা ছাড়ে না কিছুতেই—

হঠাৎ লীলা বেরিয়ে এসে ডাক দেয়— আয় টুনু।

টুনু উঠে দাঁড়ায়। বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা দুপ্‌দাপ্ করে বাজছে। সে চলেছে লীলার পিছনে। ঘরের মধ্যে ঢুকল। সামনে একটা টেবিলের ও-পাশে ডাক্তার শর্মা বসে আছেন, উল্টোদিকে টুনুদের সামনে দুটো খালি চেয়ার, অন্য দুদিকে এক-একটা করে। এক লহমায় সে চারপাশে দেখে নিয়েছে— ডান দিকে সরু একটা বিছানার ওপরে রবার ক্লথ পাতা। তার পাশেই

একটা আলমারিতে কিছু বই আর ডাক্তারী যন্ত্র। আরেক কোণে ছোট্ট এক আলমারিতে কিছু ওষুধ, তুলো— এইসব।

এরই কথা বলছিলাম— আমার বন্ধু কমলা। জানেন ও কিন্তু খুব ভালো মেয়ে—

বোসো কমলা— ডাক্তার শর্মা হাসিমুখে বলেন— তুমিতো খুব ভালো মেয়ে, তাই চুপ করে ওই চেয়ারটায় বসে থাকো—

টুনু বসে। ডাক্তার শর্মার হাসির সুরটায় আর কথায় তার একটু আগেকার ভয় কিছুটা কমে যায়, সে আবার ঘরের চারপাশে দেখার চেষ্টা করে— এতো সুন্দর একটা ডাক্তারের ঘর সে আগে কখনো ছাখেনি। দেখে টুনু আশ্বাস পায়— খুব বড়ো ডাক্তার তাতে কোন ভুল নেই।

বলো, তোমার কী হয়েছে ?

বা রে। ও কি বলবে ? আপনিই তো ওকে দেখার পরে বলবেন।

হ্যাঁ, দেখেই বলবো— কিন্তু তার আগে কিছু খাবে তোমরা— চা, না কফি ?

লীলা উত্তর দেয়— না, ও সবকিছুর দরকার নেই, একটু আগেই তো ভাত খেয়ে এসেছি—

তুমিও কিছু খাবে না কমলা ?

না— টুনু লজ্জা কাটিয়ে তার প্রথম কথাটা বলে।

আচ্ছা লীলা, তাহলে তুমি একটু বাইরে গিয়ে বোসো।

ও আচ্ছা। ভুলেই গিয়েছিলাম জানেন। একট হেসে লীলা ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায়।

টুনুর বুকে আবাব দুর দুর সুরু হয়ে যায়—সে কোনদিন মেয়েদের ডাক্তারের কাছে যায়নি। দরজাটা ডাক্তার শর্মা নিজেই বন্ধ করে দিলেন। হাতে রবারের দস্তানা পরছেন—

লীলা বাইরে এসে আরেকটা সিনেমা পত্রিকা খুলে ছবি দেখতে থাকে। এদের সবাইকে সে চেনে। কতো গল্প যে জানে ওদের বিষয়ে— লীলা একটাও ছবি বাদ দেয় না— কে কে কোন বইয়ে কিসের পার্টে নেমেছিল সব ওর মুখস্থ।

খানিকক্ষণ পরে টুনু বেরিয়ে এসে বলে— ভিতরে যা লীলা, তোকে এবারে ডাকছেন—

লীলা উঠে যাওয়ার পরে টুনু বসে থাকে তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। ডাক্তার শর্মা বলেছেন, তুমি বাইরে গিয়ে লীলাকে পাঠিয়ে দাও, ওকেই বলবো। কিন্তু খবরটা জানার জন্য টুনু অধীর হয়ে আছে—লীলাকে উনি কী বলবেন? কী বলছেন? লীলা এখনও আসছে না কেন?

টুনু বসে আছে। বসেই আছে— কী খবর তার জন্য আসবে?

কই, লীলা তো এখনও বাইরে আসছে না—

দীর্ঘ, দীর্ঘ কতো সময় যে এমনি প্রতীক্ষায় তার পার হয়ে যায়। লীলা কি বেরিয়ে আসবে না কোনদিন? শুধু তো একটামাত্র কথা এসে বলে যাওয়া— টুনু উনি বললেন, তোর কিছুই হয় নি রে! কিন্তু তা কী ও করবে? টুনুর যে সময় এখন কি রকম ভাবে কাটছে সেটা যদি জানতো লীলা! টুনু কি উঠে ওই দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে শুনবে?

হয়তো তাই করতো টুনু, কিন্তু তার দরকার হলো না— হঠাৎ দরজা খুলে লীলা বেরিয়ে আসে একটু হাসি হাসি মুখে। দেখামাত্র টুনুর বুক থেকে একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন সরে গিয়েছে— যাক, বাঁচা গেল!

তোর খবর খুবই ভালো— লীলা বলে।

টুনু তা বুঝছে, কিন্তু লীলার দিকে চেয়ে একটু বিস্মিত হয়— ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে ছোট্ট একটু বৃত্তের মতো তৈরি করে সে বলছে— এই এতটুকুন, জানিস টুনু— তোর এখন ঠিক তিন মাস উনি বললেন—

লীলার হাতের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে টুনু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে।

লীলা হাসে আবার— এখনও বুঝছিস্ না? তোর তো সুখবর! পুরো তিন মাস হতে আর কদিন মোটে বাকি—

টুনুর মাথাটা দুলে উঠল। সোফার হাতল দুটো সে দুহাত দিয়ে চেপে ধরল — চোখের সামনে শুধু অন্ধকার। অন্ধকার—

কি রে। তুই ও রকম করছিস কেন? হয়েছে তো ভয়ের কী আছে? ডাক্তার যখন রয়েছেন—

তার পর গলার স্বর বদল করে লীলা বলে— আর জানিস, তোর একটা পয়সাও লাগবে না ওঁর তোকে পছন্দ হয়েছে।

টুনু কিছু শুনছে, কিছু শুনতে পাচ্ছে না— লীলা বলেই চলেছে— উনি বললেন, তোমার বন্ধু যদি রাজি হয় লীলা, তাহলে— টুনু, তুই নাকি খুব

ভালো জিনিষ— উনি বললেন। কী জানি বাব্বা, কি রকম জিনিষ যে তুই।—

টুহু স্তব্ধ হয়ে শোনে—

লীলা এবারে হাসি থামিয়ে বলে— বল, ওঁকে গিয়ে কী বলবো? উনি তোর জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছেন—

টুহু একটা ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে, বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে, সিঁড়িতে টাল খেয়ে পড়তে পড়তে একটুর জন্যে বেঁচে সে রাস্তায় নেমে এল। পা চালালো যতো দ্রুত সে পারে— পিছনে একটা বিশাল দৈত্য তাকে তাড়া করে চলেছে— বিরাট একটা হাত বাড়িয়ে টুহুকে প্রায় ধরেই ফেলেছে— এইবারে ধরলো। টুহু তাকে ধরতে দেবে না— সে পালিয়ে যাবে যতো দূরে পারে—

লীলা যে কোথায় তা মনে নেই টুহুর— শুধু তার গলার শব্দ সে যেন শুনেছে— কখন, কতো দূরে, তা মনে নেই— কতো বাধা সে পার হয়ে এসেছে তার হিসাব নেই—

সামনে চৌরঙ্গী। টুহু এখনও প্রায় ছুটতে ছুটতে চলেছে। একটা রিক্সা টুহুর পিছন থেকে এগিয়ে এল। ওর পাশে আসতেই সেটার থেকে মুখ বের করে লীলা বলল— টুহু, থাম তুই।

তারপর রিক্সা থামতেই লীলা ওর কাছে এগিয়ে এসে বলে— তা আমাকে তো বললেই পারতিস। আমি কি দোষ করলাম বল? বাব্বা, কী মেয়ে রে তুই।

টুহু দাঁড়িয়ে দম নিতে থাকে।

লীলা চারপাশে তাকিয়ে বলে— এখানেও কুত্তাদের ভিড় জমছে— চল, ওদিকে মাঠের মধ্যে গিয়ে কোথাও একটু বসি।

টুহু লীলার কথায় ফিরে দেখল যে এইটুকু সময়ের মধ্যেই ছোট্ট একটু ভিড়ের মতো তৈরি হয়েছে ওদের চারপাশে, আর দু-একজন মানুষ কাছে এগিয়ে একটু খারাপ ভাবে তাকাচ্ছে—

লীলা রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলে— আয়।

টুহু তার সঙ্গে চলে— লীলার হয়তো ততো দোষ নেই—তার মনে হয়।

লীলা ভাবছে এই অদ্ভুত মেয়েটার কথা— ওদেরই লাইনের, তবে অন্য রকমেরই একটু— মাথায় কিছু ছিট নিশ্চয় আছে।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা এগিয়ে ওরা চৌরঙ্গী পার হলো। হকার্স কর্ণারের দক্ষিণে গিয়ে প্রথম যেটা খালি জমি, আর তার ওপরে বসার মতো ঘাস, সেখানে পৌঁছে লীলা বলে— বোস টুনু।

দুজনে বসার পর প্রথম কথা বলে ওঠে লীলা— তুই কিন্তু দারুণ একটা বোকা আছিস টুনু।

আছি তো আছি।

আরে, তাই তো আমিও বলছি— না হলে এ রকম কেউ করে? এমন একটা হাতের খদ্দের তুই ছাড়া আর কেউ ফেলতো না টুনু।

ফেলতো না?

আমি যদ্দুর জানি কেউই ফেলতো না। কেননা লাইনেই যখন রয়েছিস, আর থাকতেও তোকে হবে, এ রকম একটা তৈরি খদ্দের –

লীলার কথার মধ্যে টুনু বাধা দিয়ে বলে— কী বলছিস? খদ্দের?

হ্যাঁ রে টুনু হ্যাঁ, খুব ভাল খদ্দের, যা বলছি এখন মন দিয়ে শোন, কথার মধ্যে কথা বলিস না, উত্তর দিতে হয় তো আমার কথা শেষ হলে দিস, কথাগুলো পছন্দ না হলে তা শুনে চলারও দরকার নেই— তাই এখন একটু চুপ করে শুধু শুনে যা—

বলে, লীলা তার হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগটা কোলের ওপরে নামিয়ে পিছন দিকে একবার ঘুরে ভাখে, তরপর টুনুর চোখে চোখ রেখে বলে— যেসব লোকের কাছে তোকে রোজ যেতে হয়, তাদের থেকে একটুও খারাপ যে এই ডাক্তার শর্মা নন, সেটা হলো আমার প্রথম কথা।

তারপরে আরও শোন টুনু যে একজন ডাক্তার খদ্দেরকে কোনো মেয়েরই ছাড়া উচিত নয়! কেননা, যে কোনো সময় তাকে দরকার হতে পারে, আর এখন তো তোর দরকারই ছিলো। বিনা পয়সায় তোর কেসটা ওঁকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারতিস—

লীলা হঠাৎ টুনুর একটা হাত দুহাতে চেপে ধরে বলে— আবার ছুট দিবি না তো?

টুনু হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। লীলা হাসছে— বল, তাহলে একটা রিক্সা ধরি আবার।

টুনু কোনো উত্তর দেয় না। রাস্তা দিয়ে সেই দৌড়ানোর জন্য একটু লজ্জাই সে পায়— কিছু দরকার ছিলো না। হেঁটেই তো সে চলে আসতে পারতো—

—কাজটা সে ঝোঁকের মাথায় করেছে, কিন্তু অবাক লাগে ভেবে— এ রকম ভয়ই বা সে পেল কেন হঠাৎ?

লীলা আবার বলতে স্বরু করেছে— তাছাড়া আরেকটা কথা, সব দিক দিয়ে ভেবে দেখলে তোকে ওঁর পছন্দ হয়ে যাওয়াটা তোর পক্ষে একটু ভাগ্যেরই ব্যাপার— কেননা কতো মেয়েই তো ওঁর কাছে রোজ আসে যায়। তাদের সবাইকে কি উনি পছন্দ করেন? কই, আমিও তো প্রথম যেদিন এসেছিলাম আমাকে তো এ-কথা বলেননি উনি? কোন দিনই বলেন নি—কিন্তু তোর থেকে কি দেখতে আমাকে খারাপ? শুধু বয়সই না তোর আমার চেয়ে কম।

টুনু কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, লীলা তাকে থামিয়ে বলে—তুই খুবই ভুল করেছিস টুনু। ওঁর সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করে তুই যদি ওঁকে গেঁথে নিতে পারতিস তাহলে রোজ এ-পার্টি ও-পার্টি তোকে খুঁজে বেড়াতেও হতো না। উনি যে টাকা রোজগার করেন তার একটু আধটু ছিটে-ফোঁটা পেলেও তুই দিব্যি চলতে পারতিস।

একটু থেমে কথার স্বর বদল করে টুনুর চোখে প্রশ্ন তুলে বলে— বলতো দেখি কতো রোজগার ডাক্তার শর্মার?

টুনুকে নিরুত্তর দেখে সে নিজেই উত্তরটা দেয়—এক একটা অপারেশনে তিনশো, পাঁচশো, হাজার—লোক বুঝে, কেস বুঝে। রোজই এ-রকম কেস দু-একটা ওঁর আছে। তা ছাড়া ভিজিট আছে, দুটো চেম্বারের ফিস আছে— তাতেও দিনে দেড়-দুশো টাকা হয়। মোট তাহলে মাসে কতো টাকা হলো টুনু?

টুনুর উত্তরের অপেক্ষায় একটু চুপ করে থেকে লীলা বলে— হিসাব করা একটু শক্ত রে টুনু। মাথার ঠিক থাকে না ভাবতে গেলে—

টুনু এবারে তার প্রথম কথা বলে এতোক্ষণের সব ভাবনা উপচে দিয়ে—ও না— ডাক্তার।

তা কী হলো?

মনের গভীর থেকে একটা ঘৃণা উঠে এসেছিল টুনুর সামনে— ডাক্তার শর্মার ওপর, পৃথিবীর ওপর, পুরুষের ওপর— সব পুরুষ যেখানে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। সেই ঘৃণ্য পশুগুলো যারা মেয়েদের শরীর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। ধিক্কার জাগে

তার নিজের ওপর—টুনু নিজেই তো নগ্নদেহে তাদের দিকে এগিয়ে যায়—কপটা ওর দেহের মধ্যে এসেছে, আর তারই সুযোগ নিয়ে ওই ডাক্তারটা—

ওটা বদমাইস— টুনু শুধু বলে—

ঠিকই বলেছিস রে টুনু—লীলা হালকা গলায় বলে—তুই কিন্তু বেশ একটু ক্যাবলাও আছিস তা জানিস তো ?

আছি তো আছি ! তাতে তোর কী ?

লীলা একটুও রাগ না করে হাসিমুখে বলে—কিন্তু কেন এ-কথা বললাম তা বল তো দেখি ?

টুনু এতক্ষণে অবাক হয়ে লীলার দিকে তাকায়— ব্যাপারটা কী ? টুনু যা কিছু বলছে, তারই মধ্যে একটা হাসির বিষয় যেন খুঁজে পাচ্ছে লীলা ?

টুনুব উরুতে এবারে সে একটা চিমটি কেটে বলে - জানিস তো বল্ ?

যাঃ। ইয়ার্কি করিস না লীলা।

শোন টুনু, আর শুধু কয়েকটা কথা তোকে বলবো। কেন তোকে যে ক্যাবলা বল্লাম সেটাই প্রথমে বলি- মনে পড়ে আমাদের সেই ডায়মণ্ড হারবার যাওয়ার কথা ? তোরই পার্টির সঙ্গে—

হ্যাঁ, ওরা দু-জন ছিলো, তাই তোকে ডেকেছিলাম।

কতো টাকা তুই আমাকে দিয়েছিলি তা মনে আছে ?

খুবই অপ্রত্যাশিত বেশি টাকা পেয়েছিল সেটা মনে আছে, কিন্তু ঠিক কতো তা ভুলে গিয়েছে টুনু। মনে মনে সেটাই সে ভাবার চেষ্টা করছিল। টুনুকে নিরুত্তর দেখে লীলা নিজেই উত্তরটা দেয়— আমার কিন্তু মনে আছে তুই আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলি।

হ্যাঁ, তাই হয়তো হবে, কিন্তু—

চুপ করে শোন টুনু— ঠিক সেইদিনই আমি বুঝেছিলাম যে তুই একটা দারুণ ক্যাবলা, আর এ লাইনে কোনদিন তুই সুবিধে করতে পারবি না— তা তোকে দেখতে সুন্দর হোক, বা শরীর তোর ভালো হোক।

টুনু একটু অবাক হয়ে বলে— কিন্তু ক্যাবলামিটা কি দেখলি তুই শুনি ?

সেটাই বলছি, আচ্ছা তুই নিজেও তো পেয়েছিলি পঞ্চাশ, না ?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বাবার একটা ধুতি আর সার্ট কিনেছিলাম, মায়ের জন্যে শাড়ি— আর—

টুনুর কথার মাঝখানেই বলে ওঠে লীলা— ও সবই ভালো কাজ তুই

করেছিস, তবু ক্যাবলা আমি কেন বললাম জানিস ?— আমার জন্যে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে তুই যে তার সবটাই আমার হাতে দিয়েছিলি সেজন্যে তোকে শুধু ক্যাবলা নয়—আরও অনেক কিছু বলা যায়।

এতো যে দুঃখের সময় টুনুর আজ, তবু লীলার কথায় তার হাসি এসে যায় - চোখে একটু বিস্ময় মিশিয়ে সে বলে - কেন ?

সেটাই তো বলার জন্যে এতো কথা বলা—জানিস টুনু, আমাদের লাইনে একটা নিয়ম আছে যে নিজের পার্টির কাছে পাওয়া টাকার একটা ভাগ নিজে না রেখে অন্যকে সবটা দিয়ে দেওয়া হয় না। তাই আমিও আশা করিনি যে ওই টাকার সবটাই আমাকে দিবি, কেননা আমিও তোকে কখনো দিইনি। তোকে আমি যে কয়েকটা কাজ দিয়েছি তাতে আমার ভাগের অন্তত অর্ধেক না রেখে আমি দিইনি, আর জেনে রাখ, দেবও না কোনদিন।

টুনু লীলার মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে— লীলা ওর টাকার থেকে ভাগ নেওয়ার জন্যে নয়— এই ভাবে সে-কথা ও বলতে পারছে বলে—

লীলা আবার বলে ওঠে—এবারে বুঝলি তো কেন তোকে আমি ক্যাবলা বলেছি ? এরকম বোকার মতো চললে তোকে কিন্তু দারুণ ভুগতে হবে টুনু।

বলতে বলতে লীলা যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে— আর ভুগছিসই তো ! নাহলে এই পূজোর বাজারে তোর কাজ নেই! নিজের শাড়ি হয়নি, বাবা মায়ের জন্য এখনও কিছু কিনতে পারিসনি—

টুনু লীলার মুখ থেকে চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকায়, একটা ঘাস ছিঁড়ে আঙুলের মধ্যে জড়াতে থাকে— লীলা হয়তো সত্যি কথাই বলেছে ! টুনুও জানে টাকা ভাগের নিয়ম, জেনেছে তার কাছে অন্য মেয়েরা ভাগ নিয়েছে— ওকে কেউ কেউ ঠকিয়েছেও, কিন্তু টুনু কখনও পারেনি। ইচ্ছে করলেও পেরে যে ওঠে না সে।

টুনু শোন, আমার আরও একটা হিসাবের কথা— মনে পড়ছে কি ? আজ বাসের ভাড়া দেবার সময়ে পয়সা বের করেও ব্যাগের মধ্যে তা ঢুকিয়ে তোকে দিয়ে আমার টিকিটটাও কাটিয়েছিলাম ?

হ্যাঁ— টুনু প্রায় শব্দহীন উত্তর দেয়—

তাহলে শোন কেন ও-রকম করেছিলাম আমি। প্রথমে তোর আর আমার দুজনেরই ভাড়ার জন্যে পয়সা আমি গুনে বের করেছিলাম, তখনই হঠাৎ মনে পড়ে গেল— আমি তো নিজের কাজে বের হচ্ছি না। যাচ্ছি তোরই জন্যে।

সেকথা মনে পড়তেই তোকে দিয়ে ভাড়া দিইয়েছিলাম। যে যার নিজেরটা দেখবে, যে যার নিজের জন্ত চলবে—এটাই আমার হিসাব, বুঝলি ?

টুনু কোন উত্তর দেয় না। লীলাকে সে যেন আজ আরও একটু ভালো ভাবে চিনছে— তার মনে হয়, তবু ওর রহস্তের যেন কোন কূল-কিনারা নেই।

টাকা ছাড়া আমাদের আর কিছুই দরকার নেই টুনু! মনে রাখিস— টাকাটাই সব। লাইনে যদি থাকতে হয়— এটা কোনদিনই ভুলিস না।

বলে, লীলা থামে। এপাশে-ওপাশে চোখ ঘুরিয়ে ত্তাখে। তারপর বলে— আচ্ছা বল তো টুনু তোর পেটে যেটা এসেছে ওটা কার বাচ্চা ?

টুনু এই প্রশ্নে অবাক হয়ে যায়। কতো লোক ওর শরীর স্পর্শ করেছে, তাদের মধ্যে কার বাচ্চা এটা তা কি করে বুঝবে টুনু ? তাই সে উত্তর দেয়— কি করে বলবো ভাই ?

বলিস কিরে! সবাই বলতে পারে, আর তুই পারবি না ? একটু ভালো করে ভাবলে ঠিক বুঝতে পারবি, ভেবে ত্তাখ—

কি করে বুঝবো ?

বারে! আচ্ছা ন্তাকা মেয়ে তো তুই! তিন মাস আগে তোর কাকে একটু ভালো লেগেছিল—সেটা মনে পড়লেই ঠিক বুঝতে পারবি। কাউকে হঠাৎ ভালো না লাগলে আমাদের মতো মেয়ের পেটে কি হঠাৎ কিছু বাধে রে ?

টুনু অবাক হয়ে যায় লীলার কথা শুনে— সত্যি বলেছে লীলা। কতো লোক তো টুনুর দেহ স্পর্শ করে— শরীর তবু অসাড় হয়ে থাকে। ভালো লাগে খুব কম মানুষকে—

লীলা তার শেষ কথাটা বলে— বৃষ্টি ছাড়া পাথরে কখনও ঘাস দাঁড়ায় রে টুনু ?

টুনু লীলার কথার খেই ধরে তিন মাস আগেকার সময়ে ফিরে যায়। সেখানে সময়ের অন্ধকারে এমুখ ওমুখে স্মৃতির আলো ফেলে ফেলে সে খুঁজতে থাকে। —খুঁজতেই থাকে—

শেষে এক সময় বলে ওঠে— মনে পড়েছে রে লীলা, একটা লোককে খুব ভালো লেগেছিল ; বয়সে একটু বেশি, তবু দেখতে খুব সুন্দর, আর, কী সুন্দর যে কথা বলতো !

কে সে ? চিনিস তাকে ?

তা তো জানি না রে লীলা! তবে নাহুদা বোধ হয় চেনে, ওর সঙ্গেই

যেতাম। শেষে একদিন তার মুখে শুনলাম তিনি কলকাতার বাইরে চলে গেছেন।

তার মানে— সেখানেই তোর পীরিতের শেষ?

লীলা এবারে একটু রহস্যের হাসি হাসে— যখন কাউকে হটাতে চায়, এমনি কথাই বলে ওরা— বোম্বে, দিল্লী— রোজ রোজ বিলেত যায়—

হতে পারে লীলার কথা সত্যি। না হতেও পারে। মানুষ বাইরে যায়, আবার আসে। তবে টুনু একদিন তাঁকে দেখেছে তার পরেও! সেকথাই সে বলে— সেদিন দেখলাম একটা হলদে রংয়ের গাড়ির থেকে পার্ক স্ট্রীটে একটা বারের সামনে নামছেন!

তাহলে এক কাজ কর, আগে তোর ওই নানুদাকে গিয়ে ধর—

বলতে বলতে যেন রেগে উঠেছে লীলা— কতোদিন বলেছি তোকে টুনু, যে ওইসব দালালদের হাত দিয়ে কখনও যাবি না— কিন্তু শুনবি কি আমার কথা।

টুনুর মনে পড়ে না লীলা ওকে বলেছিল কিনা। তবু সেকথায় না গিয়ে সে বলে— কেন, তাতে দোষ কি হয়েছে?

হয়নি আবার! নাহলে আজ নিজেই তুই তার ঠিকানা জানতিস, গিয়ে জামার কলারটা চেপে ধরে বলতে পারতিস— খর্চাটা এবার তুমিই দিয়ে দাও।

টুনু ভয় পেয়ে যায়। না, এ রকম কিছু করার কথা সে ভাবতেও পারে না—

খোঁজ এখন প্রথমে তোর নানুদাকে, না পেলে ওই বারের সামনে গিয়ে রোজ দাঁড়িয়ে থাক—পেয়েই যাবি একদিন না একদিন।

টুনু জানে সেটা সম্ভব নয়, রোজ দাঁড়িয়ে একটা লোককে শুধু খুঁজলে পেট তার চলবে কি করে? তবু সে বলে— কিন্তু যদি না পাই?

তাহলে অন্য কিছু করতে হবে। কিন্তু তার আগে কালই কোন লোকের সঙ্গে মাথায় একটু সিঁদুর লাগিয়ে হাসপাতালে একটা কার্ড করে নে। ওটা দেখিয়ে তোর সেই হলদে গাড়ির লোকটাকে হোক, নাহলে অন্য যে-সব লোকের কাছে গিয়েছিলি, তাদের কারও কাছে গিয়ে কার্ডটা দেখিয়ে বলবি—এই দ্যাখো, তোমার সঙ্গে গিয়ে কি হয়েছে আমার। দেখবি, সুড় সুড় করে টাকা বের হয়ে আসবে—

বলতে বলতে হঠাৎ যেন আরেকটা কথা মনে পড়ে গেছে লীলার— আর, এভাবে তো বেশ কিছু টাকা কামিয়েও ফেলতে পারিস তুই।

টুনুর মুখ দিয়ে তার অজান্তেই কিছু শব্দ বেরিয়ে আসে—টাকা কামিয়ে?

লীলা হেসে টুনুর উরুতে একটা চাপড় দিয়ে বলে— তোর তো সত্যি এবারে

একটা চান্সই লেগে গেল রে টুনু। অমনিভাবে একের পর এক পার্টির কাছে খরচ আদায় করবি, খর্চা তো শুধু একবারই লাগবে।

কী সব বাজে যা তা বকছিস ?— টুনু একটু রেগে উঠে বলে।

বাজে বকছি ? বেশ, তুই তাহলে কাজের কাজই করে ছাথ।

বলে, লীলা উঠে দাঁড়ায়— তুই এখন কোথায় যাবি ?

দেখি কোথায় যাই— নাহুদাকে কোথায় যে পাবো।

বাসের স্টপে গিয়ে দাঁড়াবি না ?

ও-সব আজ আর পারবো না রে লীলা। মনের যা অবস্থা। যদিও কিছু টাকার বড্ডো দরকার ছিলো—

বললাম, ডাক্তার শর্মার কথায় রাজি হয়ে যা। সব দিক থেকে তাহলে কতো সুবিধে হতো।

ডাক্তার শর্মার নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই টুনুর চোখে মুখে আবার উত্তেজনার ভাব ফুটে ওঠে, সেটা লক্ষ্য করে লীলা বলে— কি রে টুনু। তুই যে একেবারে কাঁদবো কাঁদবো করছিস। কি জানি বাব্বা— এতো পছন্দ ?

লীলার বলার ভঙ্গিতে এতো দুঃখের মধ্যেও টুনুর হাসি পায়।

লীলা বলে— চল, তোকে কোথাও একটু চা খাইয়ে ছেড়ে দিই— ছটা বাজতে তো এখনও অনেক দেরি। ঠিক ছটার সময় মেট্রোর সামনে আমার একটা নতুন পার্টির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা।

আমার কিন্তু পয়সা নেই—

আমি যখন ডাকছি তোকে, পয়সাটা নিশ্চয় আমি দেবো।

টুনু লীলার সঙ্গে সঙ্গে চলে।

চৌরঙ্গীর কোনো দামী দোকানে নয়— একটু ভিতরের রাস্তায় ঢুকে মাঝামাঝি একটা চায়ের দোকানে টুনু লীলার সঙ্গে ঢোকে। কোণের দিকে একটা টেবিল পছন্দ করে লীলা বসে। চা আর কেক্-এর অর্ডার দেয়।

কেকের কথাটা শোনামাত্র টুনুর মনে সেই সন্দেহটা চলে আসে আবার— এর পরে আবার ডাক্তার শর্মার কথা পাড়বে না কি লীলা ? যাকে টুনু সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেছে আজ— থাক টাকা, হোক ডাক্তার। হাসি হাসি মুখে বলে কিনা— চা খাবে, না কফি ? টুনু—কমলা খুব ভালো মেয়ে। কিন্তু তার পরে ? শয়তান ! লোকটা আসল শয়তান !

তোকে একটা ঠিকানা দিয়ে দেবো টুনু, বাড়ির ফেরার সময় দেখিস, হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারে— লীলা বলে ওঠে, এখানে তো কাগজ কলম নেই, দাঁড়া লিখে নিয়ে আসি— বলে লীলা উঠে কাউন্টারের কাছে চলে যায়। টুনু শুনতে পায় লীলা দোকানদারকে কাগজ পেন্সিল চাইল। সে লীলাকে একটা কাগজ ছিঁড়ে দিল, তখনই সামনে চা আর কেক এসে গিয়েছে।

লীলা টুনুর দিকে পিছন করে কী-যেন লিখছে, টুনু তার কাপটা প্লেট উল্টে ঢাকা দিয়ে রাখে।

একটু পরে হাতে একটা ঠোঙার মুখ ভাঁজ করতে করতে ফিরে এসে লীলা টুনুর ব্যাগের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে— দেখি, তোর ব্যাগটা—

ব্যাগ কী হবে ?

লীলা চেয়ার টেনে বসে। কাপের ওপর থেকে প্লেট নামিয়ে বলে— ঠিকানার কাগজ ভরা এই ঠোঙাটা ওর মধ্যে রেখে দেবো—

টুনু চোখে-মুখে বিস্ময়—ঠিকানার কাগজ এই ঠোঙাতে ?

ঠোঙাটার মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরও কয়েকটা ভাঁজ দিয়ে লীলা বলে— হ্যাঁ, কিন্তু তোকে একটা কথা দিতে হবে, বল, বাড়ী ফেরার সময় ছাড়া এটা খুলবি না তুই ?

তার মানে ?

লীলা ওই ঠোঙাটার মাথায় দুটো আলপিন গেঁথে দেয়— মানে কিছু নেই, তবু যদি কথা দিস যে খুলবি না, তাহলেই এটা তোর ব্যাগের মধ্যে রাখবো, নাহলে বল—

টুনু অবাক হয়ে বলে— ঠিকানা লেখা কাগজ, তায় আবার—

হ্যাঁ, তার সঙ্গে তোকে লেখা একটা চিঠিও আছে—

চিঠি ? কেন মুখেই তো যা বলার বলতে পারিস—

লীলার চোখ মুখ এবারে শক্ত হয়ে ওঠে। নিজের কাপটার ওপর থেকে প্লেট নামিয়ে একটা চুমুক দিয়ে বলে— আজে বাজে কথা এখন রাখ টুনু, বল, আমার কথায় তুই রাজি কি না ?

যদিও এ সবই অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার, তবু টুনু শেষে বলেও ওঠে— বেশ, রাজি, হলো তো ?

না, দিব্বি করে বল তুই—

দিব্বি আবার কিসের ?

কেন, তোদের লক্ষ্মী ঠাকুরের।

হেঁয়ালী শুধুই হেঁয়ালী। তবু টুনু ব্যাগটা লীলার হাতে তুলে দিয়ে বলে—বেশ, দিব্বি করলাম খুলবো না—

লীলা টুনুর ব্যাগের মধ্যে সেই ঠোঙাটাকে ভরে বলে ওঠে, কেক খাচ্ছিস না যে?

কেক আর নাই বা খেলাম।

কেন, আমার পয়সা বাঁচাচ্ছিস?

টুনু অগত্যা একটা কেক তুলে নেয়।

আরও একটা কেক টুনুর প্লেটে রেখে দিয়ে লীলা চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

কার না কার ঠিকানা। টুনু ভাবে— আবার একটা চিঠি। টুনু তো সামনেই রয়েছে, তবে চিঠি কিসের?

লীলা কিন্তু ডাক্তার শর্মার কথা এখনও তোলেনি। টুনু ভাবতে থাকে নানুদার কথা। তাকে যে কোথায় কখন পাওয়া যাবে তার কোন ঠিক নেই। তবু চা খাওয়া শেষ হলে টুনু আজ তাকে খুঁজতে বের হবে।

॥ ১০ ॥

সুহাস হাঁটতে হাঁটতে মিঃ দত্তর অফিসের দিকে চলেছে। কতোটাই বা আর দূর। একই তো অফিস-পাড়া, তবু এটুকুর জন্য দত্ত গাড়ি পাঠাতে চেয়েছিলেন। সুহাসকে খাতির দেখাতে? নাকি কোনো ফাঁদের মতো ব্যাপার? কে জানে তবে এবার থেকে সে খুবই সতর্ক থাকবে।

কিন্তু একটা ভুল করেই ফেলেছে সুহাস— ঝোঁকের মাথায় দত্তর অফিসে গিয়ে দেখা করার কথা না বলাই উচিত ছিলো—

অফিস ভাঙা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে ভাবে— আচ্ছা, দত্তর অফিসে লোকজন কি এখনও আছে? না ছুটির পরে তিনি একা বসে আছেন?

ভাবতে ভাবতে সুহাস একটু অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিল, হঠাৎ একজন লোকের সঙ্গে গায়ের ধাক্কা লাগায় সে অভ্যাসের সুরে বলে উঠল— সরি।

লোকটাও থেমে দাঁড়িয়েছে— বাংলা জানেন না মশাই! মানুষের গায়ের ওপর এসে পড়ছেন, আবার ইংরেজি ঝাড়ছেন!

সুহাস একটি পাৎলা-গড়ন যুবকের কটমট চোখের দিকে তাকিয়ে এবারে বাংলাতেই বলে— খুবই দুঃখিত আমি—

আচ্ছা যান। এবার থেকে দেখে চলবেন— ঝাঁঝালো গলায় সে এবারেও বলে।

সুহাস এগিয়ে যায়। কোনো অফিসের কম-মাইনের কেরানীই হয়তো হবে— ওর মনে হয়— হয়তো অফিসে ওপর-অলার তাড়া খেয়ে চুপ করে থেকে মনের মধ্যে যে বিক্ষোভ জমেছিল সুহাসের ওপরে তা ঢেলে দিয়ে গেল, সুহাসকে না পেলে দিতো আর কারো ওপর— এই ফুটপাথে অথবা ট্রামে-বাসে, নাহলে বাড়িতে ফিরে সেখানকার সবচেয়ে নিরীহ মানুষটাকে—

একটা জায়গায় না পারলে মানুষ অন্য জায়গায় তার ঝালটা মিটিয়ে নেয়— এটা সুহাস দেখেছে। সে আরও দেখেছে যে মানুষ যখন আনন্দিত হয়, যখন সুখের মধ্যে থাকে সে-সময় কারও সঙ্গে কলহ সে করে না।

ওই লোকটার জন্যে এখন একটু অনুকম্পাই হয় সুহাসের। অথচ, একটু আগে সে নিজেও রেগে উঠে তাকে একটা উচিত জবাব দিতে যাচ্ছিলো। শেষে সামলে ভালো করেছে সুহাস— একটা ঝগড়া কারও সঙ্গে হলে মনের মধ্যে তার জেরটা অনেকক্ষণ থাকে। আর সুহাসের এখানে শান্ত থাকা দরকার, মাথা খুব ঠাণ্ডা রেখে দত্তর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সুহাস এখন ভিড়ের মধ্যে মানুষের দিকে তাকিয়ে খুব সতর্ক ভাবে চলছে। মুখ তুলে মাঝে মাঝে বাড়ির নাম আর নম্বর দেখছে— এখনও আটটা সংখ্যা বাকি— এখানকার বড়ো বড়ো বাড়িগুলোর নম্বর অনেক তফাতে তফাতে পড়ে— সুহাসদের পাড়ার মতো গা-ঘেঁষাঘেঁষি নয়।

ঠিক তখনই আবার কিছু একটাতে সজোরে হোঁচট খেল সুহাস। নিচু হয়ে দেখল ফুটপাতের ওপরে একটা বড়ো পাথর পড়ে, তার পাশে রাস্তার কোল ঘেঁষে ভাঙা পিচের টুকরোর গাদা। জুতোর মাথাটা ছিঁড়ে গেছে থেবড়েও গিয়েছে, দারুন লেগেছে পায়ের আঙুলগুলোয়— জুতোটা নতুন, শক্তও বেশ, নাহলে কী হতো তা কে জানে।

কী দাদা, কী হলো? —একটি গলা শোনা যায়— কিক্ ঝাড়লেন নাকি পাথরটাকে? মারুন তো আর একটা দেখি! খুব জোরসে, মাঠ পার করে—

এতে যন্ত্রণার মধ্যেও চোখ তুলে সুহাস ছাখে যে দুজন আফিস-ফেরৎ ছেলে ওর সামনে দাঁড়িয়ে। একজনের মুখে রসিকতার খুশি-ভরা হাসি। অন্য জন সুহাসের দিকে একটু করুণা মাখানো গলায় বলে এবারে—লাগলো নাকি দাদা?

সুহাস কোনো উত্তর না দিয়ে আবার হাঁটতে সুরু করে। মানুষের স্রোত, ভিড়ের ঠেলাঠেলি, ফুটপাতের হকার— সবাইকার মধ্যে ফাঁক খুজে খুজে সে চলেছে— এই শহরটা অনেক বদলে গেছে কয়েকটা বছরের মধ্যে—বদলেছে তার মানুষ। দেখতে দেখতে সবই যেন কী রকম হয়ে গেল।

তবু সুহাস এই কলকাতাকে ভালবাসে। ম্যাড্রাসে বদলি হবার কথাটা শোনামাত্রই ও. যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। ওখানে কি সত্যিই যেতে হবে? চাকরি ছেড়ে দেওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। আর, সুহাসের যে ডিগ্রি আর সন-বছরি যোগ্যতা তাতে আজকের বাজারে নতুন একটা চাকরিতে এখনকার অর্ধেক মাইনে সে পাবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এখনই সুহাস অতো দূরই বা ভাবছে কেন? আগে তো দত্তর সঙ্গে দেখাটা হোক, সব বুঝে তারপর সে ভাববে—

মিঃ দত্তর অফিসের সামনে পৌছে একটা অস্বস্তি থেকে বেঁচে গেল সুহাস— দত্ত লিফট্-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সুহাসকে দেখে বললেন— আপনারই জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের অফিসটা ছুটি হয়ে গেছে, চলুন এখন অন্য কোথাও যাওয়া যাক—

অল্প একটু দূরে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতে ড্রাইভার সেলাম করে দরজা খুলে দাঁড়ায়। পার্কিং ফিয়ের পয়সা মিটিয়ে সে গাড়িটাকে দক্ষিণমুখী গাড়ির স্রোতের মধ্যে মিশিয়ে দেয়। ব্রাবোর্ণ রোড এবারে শেষ। ডালহৌসির পূর্ব দিকে মোড়। লাল আলো। মানুষের স্রোত। গাড়িটা আবার চলতে শুরু করে।

কতো গাড়ি যে কলকাতায় হয়েছে আজকাল। সুহাস প্রতিদিনের মতো গাড়ির স্রোতের দিকে তাকিয়ে আজও ভাবে—যতো মানুষ, ঠিক ততোগুলোই যেন গাড়ি। সত্যি, অফিসের সময়ে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে এই শহরে আজ কতো ওপরের তলার মানুষ। তাঁদেরই একজন তো মিঃ দত্ত— যিনি সুহাসের পাশে বসে রয়েছেন। সুহাসকেও কেউ কেউ হয়তো ভাবে, যখন সে অফিসের পিক-আপ্ ভ্যানে চড়ে অফিসে যায়, বাড়ি ফেরে। কুন্তি ওকে তাই ভেবেছে। ভেবেছে অনুপও।

ফুটপাতের ওপর দিয়ে হাঁটা মানুষের স্রোতের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে সুহাসের মনে হলো— কিন্তু সে যে কখন ওদের মধ্যে নেমে হাঁটতে সুরু করবে তার কোনো ঠিক নেই। কে আবার ওখান থেকে গাড়ির মধ্যে উঠে আসবে তাও কেউ বলতে পারে না— শহর এ-সবের কোনো হিসাব রাখে না— তার কাছে মানুষের কোনো আলাদা হিসাব নেই। নিজের মর্জিতে সে গাড়ি ছোটায় — খুশি মতো কখন কাউকে তুলে নেয়, কখনও বা নামিয়ে দেয়—

সুহাসের বিষণ্ণ চিন্তার মধ্যে দত্তর কথার শব্দ এসে তাকে একটু চমকে দেয়— হ্যাভ এ স্মোক্ মিঃ ভৌমিক।

সুহাস মুখ ঘুরিয়ে ছাখে— মিঃ দত্ত ওর দিকে তাঁর সিগারেটের টিনটা খুলে বাড়িয়ে ধরেছেন।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ দত্ত, আই প্রেফার মাই ওন ব্রাণ্ড।

দত্ত স্মিতহাসি হাসেন— মাঝে মাঝে ব্রাণ্ড বদল করলে ভালোই লাগে মিঃ ভৌমিক, দেখুন না একটা ট্রাই করে—

কথা আর না বাড়িয়ে সুহাস একটা সিগারেট তুলে নেয়। দত্তর গ্যাস-লাইটারে জ্বালিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে— আমরা কোথায় চলেছি মিঃ দত্ত ?

আমার একটা লোনলী স্পট্ আছে, অল্প একটু দূরে। চলুন না, চোখেই দেখতে পাবেন।

সুহাসের চোখের সামনে লাটভবনের গাছের ছায়ায় ছায়ায় রাস্তার আলোগুলো। কার্জন পার্কের ঝোপে-ঝাড়ে ছায়া আর আলো ? সন্ধ্যা নামছে। চৌরঙ্গীর নিওন আলোগুলো সব অন্ধকার শুষে নিচ্ছে— মানুষের পোষাকের রঙ বদলে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। সিনেমা-হলগুলোর আলোয় জায়গাটা যেন দিনের থেকে উজ্জ্বল— দত্তর পাশে বসে সে এগিয়ে চলেছে তাঁর সেই কোন্ লোনলী স্পটের দিকে। ঠাসাঠাসি গাড়ির ভিড়ে এই গাড়িটা বার বার থামছে। শেষে এক জায়গায় সেটা থামতে দত্ত বলেন— আমরা এসে গেছি মিঃ ভৌমিক।

গাড়ি থেকে নেমে দত্ত ড্রাইভারকে বলেন— অব্ ঘণ্টাভর গাড়িকো জরুরৎ নহী হায়।

তারপর সুহাসের দিকে ফিরে বলেন— আসুন মিঃ ভৌমিক—

একটা জাহাজের মতো বিশাল হোটেলের দরজা দিয়ে সুহাস দত্তর সঙ্গে লাউঞ্জ পার হয়ে লিফটের দিকে হাঁটে। এই হোটেলটায় সে কখনও আসেনি।

তাই চারপাশে একটু দেখে নিয়ে সে দত্তর সঙ্গে লিফটের ভিতরে ঢোকে। লিফট্-ম্যানের সেলাম। ওপরে উঠছে ওরা দুজনে। উঠতে উঠতে সুহাস ভাবে, মিঃ দত্ত কি এখানেই থাকেন? হতে পারে। সুহাস শুনেছে যে অনেক টাকাঅলা-লোকই বাড়ি ভাড়া করে বাস করার চেয়ে হোটেলে থাকাটা বেশি পছন্দ করেন, কিন্তু সে যাই হোক, ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলাতে এখানটা অনেক সুবিধের হবে—অন্য যে কোনো রেস্তোঁরা বা সেই জাতীয় জায়গার থেকে। — কেননা সব জায়গাতেই সুহাসের দু-একজন চেনা মুখ বেরিয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

সুহাসের চোখের সামনে সুন্দর একটা ঘর— এক পাশে এক জোড়া চমৎকার খাট দামী বেড্-কভারে ঢাকা। অন্য দিকে একটা রাইটিং টেবিলের সামনে দুটো গদি-আঁটা হাতা-অলা চেয়ার। দরজার বাঁ-পাশে একটা ড্রেসিং টেবিল। অন্যদিকের দেওয়াল ঘেঁষে নতুন সোফা-সেট, সেন্টার টেবিল, পেগ টেবিল। খুব বড়ো ঘর নয়, তবু সুন্দরভাবে সব কিছু সাজানো।

দত্ত ঘরে ঢুকেই হাতের এ্যাটাচিটা বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে বলেন— অহ্, আই এ্যাম টায়ার্ড।

তারপর টেবিলের কাছে এগিয়ে ফোন তুলে বলেন—রুম সার্ভিস। একটু পরে আবার বলেন— ওয়ান হানড্রেড থারটি ফোর। কফি, চিপস্, নাটস্ এ্যাণ্ড ফিশ্ রোল—

ফোন নামিয়ে রেখে সুহাসের দিকে ফিরে বলেন— বসুন মিঃ ভৌমিক, একটু কফি বললাম, নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে না আপনার—

তারপর খাটের কাছে এগিয়ে দেয়ালের এক জায়গায় তিনি একটু ঠেলা দেন —সুহাস তখনই দেখল ওখানে একটা বড়ো দেয়াল আলমারি। দেয়ালের রংয়ে রং মেলানো বলে এতক্ষণ চোখে পড়েনি তার—

ভিতর থেকে সার্ট প্যান্ট আর একটা তোয়ালে বের করে দত্ত বলেন— আপনি একটু বসুন মিঃ ভৌমিক, আমি ছোট্ট একটু ওয়াশ নিয়েই চলে আসছি।

সুহাস এখানে বসেই জানে ওখানে কি কি আছে—এর আগে দুবার সে এ-রকম বড়ো হোটেলের ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। সে জানে যে ওখানে গা ডুবিয়ে স্নান করার জন্য একটা বিশাল বাথ্-টব আছে। মাথার ওপরে শাওয়ার, ঠাণ্ডা-

জল— গরম জলের কল, দেয়ালে প্রসাধনের জিনিষ রাখার জন্ম ছোট একটা আলমারি যার নাম মেডিসিন-চেষ্ট। আরও আছে একটা বড়ো আয়না—কী নেই ওখানে যা মানুষের স্নানের পরে দরকার।

সুহাস প্রথমবার অবাক হয়েছিল বাথরুমের একপাশে একটা কার্পেট দেখে। তাও আছে নিশ্চয় ওই বাথরুমটায়।

ভাড়া কতো হবে এই ঘরটার? ঠিক জানে না সে, তবু মনে হয়, দিনে অন্তত একশো টাকার কম নয়। কিন্তু এতো ভাড়া দিয়ে দত্ত কি এখানে একা থাকেন? ঘরে দুটো বিছানার আর একজন মানুষের তো কোনই চিহ্ন নেই— আলমারিটা খোলার সময় সুহাস দেখেছে যে ওখানে শুধুই পুরুষের পোষাক টাঙানো—

দত্ত কি বিয়ে করেন নি? বয়স তো প্রায় পঞ্চাশের মতো। নাকি বোম্বেতে তাঁর বাড়ির সবাই এখনও রয়েছে?

এইসব কথা সুহাস ভাবছিল? হঠাৎ মনে পড়ল, ফলে সে লজ্জাও পেল— দত্তর ব্যাপারে এতো মাথাই বা সে ঘামাচ্ছে কেন? সে এসেছে শুধু তার অন্য একটা দরকারে—ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু জানার জন্যে নয়। তবু এসব ভাবনা তার এসেই যায়—বড্ডো বাঙালী আর পুরণোপন্থী মানুষ সুহাস— অন্যের সম্বন্ধে অনেক দূর না জেনে যেন স্বস্তি তার থাকে না।

কিছুক্ষণ পরে সুহাসের সব প্রশ্নের উত্তর সে পেয়ে গেল দত্তরই মুখে যখন কফির পেয়ালা খালি হয়ে যাওয়ার পরে হোটেলের বেয়ারা তা সরিয়ে নিয়ে গেছে, দত্ত বলে উঠলেন— জানেন মিঃ ভৌমিক, আমাদের কোম্পানী এই ঘরটা চালায়। মাঝে মাঝে আমি এখানে রিল্যাকস্ করতে আসি, বাইরের থেকে কোনো গেষ্ট এলে তাকে এখানেই তোলা হয়, আর হঠাৎ কারও জায়গার দরকার হলে তাকে এটা দেওয়া হয়— বলুন তো, রোজ রোজ নতুন জায়গা ঠিক করার চেয়ে অনেক সুবিধে নয় কি ফিকসড্ একটা রুম রেখে দেওয়া?

সুহাস এ প্রশ্নের উত্তর জানে না। বারো-শো টাকা মাইনের একটা মানুষ কি করে বুঝবে মাসে অন্তত তিন হাজার টাকা ভাড়া একটা কোম্পানী কি করে চালিয়ে যেতে পারে? আর, শুধু ভাড়াই নয়— সব জিনিষেরই দাম এখানে বেশি, একটু আগে কফির সঙ্গে যে দু-একটা জিনিষ সে মুখে তুলেছে, তার দাম এখানে বাজার থেকে যে অন্তত চারগুণ তা সুহাস জানে।

কোনো উত্তর না দিয়ে সে শুধু একটু হাসির ভাব দেখায়।

আপনি একটু মুখ হাত ধুয়ে নেবেন না মিঃ ভৌমিক? যান না, বাথরুমে তোয়ালে সাবান, সবই রয়েছে।

এ কথাটা সুহাসের ভালো লাগে। মুখ ধোয়া না হোক, মাথায় একটু জল দেওয়া ওর খুবই দরকার। সমস্ত দিনটা আজ যা গিয়েছে। মাথা একটু ঠাণ্ডা না হলে দত্তর সঙ্গে ঠিকভাবে কথা সে বলতে পারবে না। তবু সে একটু ইতস্ততও করছিল। দত্ত আবার বলেন— যান না মিঃ ভৌমিক, ইউ ডোণ্ট নীড টু ফীল শাই, কর'দেয়ার ইজ নো লেডি ইন দিস রুম—

দত্তর কথার ভঙ্গিতে একটু হেসে সুহাস উঠে দাঁড়ায়। বাথরুমে গিয়ে ঢোকার পরে সার্টের হাতা উল্টে হাত ধোয়। মুখে জল দেয়। তারপর সার্টের কলারের ওপরটাতে ভালো করে তোয়ালে জড়িয়ে মাথায় জল ঢালে। শেষে ভালোভাবে সমস্ত মুছে চুল আঁচড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ইউ আর লুকিং সো ফ্রেশ্ এণ্ড হ্যাণ্ডসাম মিঃ ভৌমিক— দত্ত হাসিমুখে বলে ওঠেন—

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ দত্ত, ডু আই রিয়্যালি— সুহাস উত্তর দেয়।

ইয়েস ইউ ডু। আই এ্যাম কোয়াইট্ সুয়র এ্যাবাউট ইট্—

সুহাস এ প্রসঙ্গ আর বাড়তে না দিয়ে বসে পড়ে।

দত্ত কথা সুরু করেছেন তাঁর অফিসের বিষয়ে—বোম্বেতে কী রকম কাজ চলছে, কলকাতায় কি ভাবে কাজ বাড়াবার পরিকল্পনা, পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফুটের অফিসটা ভর্তি হয়ে গেলে তার পাশেই আর একটা অংশ উনি নেবেন— কলকাতায় ভাড়া বেশ কম, বাড়ি ভাড়া দিয়ে টাকা কামাতে হলে বোম্বে হচ্ছে তার পক্ষে আইডিয়াল মিঃ ভৌমিক— এমনি সব কথা বলতেই থাকেন দত্ত। সুহাস ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—সে আসল কথাটা শুনতে চায়। দত্ত তো বলবেনই, তবে এতো দেরিংকেন করছেন? শেষে একসময় সে নিজেই কথাটা তোলে— আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন কেন সেটা তো বললেন না মিঃ দত্ত?

হ্যাঁ, সেটাও বলছি, কিন্তু তার আগে আরেকটু কফি বলবো মিঃ ভৌমিক?

না-না, কফি আবার কেন? এইমাত্র তো খেলাম।

তাহলে একটু চা?

কিছুই দরকার নেই মিঃ দত্ত, আমি এ-সময় চা কফি কিছু খাই না। শুধু আপনি আনালেন বলেই না তখন একটু খেলাম—

ঠিক আছে, একটু পরেই না হয় খাবেন। শুনুন মিঃ ভৌমিক, যে জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম—

কথা অসমাপ্ত রেখে দত্ত সোফায় একটু ঘুরে গদির বালিশ দুটোকে তাঁর পিঠের নিচে ভালোভাবে বসিয়ে নেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে, সুহাসকেও দিয়ে বলে ওঠেন— শুনলেনই তো আমাদের সব স্কীমের কথা, তাহলে ভেবে দেখুন আপনাদের ওই অর্ডারটা আমাদের পক্ষে কতো জরুরী। বলতে গেলে কলকাতায় এটাই তো প্রথম স্টার্ট আমাদের—

সবই বুঝলাম মিঃ দত্ত, কিন্তু আমি আর কী করতে পারি বলুন? আমি সামান্য একজন পারচেজ অফিসার, কতোটুকু বা ক্ষমতা আমার।

বলেন কী! আপনার? আপনার অনেক ক্ষমতা। আপনি ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারেন।

পারি? সুহাস দত্তর মুখের ওপরে দৃষ্টি স্থির রেখে বলে।

নিশ্চয়ই পারেন। আর দেখুন, তাতে তো আপনারও সব দিকেই সুবিধা।

কী রকম?

ধরুন আমাদের এই অর্ডারটা এসে গেল, তার থেকে প্রফিট তো কিছু করবোই আমরা, তার একটা অংশ আপনাকে না দিয়ে—না মিঃ ভৌমিক, অতোটা খারাপ লোক আপনি ভাববেন না প্লীজ্। আর তাছাড়া আপনাকে কভার করেই না আমাদের রেটটা দেওয়া আছে।

তার মানে?— সুহাস অবাক হয়ে দত্তর দিকে তাকায়।

মানে, টু পার্সেণ্ট ফর দ্য পারচেজ-অফিসার।

টু পার্সেণ্ট! সুহাস চমকে উঠে বলে— সে তো অনেক টাকা।

খুব বেশি নয়। আপাতত চুয়াল্লিশ হাজার— রাউণ্ড ফিগারে ওটা পঁয়তাল্লিশই হবে তা এখনই বলে রাখছি।

সুহাসের চোখের সামনে ঘরটা যেন দুলছে—ওর মাইনের থেকে ইনকাম-ট্যাক্স কেটে যা থাকে, তার হিসাব ধরলে এটা প্রায় চার বছরের রোজগার, কলকাতায় বাড়ি করার মতো একটা ভালো প্লটের দাম— জমি থাকলে একতলা একটা বাড়ি করার মতো টাকা।

এ কী বলছেন আপনি মিঃ দত্ত? সুহাস বলে।

ঠিকই বলছি, অর্ডারটা আসুক, তখন দেখবেন—

সুহাস আর কোনো কথা বলে না। সে শুনতে থাকে— দেখুন মিঃ ভৌমিক,

আর ওখানেই শেষ নয়, কেননা এর পরেও আপনাদের সঙ্গে আমাদের কাজ চলতে থাকবে, রিপীট অর্ডার আরও আসছে তা আমার জানা— কাজ তো আমাদের বাড়তেই থাকবে। আর আপনার সঙ্গে আমাদের টার্মসও দিন দিন বেড়ে উঠবে— দত্তকে আপনি কী আর চেনেন মিঃ ভৌমিক। সে যদি খুব বাজে লোক হতো তাহলে এ পর্যন্ত উঠে আসতে কিছুতেই পারতো না—এটুকু তো বিশ্বাস আপনি করবেন ?

কিন্তু সেটা তো ঘুষ ! সুহাস বলে।

দত্তর মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে—আমি কখনও ঘুষ দিই না মিঃ ভৌমিক, শুধু মাঝে মাঝে এই হোটেলের থার্ড সিঁড়ি দিয়ে কারো কারো ওঠার রাস্তা খুলে রাখি। কেননা ওটাই হলো আসল সিঁড়ি—

তার মানে ?— সুহাস একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—

দত্তর মুখ হাসিতে ভরে উঠেছে এখন— শুনুন তাহলে ওই সিঁড়ির ব্যাপারটাই— আচ্ছা, লিফটে ওঠার সময় দেখেছেন তো, তার সামনে সুন্দর একটা কার্পেট মোড়া সিঁড়ি ?

দেখেছি।

লিফট্ খারাপ হলে, কিংবা ভিড়ে জ্যাম হলে ওটা দিয়ে সবাই ওঠে— এখানকার বোর্ডার, অফিসার— এমনি সব মানুষ। ওটাই হলো প্রথম সিঁড়ি, বুঝলেন তো ?

ঠিক আছে, বলে যান।

আরও একটা সিঁড়ি আছে আমাদের ঘরগুলোর একটু পিছনে যেখান দিয়ে বয় বেয়ারা কুক ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক ধোবী এরা সবাই ওঠে—ওটা হচ্ছে সেকেণ্ড সিঁড়ি।

এ তো হওয়াই সম্ভব— সুহাস বলে।

কিন্তু ওটাই শেষ সিঁড়ি নয় মিঃ ভৌমিক! করিডরের শেষ প্রান্তে গিয়ে একটা গলি দিয়ে একটু এগিয়ে গেলে দেখবেন, খুব অন্ধকারমতো সরু আরও একটা সিঁড়ি আছে যা এমন ভাবে তৈরী যে বাইরে থেকে কারও চোখে পড়ার উপায় নেই, এখানে কয়েকদিন্ থেকেও সেটা আপনার চোখে পড়বে না— সেটাই হলো থার্ড সিঁড়ি— আসল এবং সেরা সিঁড়ি এই হোটেল চলার জন্যে।

দত্ত এবারে সুহাসের চোখে চোখ রেখে বলেন— বুঝলেন মিঃ ভৌমিক ? সুহাস অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে— কিছু বোঝা তার পক্ষে সম্ভবই নয়।

এখনও বুঝলেন না মিঃ ভৌমিক? শুনুন তা হলে, আরেকটু পরিষ্কার করে বলি— ওই সিঁড়িটা হলো শুধু কল-গার্লদের জন্যে যারা না এলে এই হোটেল তিন দিনও চলবে না। তাই বলছিলাম, ওটাই হলো আসল সিঁড়ি।

সুহাস শুনতে থাকে—

নাহলে এতো হোটেল কি করে চলবে এই শহরে বলতে পারেন? আর যদিই বা চলে কোনো কোনো মরশুমে টুরিস্টদের জন্যে, তবু এ কথাও তো মানবেন মিঃ ভৌমিক যে, সব হোটেলে যদি দুটো সিঁড়ি থাকে তাহলে থার্ড-অলাটা একটু বেশি ভালো চলবে? আর সবগুলোর যদি তিনটে করে থাকে, তখন ফোর্থ একটা খুলে দিলে সেটাই বাজিমাৎ করবে।

অনেক কথা একসঙ্গে বলে, সুহাসকে প্রায় বুদ্ধিহীন করে, মিঃ দত্ত দম নেবার জন্য একটু থামেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে, সুহাসের দিকে টিনটা বাড়িয়ে বলেন— আপনাদের সঙ্গে আমি বিজনেস করতে চাই মিঃ ভৌমিক, তার জন্যে সমস্ত ফরম্যালিটি আমি পুরণ করেছি— সেটাই আমার ওই কার্পেট-মোড়া প্রথম সিঁড়ি। সেকেণ্ড সিঁড়িও আমার একটা আছে— সেখানে চমৎকার চলাফেরা হয়েছে, শুধু বাকি এই টু-পার্সেন্টের ব্যাপার— থার্ড সিঁড়ি। মিঃ ভৌমিক, এটা আমি সব সময় খোলা রাখতে চাই— কেননা আমি জানি এটাই সবচেয়ে দরকারি।

জানেন মিঃ ভৌমিক, গাছের ফল পেড়ে পেড়ে খাবো আমি, আর তাতে একটু জল দেবো না ও থিওরীতে আমি বিশ্বাস করি না। বরং আমি চাই যে তার ডালেও জল দেবো, পাতা ধুয়ে দেবো।

সুহাস নিজের অজান্তেই ঘুষের কথাটা ভুলে এখন দত্তর উপমাগুলো শুনছিল— উনি যে সুন্দরভাবে কথা বলেন তা মনে মনে ভাবছিল, তখনই দত্ত সুহাসকে একটু চমকে দিয়ে বলেন— বলুন আপনি রাজি? আপনাকে তো এখন কিছু করতে হবে না বলতে গেলে, শুধু ওই ফোনটা আপনি না করলেই—

ফোন! কেন? ফোনে কী হলো আবার?

এখন শুধু ওইটাই মিঃ ভৌমিক, ওটুকুই চাইছি আপনার কাছে, আপনি একটু ভেবে দেখুন—

ঠিক এই মুহূর্তে সুহাসের মনে পড়ে যায় যে দত্তর কথার স্রোতের মধ্যে হারিয়ে হাঁ কিংবা না বলতে সে এখানে আসেনি। সে এসেছে শুধু সব জেনে আর বুঝে নিতে। সেই কথাটা কিছুতেই সে ভুলে যেন না যায়—তাই

ফোনের প্রসঙ্গ ধরে সে চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে— বলেন কি মিঃ দত্ত শুধু ফোনের ব্যাপারেই আপনার কাজ মিটে যাবে ?

হ্যাঁ। ওটাতেই আমার সেকেণ্ড সিঁড়িটা ভেঙে যেতে বসেছে।

সেকেণ্ড সিঁড়ি ?— আরও বিস্ময়ে দুচোখে ভরে সে বলে।

ইয়েস মিঃ ভৌমিক, আর ওইটুকু ব্যাপারেই আপনি এখন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন।

সুহাসের মনে পড়ছে— বাসু-সাহেবও এই ফোনের কথাটা শোনামাত্রই যেন রেগে উঠেছিলেন— এ দুটোর মধ্যে কী যোগ আছে কিছু ?

খুবই সম্ভব। কিন্তু কী সেটা ?

বলুন আপনি কী বলছেন ?

আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন মিঃ দত্ত, কিন্তু তার আগে আপনার সেকেণ্ড সিঁড়িটা একটু বুঝিয়ে দেবেন কী ?

নো, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, এখন নয়। বলবো যদি আপনি আমার বন্ধুত্বের হাতটা ধরতে রাজি হন। আর যদি নাই বা ধরেন তাহলে সেকেণ্ড সিঁড়িটা মেরামতের একটা রাস্তা যে আমি খুঁজে বের করবোই তা জেনে রাখুন, এখন শুধু আপনাকে বলে রাখছি যে আই সেলডম হ্যাড হ্যাড এ টোট্যাল ফেলইওর ইন মাই কেরীয়ার মিঃ ভৌমিক।

তাহলে মিছিমিছি এতোগুলো টাকা আমার জন্যেই বা খরচ করবেন কেন ?

কারণ অনেক আছে মিঃ ভৌমিক, সে-সব কথা এখন থাক, শুধু জেনে রাখুন যে আমি শুধু বন্ধুত্বের পথ ধরে চলতে চাই— বিশেষ করে আপনার সঙ্গে—

সে তো ভালোই কথা, কিন্তু আমার বস্ বাসু-সাহেব যদি জানেন ?

বারে! উনি কী করে জানবেন ? আমি কি এর কথা ওকে ওর কথা তাকে বলে বেড়ানোর আরেকটা নতুন বিজনেস খুলেছি ? আর, তা করলে আমি এতো সব চালাচ্ছি কি করে ?

কিন্তু উনি তো পিক্চারে আসবেনই, এতোগুলো টাকার ব্যাপার যখন—

সুহাস আশা করছিল যে সে এবারে শুনতে পাবে বাসু-সাহেব যে স্ট্যাণ্ডটা নিতে চাইছেন তা দত্ত কতোটা জানেন, বা তিনি কতোটা জড়িয়ে আছেন ব্যাপারে। কিন্তু তার কোন হদিশ এখনও মেলেনি। মেলে না দত্তর পরের

কথাতেও— আপনার ওপরে উনি কোন কথা বলবেন বলে মনে হয় না। উনি আপনাকে খুবই বিশ্বাস করেন, আর শুধু উনি কেন, সবাই করে। সনেট অফিসার বলে আপনার যে সুনাম আছে তা কে না জানে মিঃ ভৌমিক ?

একটা সিগারেট বের করে সুহাসের দিকে বাড়িয়ে একটু হেসে দত্ত বলেন— নিন আরেকটা, এটা কিন্তু থার্ড সিঁড়ি নয়!

সুহাসের সিগারেটটা জ্বালিয়ে দিয়ে দত্ত বলে ওঠেন—

আমরাই প্রথম থেকে আছি, টেণ্ডারেই কাজটা পেয়েছিলাম, ডেলিভারী শিডুলও ঠিক রেখেছি, কোয়ালিটি ভালো ছিল, আর রেফারেন্সও আমাদের খুব ভালো— আর কী দেখবেন আপনাদের বাসু-সাহেব— বিশেষ করে আপনি যখন স্টেটমেণ্টটা করে দিচ্ছেন—

সুহাস এতক্ষণে বুঝে নিয়েছে যে বাসু-সাহেবের ব্যাপারটা এর বেশি জানার সম্ভাবনা তার নেই। তাহলে আর কী জন্যে বসে আছে সুহাস ? দত্তর ওই টু-পার্সেন্টের কথাটা তো শুনেই নিয়েছে সে!

টেক ইয়োর ওন টাইম মিঃ ভৌমিক, রাত্রে ভালো করে ভেবে নিয়ে কাল সকালে আমাকে ফোন করুন—

তারপর একটু হেসে আবার বলেন— বড়ো ডিসিশন নিতে যে সময় একটু চাই তা দত্তর জানা আছে। অনেকদিন সে এ-লাইনে রয়েছে মিঃ ভৌমিক।

এখন তাহলে উঠি আমি মিঃ দত্ত ?

আরে, আরে! এখুনি কী যাবেন ? দয়া করে এসেছেন যখন বসে একটু ওয়ার্মড্ আপ্ হয়ে তারপরে তো যাবেন।

তার মানে ?

কোন উত্তর না দিয়ে একটু হেসে দত্ত সোফা থেকে উঠে দেয়াল আলমারির দিকে এগিয়ে যান। ভিতরে থেকে একটা সুন্দর চেহারার বোতল বের করে বলেন— এটা রীয়্যাল স্কচ্ মিঃ ভৌমিক, এতো স্ট্রেইনের পরে আপনার চমৎকার লাগবে।

আমি তো খাই না, সুহাস বলে।

খান না ? বলেন কী! কখনও খান নি ?

না, ঠিক তা নয়, খেয়েছি, তবে খুব কম, শুধু কোনো কোনো অকেশনে।

তাহলে আজ তো নিশ্চয়ই খাবেন।

কেন ?

আজ কি আপনার জীবনের কিছু কম অকেশন মিঃ ভৌমিক ? ভেবে দেখুন ভোঁ—

বলে সুহাসের উত্তরের অপেক্ষা না করে দত্ত টেবিলের উপরে যে জলের গ্লাস দুটো ছিল, তাতেই দ্রুত বোতলের থেকে ঢেলে দিচ্ছেন দেখেন সুহাস বলে ওঠে— না, না, অতোটা নয়, খুব ছোট্ট একটু দেবেন—

আজ সুহাসের সত্যিই একটু দরকার ছিল— মাথাটার যা অবস্থা হয়েছে। তবু একথাও ভুললে তার চলবে না যে এখন অন্তভাবে সেটাকে ভারি করাও উচিত নয়— স্থির শান্ত মস্তিষ্কে তাকে আজ অনেক কিছু ভাবতে হবে বাড়িতে ফেরার পরে— আর সেজন্যই সে খেতে চায় না আজ—

দত্ত রুম সার্ভিসকে ডেকে সোডা আনিয়ে নিলেন। তারপর নিজের গ্লাসে আরও একটু ঢেলে বললেন— একটু বেশি খেলেও কোনো ক্ষতি নেই মিঃ ভৌমিক— ব্রাণ্ডটা দেখেছেন ? ওয়ার্লর্ডস্ বেস্ট্ হুইস্কী এটা।

সুহাস ঠোঁটে সামান্য একটু ছুঁইয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। দত্ত নিজের গ্লাসটা দ্রুত খালি করে আবার একবার ঢাললেন। সুহাসও আরেকবার ঠোঁটে ছোঁয়ালো— এবারে সে উঠবে মনে মনে স্থির করে নিয়েছে। কিন্তু ঘটনার স্রোত ঘুরে গেল প্রায় তখনই— দত্ত এতক্ষণে আরও একবার ঢেলেছেন — কতোটা তিনি খেয়েছেন তা সুহাস বলতে পারবে না, কিন্তু ওঁর কথা বলার ভাবটা বদলে গিয়েছে, চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সুরু হলো এভাবেই—

দ্য থার্ড ষ্টেয়ার ইজ দ্য ইজিয়েস্ট স্টেয়ার মিঃ ভৌমিক, খুব দ্রুত ওখান দিয়ে ওঠা যায়— যখন মেয়েরা ওখান দিয়ে ওঠে কার্পেট-মোড়া ওই সিঁড়ির মানুষদের মতো ধীর চালে ওঠে না—যদি দেখতেন একবার সেই তিরতিরিয়ে উঠে যাওয়াটা !

আর ইজিয়েস্ট কেন বললাম জানেন, দেখুন পৃথিবীর চারপাশে তাকিয়ে— মরালস্ নিয়ে, স্ক্রুপলস্ নিয়ে কেউ কোথাও উঁচুতে উঠতে পারে না। পারেনি কোনদিন। অন্তত আমি দেখিনি। আপনি যদি দেখে থাকেন তাহলে নামটা আমাকে জানাবেন প্লীজ, আমি একটু ইনভেষ্টিগেট করে দেখবো।

ওই থার্ড সিঁড়ি দিয়ে ওঠা মেয়েদের কথাই যখন উঠেছে ওদেরই বিষয়ে শুনুন বলি— ওরা এখানে এসে অন্তত পঞ্চাশটাকা ফিস নিয়ে যায় আদায় তার দ্য ড্রিংকস এ্যাণ্ড ফুড দে কনজিউম— অথচ কতো দাম ওদের অন্য জায়গায় ?

অফিসে কাজ করলে দিনে আট-ঘণ্টা খেটে কতো পেতো ? পাঁচ টাকা, ছ-টাকা কিংবা বড়ো জোর দশ টাকা। বলুন, আমি ঠিক বলছি কি না ?

এখানে তার পাঁচগুণ— দশগুণ, ফর ওয়ান আর টু আওয়ার্স ওনলী, এ্যাণ্ড ছাট অলসো ইজ্ অন দ্য টপ অফ্ দ্য প্লেজার দে গেট দেমসেলভস্।

সুহাস এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলে— কিন্তু ও তো হলো প্রস্টিটিউশনের ব্যাপার—

ঠিক ওই নামেই যদি আপনি বলতে চান, তাহলে আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো— কোন্ ব্যাপারে প্রস্টিটিউশন নেই তা আপনি বলতে পারেন ? ইন হোয়াট ফিল্ড্ অফ লাইফ ? মিঃ ভৌমিক—বলুন আমাকে প্লীজ—

সুহাসের চোখের ওপরে প্রশ্ন ধরে রেখেছেন দত্ত। একটু অপেক্ষা করেন তার উত্তরের জন্য, তারপর আবার বলেন— সব জায়গাতেই ওই এক ব্যাপার চলছে— নামে আলাদা, কাজে এক। এই মেয়েগুলো করছে টাকার জন্যে, তারাও করছে টাকার জন্যে। এরা বিক্রি করছে দেহ, তারা করছে প্রিন্সিপলস্, মর‍্যালস্। এ্যাণ্ড দে আর গোয়িং আপ্ হায়ার এ্যাণ্ড হায়ার—আত্মাকে বিক্রি না করে কে কোথায় বড়ো হয়েছে, কবে হয়েছে, তা বলতে পারেন ? কোন্ ফিল্ডে ?

আর একটা চুমুক দিয়ে একটু থামেন দত্ত। তারপরে বলে ওঠেন—বলুন, একটা কিছু উত্তর তো দেবেন।

সুহাস একটু হেসে বলে— আপনিই বলে যান মিঃ দত্ত, আমার শুধু শুনতেই ভালো লাগছে।

তবে মনে রাখবেন মিঃ ভৌমিক যে, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতো কয়েকজন সাকসেসফুল পাগলকে বাদ দিয়েই আমি কথাগুলো বলছি—ওরা সমাজের একসেপ্‌সন, এ্যাণ্ড ছাট প্রুভস দ্য রুল—

আর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের কথা যখন এসেই পড়েছে, তখন সাহিত্যের ফিল্ডই খুঁজে দেখে আপনি আমার উত্তরটা দিন—

বলেই দত্ত একটু থামেন। তারপর আবার বলে ওঠেন— না, মিঃ ভৌমিক ওঁদের যুগের কোনো মানুষের কথা বলবেন না, সে একটা সময় সত্যিই ছিলো দেশে যখন আমিও বন্দেমাতরম গেয়েছি আমার ছেলেবেলায়। হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে পুলিশের পেটানী খেয়েছি। তাই আপনি বলুন শুধু এখনকার কথা—

দত্ত আর একটা চুমুক দিয়ে সুহাসকে বলেন— কী, আপনি চুপ করে রইলেন যে?

সুহাস একটু লজ্জা-মেশানো হাসি হেসে বলে—সাহিত্যের খবর আমি কিছু রাখি না মিঃ দত্ত।

আমিও রাখি না—আই হেট ইট্। কেন জানেন? বম্বে থেকে আসার পরে এখানে একটা পার্টিতে আপনাদের কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়—বিনি পয়সার স্কচ্ পেয়ে কী গেলাটাই গিলছিলো তা যদি দেখতেন। তার আগে সাহিত্যিক শুনে কেমন ভালো লেগে যাওয়ায় আমার নেমকার্ড ওদের দিয়েছিলাম। ফেরত নিয়ে আসা হয়নি। তারপর কী কাণ্ড জানেন! তাদের তিনজন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে আলাদা— কিন্তু কথাটা একই তাদের— আমি যেন একটা ফিলিম কোম্পানী খুলি, আর ওদের বই ফিলিম করি। আরো একটা কমন পয়েন্ট তাদের দেখলাম— সে নিজে ছাড়া অন্য সবাই ভীষণ খারাপ লোক— ওদের কাউকে বিশ্বাস করবেন না মিঃ দত্ত— এই এক কথা সবারই মুখে—

সুহাস তার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকায়। বড্ডো দেরি হয়ে গেছে, এখন উঠে পড়া উচিত, কিন্তু দত্তর কথা বলার মধ্যে কি যেন যাদু আছে— সুহাসকে তা আটকে ধরেছে। অন্য দিন হলে খুবই ভালো লাগতো, কিন্তু আজ মনের যা অবস্থা! —তবে ঠিক কিভাবে এখন সে উঠতে পারে?

দত্ত বলে ওঠেন— আরও জানেন মিঃ ভৌমিক! আমার এক ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে সেদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল— চেনাই যায় না এমন বিশ্রী চেহারাটা হয়েছে, তারও সাহিত্যের পাগলামি ছিলো ছেলেবেলায়—আছে এখনও, বড্ডো মর‍্যালিষ্ট ছিলো— আছে আজও, নামও যথেষ্ট করেছিলো—আছে এখনও— কিন্তু ওর ছেঁড়া জামা-কাপড় বলে দিলো যে সে হেরে গিয়েছে। আমি কিন্তু দেখেই বুঝেছিলাম যে থার্ড সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ও পারেনি— একটু জিগ্যেস করতেই ব্যাপারটা ধরা পড়ল— ওর কোনো খুঁটি নেই, বই ফিলিমে দেওয়ার লোক নেই— কেননা ও কোনো দলে নেই। তাই থাকে একটা বস্তির মতো বাড়িতে—

এ্যাণ্ড হি ইজ স্টুপিড আই শুড্ সে। ওকেও আমার কার্ড দিয়েছিলাম, দেখা করতে বার বার বলেছিলাম—কিন্তু আজও আসেনি।

মিঃ ভৌমিক, আপনাকে আপনার ভালোর জন্যেই বলছি— প্রিন্সিপল্‌স

একটু— ছেড়েই চলতে শিখুন, নাহলে আপনাকেও হেরে যেতে হবে, আর সেদিন দেখবেন যে আপনার জন্য শুধু মুখের সহানুভূতি দেখাবার মতোও কোনো লোক আপনি খুঁজে পাবেন না— আদার ম্যান পারহ্যাপস ইয়োর ওয়াইফ এ্যাণ্ড চিলড্রেন—

একটু দম নিয়ে দত্ত বলেন— অলসো ইয়োর পেরেণ্টস মে বী, ইফ দে আর এ্যালাইভ্।

কিন্তু যদি আপনি সাকসেসফুল হন, তাহলে অনেক আত্মীয় আপনার কাছাকাছি ঘুরবে, পাড়া-ভর্তি ভক্ত জুটবে, পুজোয় আপনি প্রেসিডেণ্ট হবেন, তারপরে রাজনীতির দলে লীডার হবার ডাক পাবেন—সব দিক দিয়ে শুধু বাড়তেই থাকবেন আপনি—

জানেন, আমি একজন অনেষ্ট পলিটিশিয়ানকেও চিনতাম। সে আজ খেতে পায় না। লাইনটা এখন ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তার জীবনটা আর ফিরে পাবে কী?

কথা থামিয়ে দত্ত সুহাসের গেলাসটার দিকে তাকিয়ে বলেন— এ কি আপনি যে একটুও খাচ্ছেন না?

যা খেয়েছি তাতেই আমার মাথা ধরে গেছে মিঃ দত্ত—

আরে, কিছুই হয়নি আপনার! নিন, ওটা শেষ করে ফেলুন—

সুহাস আবার একটা ছোট চুমুক দেয়। দত্ত নিজের গেলাসটা খালি করে সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলেন— সেকেণ্ড সিঁড়ির কথা জিগ্যেস করছিলেন, না? ফার্স্ট ষ্টেয়ারের চেয়ে ওটা অনেক বেশি ক্ষমতা রাখে মিঃ ভৌমিক— দাঁড়ান, এবারে আমি প্রমাণ দিয়েই কথা বলবো—

দত্ত উঠে দাঁড়াতে গিয়ে একটু টলে যান, সামলে নিয়ে এগিয়ে যান খাটের ওপরে ছুঁড়ে ফেলা সেই এ্যাটাচির দিকে। সেটা খুলে কয়েকটা কাগজ ঘেঁটে দুটো কাগজ বের করে সুহাসের কাছে এসে তার চোখের সামনে মেলে ধরেন— দেখুন, চিনতে পারছেন এ-দুটোকে?

সুহাস বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ভাখে— সেই অন্য দুটো কোম্পানীকে পাঠানো তারই সই করা দুটো চিঠি মিঃ দত্ত সুহাসের সামনে খুলে ধরেছেন—

সে বলে ওঠে— এটা কী করে আপনার হাতে এলো মিঃ দত্ত?

আসে, আসে ব্রাদার— দত্ত মুখ ভরা হাসি নিয়ে বলেন— এ-রকম আরও অনেক উপায় আছে। আর কাল যদি শেষ পর্যন্ত আপনি টেলিফোনও করেন, তাহলে তারও এই ফল হবে দেখবেন।

এই মুহূর্তে সুহাস বিশ্বাস করে তাঁর সব কথাই। দত্তকে যেন কোন আসুরিক ক্ষমতার মানুষ বলে মনে হয়। একটু ভয় লাগে সুহাসের, তবু খুশিও হয়— যেজন্যে সুহাস এখানে এসেছিল এতক্ষণ পরে তা যেন আসছে— দত্ত হুইস্কী একটু বেশি খেয়ে ফেলেছেন, আর এখন বলতে সুরু করেছেন— শুধু সুহাস যদি স্থির হয়ে এই সময়টার লাগাম ধরে রাখতে পারে, দত্ত আরও বলবেন—

দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেনস টু দ্য ফার্স্ট স্টেয়ার হোয়েন দ্য সেকেণ্ড প্লেইজ্ এ ট্রিক্— দত্ত হেসে বলেন—

জানেন মিঃ ভৌমিক— সেকেণ্ড স্টেয়ার দিয়ে হাঁটা কম-মাইনের মানুষগুলোর ক্ষমতা কিন্তু অনেক—ইলেকট্রিশিয়ান প্রথমে লিফট্ অচল করে দিতে পারে, তারপর আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে আলো ফিউজ করে আপনাকে আটকে দিতে পারে, এয়ার কণ্ডিশন থামিয়ে দিয়ে আপনাকে এই ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে— কিন্তু পারে না ওরা থার্ড স্টেয়ারের মেয়েগুলোকে রুখতে— ফার্স্ট-স্টেয়ার আর লিফটে-ওঠা সাহেবরা তাদের ডেকেছে। সেকেণ্ড স্টেয়ারের মানুষগুলো সাহেবদের কাছে টিপস্ পাবে, পাবে মেয়েদের থেকে বখরাও—

দত্ত গেলাশে আর একবার ঢালতে ঢালতে বলেন— সেলাম কাকে মানুষ করে তা জানেন ? শুধু টাকাকেই।

দত্ত উঠে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যান— সুহাস ছাখে দরজার গায়ে হাত দিয়ে তিনি শরীরের টাল সামলে নেন, তারপর ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই সুহাসের খেয়াল হয়, যে হুইস্কী দত্তকে এতো কথা বলাচ্ছে, সেটা আরো একটু বেশি ওঁকে খাওয়াতে পারলে সুহাস তাঁর বাকি কথাগুলো হয়তো জানতে পারবে। তখনই হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে— আর দ্রুতহাতে সে দত্তর গেলাস থেকে খানিকটা সোডা-মেশানো হুইস্কী এ্যাশ ট্রেতে ঢেলে বোতল থেকে সেটা পূরণ করে দেয়— রং একটু ঘন হয়েছে, তবু দত্ত এখন নিশ্চয় রং টং আর দেখবেন না, দেখলেও কিছু বুঝবেন না— সে অবস্থা ওঁর নেই বলে সুহাসের বিশ্বাস।

দত্ত ফিরে এসে বলেন— আপনি কিন্তু একটুও খাচ্ছেন না মিঃ ভৌমিক।

আমার তো অভ্যেস নেই, এতেই বেশ ধরে গিয়েছে—

কিস্যু ধরেনি, কী হবে ওতে আপনার মতো স্ট্রং ইয়াং-ম্যানের ?

সুহাস দত্তকে দেখিয়ে আর একটা চুমুকের ভাব দেখায়—

বলুন, জিনিষটা ভালো কিনা ?— দত্ত বলেন।

খুবই ভালো। বিলিতি জিনিষ তো।

দত্ত খুশি হয়ে বলেন— আপনি কিন্তু খুব স্লো খান, এ্যাণ্ড আই প্রেফার ইট কুইক্—

দ্রুত একটা বড়ো চুমুক দিয়ে দত্ত সুহাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন— ধরুন তো এই হাতটা।

ব্যাপারটা কী তা না বুঝেই সুহাস নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়।

দত্ত হাতটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে চাপ দিয়ে বলেন— দিস ইজ এ হ্যাণ্ড অফ ফ্রেণ্ডশিপ মিঃ ভৌমিক, আর এই রকমই যেন থাকে এটা। আপনি তাহলে বাড়তে বাড়তে সমাজের অনেক ওপরের তলায় উঠে যাবেন— আর এটা যদি সরিয়ে নেন তাহলে জেনে রাখবেন যে দত্ত বেশ খারাপ লোক।

কিন্তু গ্রিপ্-এর যা জোর আপনার। হাতটা তো আমার ভেঙেই যাবে আপনার মুঠোয় ধরা থাকলে— সুহাস একটু হেসে বলে।

দত্ত ওর হাতটা ছেড়ে দেন। সুহাস আবার বলে— গ্রিপ্-এ সত্যিই কিন্তু দারুণ জোর আপনার—

জোর! জোরের কথা বলছেন? তা যদি বলেন— দত্তর কণ্ঠস্বরে এবারে তীব্র উত্তেজনার সুর ফুটে উঠে— কি রকম জোর আমার এককালে ছিলো জানেন? আপনার হাতের মতো একটা হাতকে আমি এক চাপে ক্রাশ্ করে দিতে পারতাম। সারা পৃথিবীকে আমি গুঁড়িয়ে দিতে পারতাম—

সুহাস বুঝতে পারে দত্ত প্রায় আউট হয়ে এসেছেন, আর অল্প একটু অপেক্ষা করে সে এবারে বাসু-সাহেবের কথাটা তুলবে। দত্তর মুখের দিকে চেয়ে সে হেসে বলে— সত্যি, ভাবাই যায় না এই বয়সে এতো কবজির জোর— আপনি নিশ্চয়ই একসারসাইজ করতেন মিঃ দত্ত?

কী না করেছি আমি জীবনে।

সুহাস তার হাসিটা একটু নরম করে বলে— আমি কিন্তু একদিন আপনার জীবনের গল্প শুনতে আসবো—

আমার জীবনের গল্প। —

দত্তর গলায় যেন চমকে ওঠার সুর। কথা থামিয়ে এবারে সুহাসের মুখের মধ্যে দৃষ্টি স্থির করে কী যেন দেখছেন— সুহাস ভাখে ওই-দুটো নেশায় ঘোলাটে চোখের মধ্যে একটা নতুন আলো ফুটে উঠেছে।

নিশ্চয়ই আসবেন। রোজই আসবেন, প্লীজ, এ্যাণ্ড লেট মি টেল ইউ ভাট

ইউ আর দ ব্রাইটেস্ট ইয়াং ম্যান আই হ্যাভ্ এভার মেট ইন মাই লাইফ। এ্যাণ্ড অলসো মিঃ ভৌমিক, ছাট আই লাইক ইউ ভেরি ভেরি মাচ্।

সুহাস বুঝতে পারে হুইস্কীর নেশার রংয়ে টিলে হয়ে দত্ত এখন সুহাসের দিকে ঝুঁকেছেন। কিন্তু এটাকে বাসু-সাহেবের দিকে কীভাবে ঠেলে দেওয়া যায়? সুহাস দ্রুত ভেবে নেয়, তারপর একটু হেসে বলে— একটা কথা কিন্তু বলবো মিঃ দত্ত, আমি দেখেছি এমন কিছু কিছু মানুষ এখনও আছে যারা টাকাকে ভালোবাসে না।

কে সেই মানুষ? তার নামটা আমাকে বলবেন কী?

যেমন ধরুন আমাদের বাসু-সাহেব। এতো বড়ো একটা চাকরি করেন! তবু বাড়ি পর্যন্ত করেননি এখনও, শুনেছি ভাড়া বাড়িতেই থাকেন—

সুহাসের কথার সঙ্গে-সঙ্গেই দত্তর মুখের ভাব বদলে যায়— চোখে এক হিংস্র দৃষ্টি, মুখটা বিকৃত, হাতের মুঠো শক্ত হয়ে সোফার হাতলে একটা কিল পড়ে, আর চিৎকার করে ওঠেন দত্ত— বাসু? ওই বোসটা? আপনাদের বাসু-সাহেব? ছোঃ। কী বলছেন আপনি। টাকা ওর অনেক হয়ে গেছে। এবারে অন্য জিনিস চাই—ওঃ। আমাকে কী ও কম ভোগাচ্ছে? ওই রাস্কেলটা। ওর আরও বড়ো ঘুষ চাই। মেয়েছেলে মিঃ ভৌমিক, ওর মেয়েছেলে চাই— সবচেয়ে বড়ো ঘুষ আজকের পৃথিবীতে। টাকার ঘুষ—ও-সব আপনাদের মতো ভালো ছেলেদের জন্য— আর ওদের জন্যে—ওই বোস রাস্কেলটা। এই ঘরে হপ্তায় দুদিন, ওরই জন্যে এই ঘরটা আমি, আমি—কিন্তু থর্চার জন্যে নয়। রোজ এতো নতুন নতুন ইয়াং মেয়ে আমি কোথায় পাবো? ইয়াং! ইয়াং। গশ্।

দত্ত উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকেন।

সুহাসের মাথায় যেন একটা আঘাত পড়েছে। সে একটা জড়ের মতো বসে। সুহাসদের সেই বাসু-সাহেব—ওর কতো দিনের সম্মানিত, শান্ত, ধীর, কাজের মানুষ, যাঁকে সুহাস এতোদিন শুধু বস্ বলে ছাখেনি, বড়ো দাদার মতো সম্মান করেছে— সেই বাসু সাহেব?

সুহাস আজ এ কী শুনল। এ কী বিশ্বাস করা যায়?

দত্ত আবার গেলাসে ঢালতে গিয়ে অনেকটা বাইরে ফেলে দেন। সুহাসের প্যান্টের ওপরেও ছিটকে আসে। সোডার বোতলটা তুলতে গিয়ে মেঝেয় উল্টে ফেলেন— সুহাস তাড়াতাড়ি সেটাকে তুলে নিয়ে বলে— মিঃ দত্ত, আর আপনি খাবেন না কিন্তু, প্লীজ।

কেন? ক্রুদ্ধস্বরে দত্ত বলে ওঠেন।

একটু বেশি হয়ে গিয়েছে আপনার। বাড়িতে তো ফিরতে হবে—

বাড়ি? দত্ত যেন একটু চমকে উঠে বলেন—

হ্যাঁ ভাবুন তো, লিফট্ পর্যন্ত যেতে হবে, তারপরে গাড়ি পর্যন্ত, শেষে বাড়িতে ঢুকতে হবে—

ঠিক আছে, আর শুধু একটা পেগ—দি লাষ্ট ফর দ্য রোড। বাট্ ইউ আর এ ভেরি গুড বয় ভৌমিক। বাড়ির কথা তুমি কখনও ভোলো না, না?

সুহাস খেয়াল করে যে দত্ত এবারে তাকে অন্তরঙ্গ তুমি বলে সম্বোধন করছেন। সে একটু হেসে বলে—ভুললে কি করে চলবে বলুন? বাড়ি আছে তাই না আমরা আছি সবাই—

বলতে বলতে সুহাসের মনে পড়ে যায় আজকের দিনটার কথা—বাড়ি আছে, সংসার আছে তাই না সে আজ এখানে এসেছে। নাহলে কী করতো কে জানে—

টেবিলের ওপরে টেলিফোনটা বাজতে সুরু করেছে।

কী মুস্কিল—এখানেও ফোন! দত্ত বিরক্তির সঙ্গে বলেন।

আচ্ছা, আমিই শুনে আসছি, আপনাকে উঠতে হবে না— বলে সুহাস গিয়ে রিসিভার তুলে নেয়—হ্যালো।

দত্ত সাহেব আছেন?

আপনি কে বলছেন!

উনি থাকেন তো ওঁকেই দিন।

সুহাস টেলিফোনের মুখটা হাতের তালুতে চেপে রেখে দত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে— নামটা বলতে চাইছেন না, আপনাকেই বলবেন—

ব্রিং দ্য রিসিভার হিয়ার— দত্ত বলেন।

সুহাস কার্পেটের ওপরে দীর্ঘ তারটা গড়িয়ে ফোনটা দত্তর পাশে পেগ টেবিলের ওপরে এনে রিসিভারটা তাঁর হাতে দেয়।

তারপর সুহাস শুধু দত্তর কথা শুনতে থাকে— না, তিনি আজ এখানে নেই। দরকার আছে! তাহলে কাল ফোন করবেন, কাল তাঁর আসার কথা আছে।

আমি আপনাকে চিনি! কে আপনি? নামটা বলুন—

তারপরে দত্ত বেশ বিরক্ত গলায় বলেন— তাই বলো। তা আমাকে কেন

জ্বালাতন করছো বাপু, বলছি উনি আজ নেই। দরকারও কিছু নেই, তুমি বরং অন্য কোথাও চেষ্টা করো—

এর পরে দত্তর বিরক্তি অনেক বেড়ে ওঠে—আমি ডাকিয়েছিলাম তো হয়েছে কী? তোমাদের পাওনা নিশ্চয়ই পুরো মিটিয়ে দিয়েছি। বলতে বলতে খুব রেগে ওঠেন তিনি—বরং বেশিই দিয়েছি। দত্ত কাউকে কম দেবার লোক নয়—বুঝলে?

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে শোনার পরে একটু নরম ও বিস্মিত গলায় বলে ওঠেন— কোন্ মেয়েটা?

কী বলছে? টাকা লাগবে না। তার মানে? ফ্রিতে আমি কাউকে ডিটেইন করতে রাজি নই, কেন যে মিছিমিছি আমাকে—আর জ্বালিও না বাপু! ছাড়ো—

বলে, টেলিফোনটা কান থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। সুহাস ছাখে সেটা আবার কানের ওপরে ঠেকল, তারপর বিরক্ত কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন দত্ত – আচ্ছা, আচ্ছা আর জ্বালিও না বাপু! চলেই এসো। আমার রুম তো জানো— গেটে-ও আমি বলে দিচ্ছি এখনই—

কথা শেষ করে বোতাম টিপে লাইন কেটে দিয়ে আবার কাকে যেন বলেন, এ ম্যান এ্যাণ্ড এ গার্ল কামিং বাই ব্যাক গেইট, লেট দেম ইন।

রিসিভারটা প্রায় আছাড় দিয়ে নামিয়ে দত্ত বলে ওঠেন—যত্তোসব।

সুহাসের কাছে সব আবছা-আবছা স্পষ্ট, তবু কী যেন এক রহস্যময় ব্যাপার—

দত্ত বলে ওঠেন—হুইস্কীর সব রংটা চটে গেল তোমাদের ওই বোসের জন্তে। কবে কোন্ একটা মেয়েকে নিয়েছিল, তারই পিরীত আজ এমন উথলে উঠেছে যে এখন সে আমার সঙ্গেও ফ্রি-তে দেখা করতে চায়। টাকা চায় না— হুঃ।

সুহাস ওঠার ভঙ্গি করে বলে— আমি এখন আসি মিঃ দত্ত।

আরে, যাবেন কি, বসুন। চোখে দেখেই যান আপনাদের বাবু-সাহেব টাকার বদলে কি জিনিষ পছন্দ করেন।

তারপর যেন কোন মজার কথা ভেবে হো হো করে হেসে ওঠেন দত্ত। হাসি একটু কমলে বলেন—আর নিজের জন্তও দেখে রাখুন, আপনিও তো শিগ্গির বিগ্ বস্ হতে যাচ্ছেন। কত্তোই বা আর দেরি—

এবারে মাতালের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন দত্ত — ট্রাই এ্যাণ্ড থ্রো হিম এ্যাওয়ে

মিঃ ভৌমিক, এ্যাণ্ড ম্যাচ এ্যাওয়ে অল দ্য গার্লস ফ্রম ছাট র‍্যাস্কাল বোস—ইয়োর সাহেব—ইয়োর বস্—

দম ফুরিয়ে গিয়েছে দত্তর, তবু বদ্ধ গলায় কথা শেষ করেন— এ্যাণ্ড মাই মনস্টার—

দম টেনে আবার যথাসাধ্য চেঁচিয়ে ওঠেন— টাকার দরকার নেই আর—সি, বি, আইয়ে যদি খবর যায়, যদি প্রোব্ হয়। তাই শুধু মেয়ে চাই। মেয়ে চাই। রোজ রোজ নতুন নতুন! ইয়াং গার্লস। ইয়াং। বাস্টার্ড।

সুহাসের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত— এই জায়গায় আর একটুও নয়। সে দাঁড়িয়ে উঠে বলে— আমি এখন আসি মিঃ দত্ত—

তার মানে? ওই বোসটার ইয়াং সুইট-হার্টকে না দেখেই তুমি চলে যাবে? বোসো ওখানে, বোসো বলছি। এ্যাণ্ড রিমেম্বার ইউ আর ওনলি টেকিং অর্ডারর্স ফ্রম মী নাউ—

এ-রকম একটা বদ্ধ মাতালের সামনে কী করবে তা ভেবে পায় না সুহাস। তবু সে বসে। এখনই যে কোন সময় আসবে বাসু-সাহেবের সেই ইয়াং গার্ল। সুহাস কী করবে? কী করা উচিত? এখনই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে একটা ছুট দিয়ে পালালে কী হয়? দত্ত উঠে দাঁড়ানোর আগেই দরজাটা খুলে সে দ্রুতপায়ে চলে যাবে। দত্তর দিকে তাকায়—তাঁর মাথাটা ঢুলে পড়ছে; সুহাস ভাবছে সে উঠবে এক্ষুনি—

দরজায় কলিং বেলের শব্দ। দত্ত মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন— দে হ্যাভ্ কাম।

টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে যান। দরজা খুলে দিতে দুজন ঘরে ঢুকছে— সুহাস মাথা নিচু করে নিজের লজ্জা থেকে বাঁচতে চায়।

তবু চোখদুটো উঠেই যায়, আর সঙ্গে সঙ্গেই সে চিৎকার করে ওঠে—টুনু। এ কি রে—অনুপ, তুই!

তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠে— এই অনুপ দাঁড়া—

সুহাস ঘর থেকে বেরিয়ে আসে—দূরে যে মানুষটা করিডর দিয়ে ছুটছে তাকে আর একবার ডাকে— এই অনুপ—

সুহাস কি করছে তা সে জানে না—সে আধো-অন্ধকারে একটা ছায়ার পিছনে চলেছে—ছায়াটা মিলিয়ে যেতে চাইছে—

ঘুরপাক দেওয়া সরু একটা সিঁড়ি। সুহাসও চলেছে যেন অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে—ওই ছায়াটাকে তার চাই—কেন তা জানে না—

ছায়াটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। তারপর আবার ছুটেছে—তার থেকে কি একটা যেন ছিটকে পড়ল—সুহাসও ততক্ষণে পৌঁছেছে। একটা জুতো—সুহাস ছায়াটার কাছাকাছি চলে এসেছে। তারপর আলোর মধ্যে অনেকগুলো দাঁড়ানো-গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে চলেছে। ওখানে গেটের সামনে দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—সুহাস চেঁচিয়ে বলল— উস্‌কো পাকড়ো।

॥ এগারো ॥

টুনু শুধু একটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। নানুদা চলে গেছেন। টুনু যেন ভূত দেখেছিল যে সুহাসদাকে দেখে—তিনিও গিয়েছেন—শুধু রয়েছে আর একজন মানুষ—পাগলের মতো হাত ছুঁড়ে মুখভঙ্গি করে টুনুকে বলছে— গেট্ আউট্।

টুনু আস্তে আস্তে পিছিয়ে এল। এই লোকটা অনেকদিন আগে ওর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতো, সে-ই টুনুর দিকে তেড়ে আসছে— গেট্ আউট্ অফ হিয়ার।

টুনু দ্রুতপায়ে দরজার বাইরে বের হতেই ওর পিছনে সেটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে টুনু। কিন্তু সুহাসদা! নানুদা কোথায় চলে গেলেন? টুনুও চলে যাবে কিনা ভাবছে—যে পথে এসেছে তা ওর চেনা—কিন্তু সুহাসদার সঙ্গে যদি আবার দেখা হয়ে যায়।

দরজাটার কাছ থেকে একটু সরে এসে টুনু ভাবতে লাগল— কী করবে সে?

ওদিক থেকে হোটেলের একজন উর্দি-পরা লোক ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল— যাঁহা যানা হ্যায় যাইয়ে, এ্যায়সা খাড়া রহনেকা কানুন নহী হ্যায়।

এই লোকটাই কী আগের বার ওকে মেমসাব্ বলে সেলাম করেছিল? ঠিক তেমনিই চেহারাটা যেন—

টুনুও আরও একটু সরে এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা বলল— কোই কমরে যানেকো হ্যায় তো যাইয়ে, নহী তো ওহী সিঁড়িসে উতর যাইয়ে।

টুনুকে ও বেরিয়ে যেতে বলছে। আগেরবার টুনু খাতির পেয়েছে এদেরই কাছ থেকে—

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে কয়েক সিঁড়ি নেমে সে একটু দাঁড়ালো। হঠাৎ

নিচের দিক থেকে পায়ের শব্দ আসতে আবার নামতে সুরু করলো। একটি মেয়ে একজন হোটেল-বয়ের সঙ্গে ওপরের দিকে যাচ্ছে। টুনুর মুখের দিকে তাকিয়ে গেল মেয়েটা—টুনুর যেন চেনা—কোথায় যেন দেখেছে।

সিঁড়ির বাঁকে ওরা দুজন আড়াল হতেই টুনু আবার থামল। একটু পরে ওপরের দিকে শব্দ হচ্ছে আবার নামতে শুরু করল। শব্দটা মিলিয়ে গেছে। আবার সে থামল। তারপর প্রতিটি বাঁকে এক একবার থেমে সময় কাটিয়ে সে শেষ পর্যন্ত নিচে নেমে এল।

সুহাসদা নানু-বাবু ওঁরা কেউ এখানে নেই। টুনু দ্রুতপায়ে চলে এল বাস-ষ্টপের কাছে—আজ কোন মানুষের আশায় নয়, ও এখন সোজা বাড়ি ফিরে যাবে।

পাঁচ নম্বর বাসে কী দারুণ ভিড়। তবু সে কোনমতে উঠল। একটু পরে মানুষের ঠেলায় ঠেলায় ভিতরে এগিয়ে একটু দাঁড়াবার জায়গা পেল। যদুবাবুর বাজারের কাছে আসতে ভাগ্যটা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে টুনুর পাশেই সিট দুটো একসঙ্গে খালি করে তার একটায় ওকে বসার জায়গা করে দিল।

বসামাত্রই টুনুর মাথায় সব চিন্তাগুলো আবার ভিড় করে আসছে— আচ্ছা, সুহাসদা কি করে ওখানে এলেন? যে লোকটা টুনুকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে—আগের বার মিষ্টি কথা বলে, খাবার আনিয়ে সে নিজেই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে সুহাসদার কি করে চেনা হলো? চেনা আছে কি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেও যাঁকে টুনু খুঁজতে গিয়েছিল? খুব সম্ভব আছে। কেননা, এই ঘরে ওদের দুজন ছাড়া প্রথম যে মানুষটাকে দেখল টুনু আজই—সে সুহাসদা।

তবু ওদের সঙ্গে সুহাসদাকে যেন কিছুতেই মানায় না। এই ঘরেও সুহাসদার তো আসা উচিত নয়—কিন্তু কেন উনি এসেছিলেন? তবে উনিও কী?

কে বলতে পারে। মানুষ কে যে কী রকম তা বাইরে থেকে কিছুতেই বোঝা যায় না—টুনু কি কম দেখলো আজ পর্যন্ত। কোনো কিছুতেই ওর আর নতুন করে অবাক হবার নেই। কেন, টুনুকেই দেখে পাড়ার কেউ কি বুঝতে পারে যে সে কি রকম? কিন্তু টুনু নিজে তো জানে। তেমনি সব মানুষ শুধু নিজেই জানে যে সে কি রকম।

আচ্ছা, সুহাসদা তো নানুবাবুর সঙ্গে গিয়েছেন। উনি নিশ্চয়ই টুনুর সব

খবর সুহাসদাকে বলে দেবেন। তারপর পাড়াময় জানাজানি। কিন্তু যে ভাবনাটা এখন টুনুর আরও বড়ো তা হলো সেই ভদ্রলোককে খুঁজে পাবার রাস্তাটা তো বন্ধ হয়ে গেল। ওই হোটেলে তাঁর খোঁজে কি কোন দিনও যাওয়া চলবে? তা হলে কি করবে এবারে সে?

রাস্তার ধারে ধারে এক একটা আলোর কাছে এগিয়ে যাচ্ছে বাসটা—আলো পড়ছে টুনুর মুখের ওপরে, দেহের ওপর। আলোয় ভেসে যাচ্ছে শরীর—তবু সে শুধু এক ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলেছে—কোথাও কোনো আলো তার সামনে নেই। বাড়িতে নেই। কী করবে, কার কাছে যাবে তার ভাবনা নিয়ে তা জানা নেই—

হঠাৎ বাসের একটা ঝাঁকির সঙ্গে মনে পড়ে যায়—লীলা সেই যে ঠোঙাটা দিয়েছে, বলেছিল, বাড়ি যাওয়ার আগে খুলবি না, কার যেন ঠিকানা আছে, চিঠি আছে—তোর কাজে লাগতে পারে—না, কি যেন বলেছিল লীলা।

ব্যাগ খুলে ঠোঙাটাকে বের করে সেটা খুলে ফ্যালে টুনু। ওষুধের খুব বড়ো এক পুরিয়ার মতো ভাঁজ-করা পুরু একটা কাগজ। সেটা খুলতেই সে অবাক হয়ে যায়— আরে! এ যে অনেকগুলো দশ টাকার নোট।

দ্রুত সেগুলো গুনতে থাকে টুনু— পাঁচটা নতুন নোট। পঞ্চাশ টাকা। লীলা এর মধ্যে পঞ্চাশ টাকা রেখে দিয়েছে! ব্যাপারটা কী? একি লীলার আর একটা পাগলামির খেয়াল?

নোটগুলো ব্যাগের মধ্যে ভরে টুনু সেই কাগজটা ছাখে— একসারসাইজ বুকের রুল টানা একটা কাগজ। তাতেই পেন্সিল দিয়ে লেখা। কাগজটা আলোর দিকে ধরে পড়তে ল' .গ সে। বাসের ঝাঁকুনিতে হাত নড়ে নড়ে যাচ্ছে তবু পড়ে টুনু—

টুনু—

আজ তোকে আমার খুব ভালো লেগেছে। সেই জন্যে কাল একটা হোলনাইটের কাজে যা পেয়েছি সেটা তোকেই দিয়ে গেলাম। এদিয়ে মা বাবার কাপড় কিনিস। নিজের শাড়ি কিন্তু খবর্দার এই টাকায় কিনবি না। কিনিস নিজের রোজগারে। এ টাকা ফেরৎ আমি চাই না। তোর সঙ্গে সেবারে যা পেয়েছি আর অন্য সময় তোর টাকার থেকে যা ভাগ নিয়েছি তারই হিসাবে এটা তোকে দিলাম। এর পর থেকে কিন্তু লীলাদি বলে ডাকবি।

—তোর লীলাদি।

বাসের ঝাঁকানিতে চিঠি-ধরা হাতটা তখনও কাঁপছিল, তার সঙ্গে টুনুর শরীরের আরও কয়েকটা অংশ কেঁপে উঠে গলার মধ্যে একটা ডেলা উঠেছে। সেটাকে গিলে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে টুনুর দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল।

কোনো মানুষের উৎসুক চোখের সামনে বসে কাঁদছে কিনা তা সে ভাবল না—ওর কোনো দিদি নেই। ওকে কেউ কিছু দেয় না। শুধু আজ লীলাদি দিয়ে গেছে—

এই যে এতো বড়ো একটা পৃথিবী—কতো মানুষ, কতো বাড়ি, কতো আলো—পথের দু-পাশে কতো না দোকান—কতো জিনিষ—কতো লোক যে হাতে কতো কিছু নিয়ে বেরিয়ে আসছে—টুনুর বয়সী কতো মেয়ে শাড়ির প্যাকেট-হাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে—হাসি হাসি মুখ। শাড়ি পছন্দ করে কিনতে পেরেছে বলে—শাড়ি ভালো হয়েছে বলে। কিন্তু টুনু।

সেই কতোকাল আগে বাবা পুজোর সময় ফ্রক কিনে আনতেন। হ্যাঁ, শাড়ি শুধু একবারই পেয়েছিল, তারপর থেকে প্রতিটি শাড়ি সে নিজের রোজগারে কিনেছে—কিনেছে বাবা আর মায়ের কাপড়—সে ভালোই করেছে। কিন্তু টুনুরও কি সাধ হয় না ওকে কেউ একটা কিছু কিনে দিয়ে বলবে—টুনু ছাখ তো তোর পছন্দ হলো কিনা?

কেউ নেই টুনুর—ওকে কিছু দেবার মতো। একটা লজেঞ্চুষ, একটা টফি, কি একটা বিস্কুট খেতে ইচ্ছে করলেও তা টুনুকে নিজের পয়সায় কিনতে হবে, জ্বর হলে যে ডাবের জল মা ওকে সেদিন দিয়েছিলেন তাও তো টুনুরই পয়সায় কেনা—

ওইসব মেয়েরা—যারা হাসতে হাসতে চলেছে বাড়ির লোকের সঙ্গে, ওই যে পাশ দিয়ে যে ট্যাকসিটা চলে গেল—ওরই বয়সী একটি মেয়ে আর একটি ছেলে—হয়তো ওর দাদা, কিংবা যে ওকে ভালবাসে—ওদের টুনু হিংসে করে না, কাউকে হিংসে করে নিজে কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু টুনুরও তো ইচ্ছে করে সবাইকার মতো চলতে—অন্তত কোনো কোনো দিন। অন্তত একবার—

টুনুর দু-গাল বেয়ে চিবুক থেকে বুকের ওপরে জল গড়িয়ে পড়ছিল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে নিল সে। চিঠিটায় জল পড়েছে। মুছে সেটাকে ব্যাগের ভিতরে রেখে দিল। এ চিঠিটা কোনদিন হারিয়ে ফেলবে না টুনু—

টুনু আবার রাস্তার দিকে তাকায়—ওখানে অনেক মানুষ—টুনুকে দেবার লোক ওদের মধ্যে আছে—কিছু নিয়ে তবে তারা দেয়। টুনু একেবারে অকৃতজ্ঞ

নয়—তারা দিয়েছে বলেই না টুনু আজও বেঁচে রয়েছে—বেঁচে আছে টুনুর বাবা, ওর মা, দাদা—সবাই। কিন্তু আজ টুনুর যা হয়েছে সেটা জানলে ওরা কি বলবে? যখন শুনবে টুনুর ফুরোনের কাজটা কি রকম—

ওরা যা বলবে বলুক। জানুক সবাই। সবাই মিলে এবারে ভাগ করে নিক—যেমন খাবার ভাগ করে খেয়েছে। আর একা-একাই বা টুনু এতো বোঝা বইবে কি করে?— ভাগ নিক মা, ভাগ নিক দাদা। না, বাবা নয়। বাবার কোনো দোষ নেই। বাবা বড়ো অসহায়—টুনুর থেকে আরও অনেক বেশি—

বাসটা পুলের ওপরে উঠতেই টুনু উঠে দাঁড়াল। গড়িয়াহাটার মোড় থেকে শাড়ির প্যাকেট হাতে যে সব মেয়েরা উঠেছে তাদের ভিড় ঠেলে দরজার দিকে এগিয়ে এল—আর একটু পরেই সে বাড়িতে পৌঁছোবে। তারপর?

তার আগে পাড়ার প্রতিদিনের ভয়ের পথটা ছেলেরা এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে। পুজোর জায়গাটা— বাঁশ বাঁধা শেষ হয়েছে। কাল মহালয়া। তার সাতদিন বাদে পুজো। এই পুজোটায় টুনু একদিন কতো আনন্দ করেছে—কিন্তু ক-বছর ধরে এটা আর টুনুর পুজো নয়— ভিড়ের মধ্যে কোনো ফাঁকে একটু প্রতিমা দেখে সে শুধু নমস্কার করে চলে যায়। দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দেওয়ারও সাহস হয় না টুনুর।

একটু এগিয়ে সেই বারান্দা—গান আর মাইক নিয়ে কী যেন তর্ক চলছে ছেলেদের মধ্যে। টুনু মাথা নিচু করে কোনমতে জায়গাটা পার হয়ে গেল।

এবারে আসল বিপদ— সুহাসদার বাড়ি। উনি কি বাড়িতে ফিরেছেন? ফিরে থাকলে টুনু কি তাঁর চোখ এড়িয়ে পার হতে পারবে? আজ হয়তো পারতে পারে, কিন্তু একদিন না একদিন দেখা তো হবেই। তখন টুনুর কী অবস্থা হবে? আর সুহাসদার? উনিও কী টুনুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবেন? নান্টুদা টুনুকে নিয়ে তো টেলিফোন করেই গিয়েছিলেন। উনি তবে কি জন্যে বসেছিলেন সেই ঘরটায়? টুনু কী জানে না ওই ঘরটা আসলে কি কাজে লাগে? সুহাসদারও তো জানা উচিত—

রাস্তার যেদিকটায় আলো তার উল্টোদিকে গিয়ে টুনু দ্রুতপায়ে সুহাসদার বাড়ির কাছটা পার হয়ে গেল।

কুটিদাদের বাড়ি। দুপুরে জানালায় দাঁড়িয়েছিলেন— এখন নেই। এ-সময় এখানে থাকেন না কোনদিন। এবারে টুনুদের গলি। টুনু দূর থেকে দেখল ঘরে কোনো আলোর চিহ্ন নেই— বাবা হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছেন। মা এখন কি করছেন?

টুনু এগিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। আজ রাত্তিরে নয়— কাল সকালে বা দুপুরে মা-কে কথাটা বলতে হবে। কী'ভাবে বলবে? মনের মধ্যে আর একবার মিলিয়ে নিল—একটু আগে ও ঠিক করেছে—বলবে, যেখানে কাজ করে একটা ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, সে বিয়ে করবে বলেছিল, তারপর—হঠাৎ এটা হয়ে গেছে। খুব কাঁদতে কাঁদতে টুনু বলবে – কিন্তু কী হবে মা, সে যে হঠাৎ কাজ ছেড়ে চলে গেল। কতো খুঁজেছি তারপরে, কিছুতেই তাকে তো পাওয়া যাচ্ছে না।

এ গল্পটা বাবার কথা ভেবেই তৈরি সে করেছে— বলা তো যায় না, উনি যদি জেনেই ফ্যালেন—

টুনু দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে গল্পটা আর একবার ভেবে নিল। ভিতরে একটা শব্দ হলো—রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মা যেন ঘরের মধ্যে আসছেন। দরজা খুলতে টুনু ঘরে ঢুকে দেখল বাবার মশারিটা ফেলা রয়েছে।

ঘরটা পার হয়ে বারান্দায় এসে নিচুগলায় বলে— কখন ঘুমোলেন?

এতোক্ষণ তো তোরই জন্যে জেগেছিলেন—টুনু এসেছে? এখনও এলো না? লক্ষ্মী-পুজোর প্রসাদ খেলো না?—এই করছিলেন—যদি শুনতিস। তা বেরুনোর সময় তোকে বলতে গেলাম, মুখটা এমন করলি যে—

ও লক্ষ্মী পুজোর প্রসাদ আমি খাবো না— বলে টুনু কলতলার দিকে এগোতে যায়।

মা পিছন থেকে বলেন— তার মানে? নিজে তুই বাজার করে আনলি—

লক্ষ্মী-পুজোর বাজারও আমি আর কোনদিন করবো না।

লীলাদি বলেছিল—ঠিকই বলেছিল—টুনু মনে মনে ভাবে তার সেই কথাগুলো—লক্ষ্মী-পুজো করতে করতে তুই লাইনে চলে এলি?

মা চাপা গলায় ধমকের সুরে বলেন— তুই বাজার না করলে করবে কে শুনি? টুকলা তো কোনদিন একটা কুটো ভেঙে দুটো করে দেয় না—

তাই বলে কি আমাকে করতে হবে? সব কি আমি করবো?—টুনু একটু জোরের সঙ্গে বলে ওঠে। আর তখনই ঘুমন্ত বাবার কথা খেয়াল হতে আরেকটু

দূরে রান্নাঘরের কাছে সরে গিয়ে বলে— আমি আর কিছুই করবো না। কোনদিনও না—

মা এগিয়ে এসে টুনুর মুখের দিকে বিস্ময়ের চোখ মেলে বলেন— কি বললি ?

ঠিকই বলেছি, আমি আর কাজ করতেও যাবো না কোনদিন।

মা অবাক হয়ে যান। কী হয়েছে যে টুনু বাড়ি ফেরার থেকেই এমনি মেজাজ দেখিয়ে আবোল তাবোল বকছে ? তিনি আস্তে আস্তে বলেন— টুনু অতো চেঁচাবিনা বলছি শোন্—

চেঁচাচ্ছি আমি। না তুমি চেঁচাচ্ছো ?

মা আর উত্তর দেন না।

টুনু যেন এইমাত্র প্রথম জিতেছে তার সারাদিনের সব আঘাত সহ্য করার পরে। আরও একটু বেশি সে জিততে পারে—আরো একটা আঘাত সে দিতে পারে— দ্রুতহাতে ব্যাগটা খুলে সেই দশ-টাকার পাঁচটা নোট মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে বলে— এ দিয়ে তোমাদের পূজোর কাপড় কিনো। আর, এই আমার শেষ টাকা রোজগার তা মনে রেখো— বলতে বলতে লীলার সেই চিঠির কথা মনে পড়তে তারই কোনো সূত্র ধরে সে আরও বলে ওঠে— ওটা রোজগার নয়, দানও নয়। খারাপ টাকাও নয়—এ দিয়ে তোমাদের সব কিছু কেনা যায়—

মা অবাক হয়ে তাঁর মেয়ের কথা শোনেন, তার পাগলামির বহরটাকে ছাখেন —কিছু একটা ব্যাপার যে ঘটেছে তা বুঝতেও পারেন, কাছে এগিয়ে এসে টুনুর হাত ধরে তাকে রান্নাঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বলেন— কী হয়েছে আজ তোর বল ?

কী আবার হবে ? টুনু জোরে চেঁচিয়ে ওঠে।

এই চেল্লাসনি কিন্তু! খবর্দার বলছি—

বেশ করবো। আমার যা ইচ্ছে তাই আমি করবো—

সঙ্গে-সঙ্গেই টুনুর গালের ওপর ঠাস্ করে মায়ের একটা চড় পড়ে, আর মুহূর্তে রুখে উঠে সে বলে— তুমি তোমার ছেলেকে এ রকম মারতে পারো ? সে যে তোমার হারটা বিক্রি করে কদিন ধরে টাকা ওড়ালো তা তুমি দেখেও ছাখোনি, দেখতে চাওইনি। আর আমি রোজগার করে আনছি সবাইকার জন্যে—সেই রোজগার করতে গিয়ে কী যে আমাকে করতে হয়।

বলতে বলতে হঠাৎ সে কেঁদে ফ্যালে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে— কী কাজ আমি করি তুমি ভেবেছো ? তুমি কি জানো না ? তুমি কি বোঝো না ? কী

লেখাপড়া তোমরা আমাকে শিখিয়েছো যে— লোকে কি অমনি অমনি আমাকে টাকা দেয় ? লোকেরা কি সব অতো বোকা যে—

দম নিতে টুনু একটু থামে। তারপর আবার সে ফুঁপিয়ে ওঠে— আমার এখন তিন মাস চলছে তা জানো কি ? আজ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সেই ডাক্তার বলেছে—কিন্তু কী করবো আমি ? কী দোষ আমার ? সব—সব তো তোমাদেরই জন্যেই। আর, তুমি কিনা আমাকে মারলে।

মা স্তব্ধ হয়ে টুনুর কথা শুনছিলেন। টুনু থামার পরেও কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠেন— তিন মাস ?

হ্যাঁ ডাক্তারটা তাই বলেছে—

কার সঙ্গে মিশেছিলি তুই বল ? —কঠিন কণ্ঠে মা বলেন।

টুনু মায়ের মুখের দিকে তাকায়। সেখানে একজোড়া চোখের এক অদ্ভুত দৃষ্টির সামনে সে হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়, আর আগেকার সেই নরম-ছাঁদের কাল্পনিক কাহিনীটা ভুলে গিয়ে সে সব সত্য কথাই প্রায় বলে ফ্যালে—

মা স্থির হয়ে সব শুনে যান। তারপর গলা একটু চড়িয়ে বলেন— লোকটা কে ? তাকে তুই চিনিস্ ?

আমি চিনি না, তবে আমাদের সুহাসদা চেনেন—

বলেই টুনু চমকে ওঠে—এ কী বলল। কী ভুল যে করে ফেলল—

কিন্তু মা ততোক্ষণে চেঁচিয়ে উঠেছেন— সুহাস ! কোন্ সুহাস ? ভৌমিক বাড়ির ?

টুনু আর কিছু বলতে পারছে না—কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না—

যা সুহাসকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় তো—

টুনু নিজের ভুলটার কোন কূল-কিনারা খুঁজে পায় না আর—এ কী করে ফেলেছে সে—সুহাসদার বিষয়ে সঠিক তো জানেও না কিছু, অথচ—

কি রে, যাবি তুই ডাকতে ? না, আমাকেই যেতে হবে ?

টুনু এখনও কোন উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর হঠাৎ-পেয়েছির মতো বলে ওঠে— সে এই সুহাসদা নয় মা।

তবে সে আবার তোর কোন সুহাসদা বল ? টুনুর গালে আর একটা চড় মেরে মা বলেন— কটা সুহাসদা তোর আছে তাই আগে বল—

টুনু যেন পাথর হয়ে গেছে।

মা তাঁর মেয়ের চোখের মধ্যে তাকিয়ে থাকেন। টুনুর চোখদুটো মাটির

দিকে নেমে যায়—তারই সঙ্গে চোখ নামাতে গিয়ে মায়ের চোখে পড়ে মেয়ের যৌবন-ভরা অশুচি ওই দেহটার দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গেই পাগলের মতো তিনি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন—একহাতে টুনুর চুলের গোছাটা ধরা, অন্য হাতটা এলোপাথাড়ি চলতে থাকে—চলতেই থাকে—

শেষে হাতে যখন ব্যথা লাগে, হাত মুঠো করে শুধু কিল চলে কিছুক্ষণ। তারপরে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন— টুনুকে তিনি ছেড়ে দেন।

টুনু মেঝের ওপরে বসে পড়ে। মা তার দিকে চেয়ে ভাখেন— লাথি মেরে মেরে ওকে শেষ করে দেওয়া যায় না? তার সঙ্গে ওর পেটের সেটাকেও। সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা লাথি ছোঁড়েন।

কিন্তু শুধু সেই একবার। পায়ে তাঁর ব্যথা লেগেছে। দমও ফুরিয়ে গিয়েছে। দম ফিরে পেতে অনেকক্ষণ তিনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকেন—ঘরে শুধু সেই নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

শেষে একটু সহজ হওয়ার পরে তিনি বলেন— আমিই সুহাসকে ডাকতে যাচ্ছি!

এতক্ষণ পরে টুনু প্রথম কথা বলে— না-না মা, তুমি যেওনা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—

তবে তুই-ই যা—

তখনই ঘর থেকে টুনুর বাবার গলা শোনা যায়— হ্যাঁগো, টুনু বাড়ি এসেছে?

টুনু খুব নিচু গলায় প্রায় কান্নার মতো সুরে বলে— বাবাকে যেন কিছু বোলো না মা—

ও এসে এখন খেতে বসেছে— মা চেঁচিয়ে বলেন তাঁকে শোনানোর জন্য। তারপর টুনুকে বলেন চাপা গলায়— ওকে আমার নাম করে ডাকবি, না আসতে চাইলে তোর বাবার কথা বলবি—

টুনু কোন উত্তর দেয় না।

বাবার গলা আবার শোনা যায়—টুনুর কী খাওয়া হয়ে গিয়েছে?

কী তুমি এতো ডাকাডাকি করছো এই রাত্তিরে। —টুনুর মা বলেন। ঘর থেকে তিনি বেরও হয়ে যান।

টুনু এতক্ষণ পরে একটু নড়ে। এখনই প্রথম অনুভব করে তার সারা

দেহভরা ব্যথা আর যন্ত্রণা। প্রায় অসাড় একটা হাত তুলে সে তার পেটের ওপরে বোলায়— এখানেও কি লেগেছে ?

না, তেমন কিছু নয়। মায়ের লাথিটা টুনুর পায়ে আটকে যাওয়ায় সে বেঁচে গিয়েছে শুধু একটুর জন্যে—

টুনুও এই মুহূর্তে রেগে উঠতে চায়—খুব রাগ—প্রচণ্ড একটা পাগলের মতো রাগ—শুধু মায়ের ওপরে নয়, সবাইকার—সব্বাইকার—কিন্তু, তার মধ্যে একটুও শক্তি আর অবশিষ্ট নেই—

॥ বারো ॥

কিড স্ট্রীটের মোড়ের সামনে, ট্রাফিকের লাল চোখের সামনে সুহাসের ট্যাকসিটা দাঁড়িয়ে। অনুপের শেষ কথাগুলো কানের মধ্যে বাজছে— বার্ডস্ অফ্ দ্য সেম ফেদার—তুইও ওদের দলে সুহাস ? তুই ওদের দলে। আমি ভাবতেও পারিনি যে তুইও—

সুহাসের হাত ছাড়িয়ে ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় পিছন ফিরে বলা সেই কথা— চটিজোড়া কুড়িয়ে নিয়ে আয়, ও-দুটো তোকেই আমি প্রেজেন্ট করে গেলাম।

তার একটু আগে— দ্বারোয়ান দিয়ে আমাকে ধরালি তুই। কেন, আমি কি কিছু চুরি করেছি তোর ?

সত্যি, বিশ্বাস কর, আমি কিছু ভেবে ওটা করিনি।

তাহলে কেন তুই আমার পিছন পিছন ছুটলি ?

কেন তা সুহাস জানে না। হয়তো দত্তর সামনে অতোক্ষণ বসে থাকার অস্বস্তি, হয়তো বা বাসু-সাহেবের সেই প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনী, টুনুকে ওখানে দেখে হঠাৎ চমকে ওঠা, কিংবা অনুপকেই দেখে—এ সবের যে কোন একটা তার কারণ হতে পারে, কিংবা ওই সব মিলিয়ে যে ঘটনা—তা-ই ওকে সেই ঘরটার মধ্যে থেকে বের করে সুহাসের পিছনে পিছনে তাড়া করে নিয়ে গেছে। সামনে অনুপও ছুটছিল, কিন্তু সে যে আলাদা করে সুহাসের লক্ষ্যের বিষয় ছিল না সেকথা কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারেনি সুহাস।

আর, বোঝাবার মতো মনের অবস্থাও ছিল না। নাহলে সেও কি উল্টে প্রশ্ন করতে পারতো না— তুই তো আগে ছুট দিলি! বল, কেন ছুটছিলি তুই?

কিন্তু বলেনি। কিছুই উত্তর দেয়নি সব অভিযোগের। ভালই হয়েছে। কী লাভ আর কথা বাড়িয়ে। অনুপ আজ সকালে হঠাৎ যে অতীতের অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসেছিল সেখানেই আবার মিলিয়ে গেছে তার অন্ধকার জীবনের মধ্যে। হ্যাঁ অন্ধকারই! অনুপ টাউট্ হয়ে গেছে। মেয়ের দালালী করে। সত্যি, ভাবা যায় কী যে সেই অনুপ—কলেজের সবচেয়ে ঝকমকে ছেলে— সুহাসদের সবাইকার ঈর্ষার পাত্র অনুপ আজ টাউটের কাজ করছে?

কিড ষ্ট্রীটের মোড়ের সেই জায়গাটার দিকে সুহাস চলন্ত ট্যাকসির থেকে তাকালো। ওখানে এখন দুজন হিপি-হিপিনী দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অনুপের পর্ব শেষ।

তবু অনুপের কথা ভুলতে পারছে না সুহাস। ওকে দেখার পরে অনুপের মনে আজ আত্মগ্লানির চাবুক পড়েছিল, তাই সে সুহাসের কাছে চাকরির জন্যে, বলেছিল দুপুরের সেই টেলিফোনে— তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে মনে হচ্ছে আমি যা করছি তা করা উচিত নয় সুহাস।

কিন্তু আর কোনোদিন অনুপের মনে ওরকম সংশয় আসবে না। সুহাসকে সে নিজের খুশিমতো একটা শ্রেণী:তে ফেলতে পেরেছে— তুইও ওদের দলে।

টুনুর কথাও মনে পড়ে যায়—টুনুও তো সুহাসকে ওই ঘরের মধ্যে দেখেছে। সে-ও যদি ওকে ওই রকম ভেবে থাকে? তাহলে তো সুহাস তা জানতেও পারবে না কোনোদিন। অনুপ যা হয় রসিয়ে রসিয়ে তাকে শুনিয়ে দিয়ে গেল। টুনু তা বলতে পারবে না—মনের ধারণাটা মনেরই মধ্যে রেখে দেবে সে, সুহাসেরও কোন সুযোগ আসবে না তার উত্তরটা দেবার—প্রশ্ন যেখানে নেই, উত্তরের অবকাশ কোথায়?

টুনু, টুনু। সুহাস আজ নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতো না যে সে এখন এই কাজ করছে—ও না সত্যসন্ধবাবুর মেয়ে! তাঁর সেই কতোকাল আগেকার বলা কথাগুলো আজও মনে আছে সুহাসের— মানুষের সততা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার আর কিছুই থাকে না সুহাস।

সেই কথাগুলো কি এখনও বলতে পারবেন সত্যসন্ধবাবু?

আচ্ছা, উনি কী জানেন যে তাঁর মেয়ে এখন কী করছে? হয়তো জানেন।

হয়তো বা জানেনই না। এ প্রশ্নের উত্তর সুহাস কোনদিনও পাবে না। ওদের বাড়িতে একদিন যাবার কথা আজ সকালে যা ভেবেছিল তা আর সম্ভব হবে না। গেলে তো টুনুর সঙ্গেও দেখা হবে, আর ওর সঙ্গে আবার সামনা-সামনি হবার কথা তো ভাবাই যায় না।

ট্যাকসির একটা হর্নের শব্দে একটু সচেতন হয়ে সামনের দিকে তাকালো। গুরুসদয় দত্ত রোডের মোড় কাছে চলে এসেছে। উল্টোদিকের একটা গাড়ির হেডলাইট চোখে পড়ায় চোখ বন্ধ করে নিল সুহাস। খুলল আবার। বাঁ-দিকে রাস্তার সব আলো আর তার গাছের গুঁড়িগুলো ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। ডানদিকে উল্টোমুখী গাড়ির সারি সারি আলোর মিছিল—সব ওকে পার হয়ে পিছনে মিলিয়ে যাচ্ছে। কাঁচ-নামানো দরজার মধ্যে বাতাস ঢুকছে ঝড়ের মতো। সুহাসের চোখ মুখ শিরশিরিয়ে, চুলগুলোকে উল্টে পাল্টে, টাই উড়িয়ে, শার্ট কাঁপিয়ে, গাড়ির মধ্যে ঘূর্ণি তুলে আবার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে.

নতুন হাওয়া—

কী নরম যে এই বাতাসের স্পর্শটা—সুহাসের স্নায়ুগুলো সব শিথিল হয়ে আসে। চোখ জড়িয়ে যায় ঘুম-ঘুম আমেজে। সারাদিন আজ মানুষের মধ্যে শুধু ক্লান্তি আর ক্লান্তি। তার পরে এই বাতাস যেন মায়ের হাতের মতো ওর উত্তাপের কপালে—মা সুহাসের কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন। সুহাস কখন ঘুমিয়ে পড়ত [illegible] সরিয়ে নিতেন সে জানতেও পারতো না।

আজও মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে সুহাস কখন যে ট্যাকসির মধ্যে মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো তা সে জানতেও পারলো না।

ঘুম-জড়ানো চোখ মেলে সুহাস মাথা সোজা করে বসল গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে এসে। সব দোকানগুলোয় ঝুলনে পুজোর ফেস্টুন, রং বেরঙের আলো। ফুটপাথে মানুষের ভিড় উপচে এসে রাস্তার ওপর পড়েছে। অন্য দিন সুহাস ওইসব আলোর দিকে তাখে, তাখে ভিড়ের মধ্যে কতো রকমের কতো পোষাকের কতো বয়সের মানুষ। সারা বছরের শেষে আবার তারা উৎসবের জন্যে তৈরি হচ্ছে দেখে ভালো লাগে সুহাসের।

আজ সে শুধু দেখল কতো অগুনতি গাড়ি ট্রাফিকের লাল চোখের শাসানিতে

দাঁড়িয়ে ওর ট্যাকসিটাকে আটক করে আছে। এদের মধ্যে থেকে ছাড়া পেয়ে কতোক্ষণে যে বাড়ি ফিরতে পারবে সুহাস!

গোল পার্ক। গড়িয়াহাটার পুল। বাড়ি প্রায় এসে গিয়েছে। সুহাস প্রথমেই গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকবে। তারপর আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে, থাকবে সুস্মিতা ফেরা পর্যন্ত। ও নিশ্চয় ফেরেনি এখনও শপিং শেষ করে— আজই তো প্রথম দিনের শপিং। সুহাস কাল ওকে চেক ভাঙিয়ে পুজোর টাকাটা দিয়েছে। সুস্মিতা কী রিনকু খোকনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে? যাওয়ারই তো কথা।

গিয়ে যেন থাকে। তাহলে সে আলো নিভিয়ে চুপ করে শুয়ে আজকের দিনটার কথা ভাবতে পারবে—হ্যাঁ কিংবা না—এ-দুয়ের একটা তাকে বলতে হবে কাল, অথচ কতোদিক যে ভাবতে হবে। ভেবে কি কুল-কিনারা কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে? মাথাটা যা দপদপ করছে—ট্যাকসির মধ্যে তো ঘুমিয়েই পড়েছিল আজ—

ট্যাকসি থেকে নামতেই সুহাসের চোখ পড়স সামনের বারান্দায় দুজন মানুষের দিকে—একটু অবাকও হলো দেখে যে বুটি আর তার মা দুজনে ওখানে বসে আছে, আর সুহাসকে দেখামাত্রই তাদের উঠে-দাঁড়ানো দেখে বুঝতে ভুল হয় না যে ওরা সুহাসেরই অপেক্ষায় ছিল।

ভাড়া মিটিয়ে বারান্দার কাছে আসতেই বুটির মা এগিয়ে এসে বলে—আপনার জন্যে বসে আছি দাদাবাবু!

আমার জন্যে?

হ্যাঁ, বড্ডো বিপদে পড়ে আপনার কাছে এয়েছি—

সুহাসের অনেককাল আগেকার কতোবার শোনা কথা—প্রতিবারই সে চমকে উঠতো শুনে, আজও উঠল তেমনি— কেন কী হয়েছে?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল নিজেরও কথা—ওর নিজেরই কী কম বিপদ আজ? এই একটা দিনে কী সবাইকার যতো বিপদ!

আপনি তো এখনই ফিরছেন— বুটির মা বলে— মুখ হাত ধুয়ে নিন, আমরা ততোখোন বোসচি—

না, না, যা বলার এখনই বলো, ওপরে গেলে আমি আর নামতে পারবো না আজ।

আরও একটু সময় তার উত্তরের জন্য অপেক্ষার পরে সুহাস আবার বলে—বলো, কী হয়েছে ? যা বলার একটু তাড়াতাড়ি বলবে কিন্তু—

এতক্ষণে বলে বুটির মা— মেয়েকে তো আর বস্তির মধ্যে রাখা যাবে না দাদাবাবু!

কেন কী হলো বস্তিতে ?

ওই যে কেষ্টার দল আজ মেয়ের— বলতে বলতে থেমে সে রাস্তার দিকে তাকায়, তারপর মুখ ফিরিয়ে গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে— এখানেও নোক পড়েছে আবার, একটু ভেতরে চলুন দাদাবাবু—

সুহাসও চেয়ে ছাখে যে কথাটা সে মিথ্যে বলেনি। পথ-চলতি কিছু মানুষের চোখ ওদের দিকে ফিরছে, দু-একজন মুখ ঘুরিয়ে দেখে যাচ্ছে ওদের, দেখতে গিয়ে হাঁটার গতি কমিয়ে যেন কথা শুনতে চাইছে, আর দু-জন লোক তো একেবারে সোজা এদিকেই চেয়ে আছে, সুহাস বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়—এ-দেশের কতো কিছু তো বদলে গেল, তবু এই একটা জিনিষ একটুও বদলানো না—পরের ব্যাপারে বড়ো অহেতুক কৌতূহল মানুষের। প্যাসেজের দরজাটা সে ঠেলে দিয়ে বলে— এসো, তোমরা ভিতরে চলে এসো।

ওরা দুজন ভিতরে ঢুকতেই সে বলে— এবারে ওটা বন্ধ করে দাও।

দরজাটা বন্ধ হতে খেয়াল হয় সুহাসের যে সিঁড়িতে আলো খুব কম—তবে কী বালবটা চুরি গিয়েছে আবার ? চোখ তুলে তাকিয়ে ছাখে কালই যে বালবটা কিনে সুহাস নিজের হাতে ওখানে লাগিয়েছিল সেটা এর মধ্যেই চুরি হয়ে গেছে। তবু একেবারে অন্ধকার নয়—ওপর সিঁড়ির আলোটা দেয়াল ঘুরে ঘুরে এসে এখানে প্রায়ালোক ফেলেছে। তারই মধ্যে দু-সিঁড়ি উপরে উঠে একটু দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে বলে— বলো, কী বলছিলে ?

আমাদের বস্তির কেষ্টকে চেনেন তো দাদাবাবু ? ওই মেয়ের পেছনে নেগেচে বলছে বস্তিতে ওকে আর থাকতে দেবে না।

কোন কেষ্ট ?

ওই যে ওয়েগেন ভাঙার সর্দারটা—

সুহাসের মনে পড়ে যায় যে বছর খানেক আগে পর্যন্ত ওই নামটা এ অঞ্চলের সবচেয়ে মুখে মুখে ফেরা নাম ছিল। খুন করেছে কেষ্ট। ওয়াগন ভেঙেছে আজ। পুলিশকে কিনে রেখেছে কেষ্ট। সুহাস একদিন ওদের বাচ্চা চাকরটার মুখে শুনেছিল—পুলিশ কেষ্টর সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গেছে—

তা সে আবার তোমাদের সঙ্গে লাগতে গেল কেন ?

ওসব ছোটনোকের কথা আপনার শুনে কাজ নেইকো দাদাবাবু।

তাহলে আমার কাছে কেন এসেছো বলো—

মেয়েকে এই রেতের বেলায় আমি কোতায় রাকি দাদাবাবু। আপনি যা হোক একটা উপায় করে দিন—

কোথায় রাখবে ? সুহাস একটু অবাক হয়ে বলে— কেন, যে বাড়িতে খাওয়া পরার কাজ করে—ও তো আজই সকালে আমাকে বলল যে এ-পাড়ার কোন যেন বাড়িতে কাজ করছেন।

সে কাজ মেয়েকে ছেড়িয়ে দিয়েছি দাদাবাবু—

ছাড়িয়ে দিয়েছো ? কেন ?

কোনো সোমত্তো মেয়েকে নোকের বাড়িতে কাজ করতে দিতে নেই তা জানি দাদাবাবু, তবু দিচিলাম। কিন্তু ভদ্দরলোকের বাড়িতে য়ে—

বলতে বলতে বাধা পেয়েই যেন কথা বন্ধ করে সে। সুহাস এই প্রায়ান্ধকারেও দেখতে পায় যে বুটি তার মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলছে। আর তাতেই বিরক্ত হয়ে মা বলে ওঠে— থাম্ থাম্। তুই আর কত্তা বোলিস না। কেন বোলবো না আমি দাদাবাবুকে ? উনি সব শুনুন। বুঝুন।

তারপর সুহাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, জানেন দাদাবাবু, মেয়ে যেখানে কাজ করতো সে বাড়ির দাদাবাবু—ওদের মেজো ছেলে, সেই গুণ্ডামতো বাবুটা, সেই বুটির বেলাউজ ছিঁড়ে একেবারে—

ব্লাউজ ছিঁড়ে ? —সুহাস অবাক হয়ে প্রশ্ন করে— কোন বাড়িতে কাজ করতো ঠিক করে বলো তো ?

ওই যে একতলা লাল বারোন্দাঅলা বাড়িটা— বলে বুটির মা হাত দিয়ে দেখাতে যায়, দরজাটা বন্ধ খেয়াল হতে হাত নামিয়ে বলে— সব দিকেই আমার বিপদ দাদাবাবু—আপনি যা হয় একটা উপায় করে দিন—

খুবই করুণ লাগে ওর কথাগুলো— ওয়াগন-ভাঙা কেষ্ট, লাল বারান্দাঅলা বাড়ির দাদাবাবু—কিন্তু কে ? কার কথা বলছে ও ? লাল বারান্দা ! তবে কী কুন্তিদের বাড়ি নাকি ? তা ছাড়া আর কোনো বাড়ির তো লাল বারান্দা নেই ! তাহলে কুন্তিই। সুহাস অবাক হয়ে যায়— কুন্তি এরকম করলো ? হঠাৎ একটা রাগ চলে আসে কুন্তির ওপরে। কিন্তু তখনই তার সেই কথাগুলো মনে

পড়ে যায়— কোথায় যে চলে যাচ্ছি আমরা। সেই হতাশা-ভরা মুখটাও চোখের সামনে ভেসে ওঠে—

সুহাস কয়েক মুহূর্ত আনমনা হয়ে আছে, তারই মধ্যে শুনতে পায় বুটির কথা— মামাবাবু, আপনি আমার একটা ভালো চাকরি করে দিন।

ভালো চাকরি? সুহাস একটু চমকে উঠে বলে—তার মনে পড়েছে কুন্টির বলা সেই কথাগুলো— সুহাসদা যে কোনো একটা চাকরি আমাকে করে দিন।

বুটি বলে— কোনো নার্সিং হোমে, কিংবা বাচ্চাদের ইস্কুলে বাচ্চা রাখার কাজ— আপনার তো কতো চেনা মামাবাবু।

সুহাস বলতে যাচ্ছিল তার ও-রকম চেনা কোনো জায়গা নেই। বলা হয় না বুটির মায়ের কথায়, চাকরির কথাটা শোনামাত্রই সে যেন রেগে উঠেছে— না, খবোদ্দার? চাকরি আর আমি করতে দেবো না কোতাও। তোর এবারে বে দেবো আমি—

বিয়ে? কার সঙ্গে? বুটিও ঝাঁঝের সঙ্গে বলে—বস্তির ওইসব গুণ্ডাগুলোর মধ্যে কেউ? না কোনো ফেরিওয়ালা কি ঘরামির সঙ্গে?

সঙ্গে-সঙ্গেই সিঁড়ির নিচে বন্ধ দরজার ওইটুকু প্রায়ান্ধকার জায়গার মধ্যে যেন হঠাৎ কোন এক ঝড়ের হাওয়া বয়ে যায়—আর, চেঁচিয়ে ওঠে বুটির মা— কী বোললি? ঘরামি, তোর বাপও না ঘরামি ছেলো? নিজের বাপকে তুই রপোমান কোরলি? জানিস, কতো বড়ো বড়ো নোকের ঘর বাঁদতো সে? সব বাবুরা ডাকতো, মিস্তীরী বলে কতো খাতির করতো, আর তুই কিনা তার মেয়ে হয়ে—

দম ফুরিয়ে যাওয়ায় কথা শেষ করতে না পেরে সে হাঁফাতে থাকে, আর তারই মধ্যে বুটিও উঁচু গলায় বলে ওঠে— মিথ্যে চেঁচিয়ো না তুমি। বাবাকে কেন বলবো? তুমিই না উপেন ঘরামির সঙ্গে বিয়ের কথা বলছিলে সেদিন, বলো, বলোনি তুমি।

বলেছি, নিচ্চই বলেচি। তোর বে আমি নিচ্চই দেবো—

তুমি দিয়েছো, আর আমি করেছি—

এবারে ব্যঙ্গের সুর ফুটে ওঠে মায়ের গলায়— দাদাবাবু। ভালো বাবু! জামাটা যে ছিঁড়ে দিলো, কিনে দিক দিকিনি নোতুন একটা—

সুহাসের সামনে এ কী সব সুরু হয়েছে! ওর কোনো সময় নেই, তবু এদের কথা একটু শোনার জন্য সে দাঁড়িয়েছিল, শুনছিলও। কিন্তু তা বলে কী

এই? সে কঠিন স্বরে বলে ওঠে— এই, থামো তোমরা। তোমরা কী ঝগড়া করতেই এখানে এসেছো?

সুহাসের কথায় ওঁরা চুপ করে যায়। লজ্জাও পায়— সত্যি, এভাবে এখানে চেঁচামেচি করা উচিত হয়নি—ওদের দুজনেরই মনে হয়। সুহাস এবারে তার হাতঘড়ির দিকে তাকায়—অন্ধকারে ডায়াল, কাঁটা কিছুই দেখা যায় না। ওর এখন উপরে গিয়ে স্নান করা দরকার। বিশ্রাম দরকার। আজকের কথাগুলো স্থির ভাবে ভাবার জন্য অনেক সময় চাই— অথচ এখানেই আটকে পড়েছে সে। এদেরও বিপদ। তবু কী বা করতে পারে সুহাস?

এবারে আফশোষের সুরে বিষণ্ণ গলায় বুটির মা বলে— দোষ সব তো আমারই দাদাবাবু? মেয়ে পেটে ধরেছি তবু খেতে দিতে পারিনি. সে নোকটাও চলে গেলো, একন নোকের দুয়োরে দুয়োরে মেয়েকে পাটাতে হচ্চে। তবু কী এমন দোষ করেচি যে এই রেতের বেলায় মেয়েকে নিয়ে ঘুরছি, কিন্তু দেকুন, মেয়ের কী কিচু ভাবনা আচে? ওর একন চাকরি চাই—

ওসব কথা এখন থাক বুটির মা। এখন বলো আমার কাছে কী জন্যে এসেছো?

আপনি যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিন—

কী ব্যবস্থা আমি করতে পারি বলো?

এখানেই আটকে যায় বুটির মা। বুটি ওকে বলেছে, পাড়ায় দু-একজনও সায় দিয়েছে, সে নিজেও মনে ভেবেছিল যে দাদাবাবুর কাছে গেলে উপায় একটা কিছু হবে, তবু সেটা যে ঠিক কী তা সে হিসাব করে আসেনি। বিপদে পড়লে মানুষ বড়োর কাছে ছোটে—ছোটা উচিত শুধু তাই সে জানে—

তাকে নিরুত্তর দেখে সুহাস বলে— আমাকে কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ওপরে যেতে হবে বুটির মা—

আর ঠিক তখনই যেন মনে পড়ে গেছে—এ ভাবে বলে ওঠে বুটির মা— আপনি কেষ্টকে ডেকে একটু ধমক দিয়ে দিন, তালেই কাজ হবে—

ধমক? সুহাস অবাক হয়ে বলে— আমার ধমকও শুনবে কেন?

আপনার কথা ও ঠিক শুনবে দাদাবাবু—ওর মা তো আপনাদের বাড়িতে কাজ করতো। মায়ের সঙ্গে ও কত্তোবার এ বাড়িতে এয়েচে।

আমাদের বাড়িতে কাজ করতো ওর মা?

হ্যাঁ, আমি আসার আগে ওইতো ছিলো আপনাদের বাড়িতে।

তারপর সে আরও বিস্তারিত বুঝিয়ে মনে পড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু মনে সুহাসের পড়ে না। ঠিকে-ঝি বাড়িতে আসে, যায়। সুস্মিতার সঙ্গেই দরকার তাদের। সুহাস শুধু ছাখে। তারা চলে গেলে আর দেখা পায় না, প্রশ্নও করে না। ছাখে নতুন লোকটাকে। তারপর এই সময় ভুলেই যায় সেই পুরনো মানুষটাকে। শুধু কোন বিশেষ ঘটনা কাউকে নিয়ে ঘটলে তাকে হয়তো মনে থেকে যায়—যেমন বুটির মা-কে মনে আছে সেই ব্যাগ-কুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা থেকে।

কিন্তু কেষ্টর মা-কে নিয়ে এখন আর ভাবতেও চায় না সুহাস—ওর তাড়াতাড়ি এখন ওপরে ওঠা দরকার। তবু এখনকার ব্যাপারটাকে উপস্থিত মেটানোর জন্য বলে—আজকের মতো বস্তির কোনো মাথা লোককে দিয়ে বলিয়ে দাও কেষ্টকে, নাহলে আমারই নাম করে বোলো। তারপর কাল যা হয় দেখা যাবে।

মাথা নোক তো সুরেনদা ছিলো, কোতায় যে গিয়েচে, সন্ধের মধ্যে ফেরার কতা ছিলো, একন এয়েচে কি না কে জানে?

না যদি এসে থাকে তাহলে আজকের মতো তোমার কোনো চেনা লোকের কাছে রেখে দাও, কাল আমি দেখবো—

ককোন আসবো? সকালে?

না-না, সকালে নয়, তোমাকেও আসতে হবে না, কাল বিকেলে আফিস থেকে ফেরার পরে আমি নিজেই তোমাদের বস্তিতে যাবো—

আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো দাদাবাবু—

ঠিক আছে। সে কাল দেখা যাবে— সুহাস বলে। তাপর সে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করে। পিছন থেকে শুনতে পায়— টালিগঞ্জে আমার ভাই আচে, মেয়েকে সেকানেই রেখে এসি দাদাবাবু?

সে তো খুব ভালো হয়— সুহাস শেষ কথা বলে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেলের সুইচে সে চাপ দেয়। বুটিদের কাছ থেকে দ্রুত সরে আসতে চেয়েছিল, চলে এসেছে, তারাও চলে গিয়েছে, তবু তাদেরই কথা ভাবছে এখনো সুহাস—কী অদ্ভুত সব ব্যাপার। বিপদ ওদের কম নয় সুহাসের থেকে—শুধু অন্য রকম। কিন্তু বুটি? সুহাস ভেবে পায় না

কিছুতেই—হুট্‌ কি করে এরকম করল ? তখনই আবার মনে পড়ে তার বলা সেই কথাগুলো— কোথায় যে চলে যাচ্ছি আমরা।

বন্ধ দরজাটা খুলে দেয় সুস্মিতা। সুহাস ভিতরে ঢুকতেই সুস্মিতা বলে— তুমি তো অনেকক্ষণ ফিরেছো, এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?

সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়েছিলাম।

সিঁড়ির কাছে ?

হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে সেই যে কাজ করতো, মনে আছে ? আমার সেই—

ওরা তো অনেকক্ষণ আগে এসেছিল।

তা হতে পারে, বললও বটে সেইরকম—

তোমাকে খুঁজছিল, আমি কত জিগ্যেস করলাম, আমাকে তো কিছুই বললো না।

সুস্মিতার কথার সুরে বিরক্তির সুর শুনে সুহাস নিরুত্তরে তার জুতোর ফিতে খুলতে সুরু করে।

ওরা কী জন্যে এসেছিল শুনতে পারি কী ?

প্রসঙ্গটা সুহাসের ভালো লাগছে না, আর যা শুনেছে তা সব সুস্মিতাকে বলাও যায় না, তাই শুধু বলে— ও-সব বস্তির ব্যাপার, তোমার ভালো লাগবে না শুনতে—

তোমার তো বেশ ভাল লাগে দেখছি— কথাটা শেষ করার আগেই সুস্মিতা ছেলেদের ঘরের দিকে দ্রুত চলতে সুরু করেছে। সুহাস একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকায়। কিন্তু সুস্মিতা ফিরে আসছে আবার কাছে এসে সে বলে— তোমার সঙ্গে দোকানে যাবো ভেবেছিলাম, অথচ তুমি তো এলেই না। এটা জানতে পারি কী এতো দেরি কেন অফিস থেকে ফিরতে ?

খুবই জরুরী একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম—

সুস্মিতা স্থির চোখে সুহাসের মুখের দিকে তাকায়। ঠোঁটের কোনদুটো এক অদ্ভুত হাসিতে বেঁকিয়ে বলে— তোমার মুখে মদের গন্ধে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ব্যাপারটা খুবই জরুরী ছিলো—

শুধু দু-চুমুক হুইস্কী সুহাস তার ঠোঁটের কাছে ঠেকিয়েছে। মুখে তাতে গন্ধ হওয়ার কথা নয়। দত্তর গেলাস ছিটকে অবশ্য ওর প্যান্টে একটু পড়েছিল। সেই কথাটা সুস্মিতাকে বলতে সে পারতো। কিন্তু কোনো লাভ নেই ও-সব কথা বলে। আর কথা না বাড়িয়ে সে ঘরের মধ্যে চলে যায়।

সুস্মিতা সেখানেই দাঁড়িয়ে সুহাসের হাঁটার দিকে লক্ষ্য করে ভাবে। সে দেখতে পায় সুহাসের পা-দুটো বেশ যেন টলছে।

স্নানের ঘরে শাওয়ারের ধারা-স্নানে সুহাস শীতল হওয়ার চেষ্টা করছিল। ঠাণ্ডা একটু পড়েছে। জলটাও বেশ ঠাণ্ডা। তবু মাথার উত্তাপ তাতে কমছে না। সুস্মিতার কথার জবাব না দিয়ে সে ভালই করেছে আজ। উত্তর অবশ্য দেবে একদিন—হয়তো কাল। হয়তো অন্য কোনোদিন। আজ নয়!

॥ তেরো ॥

স্নানের শেষে চায়ের কাপটা খালি করে সুহাস আলো নিভিয়ে বিছানায় শোবার কথা ভাবছে, সুস্মিতা ঘরে ঢুকে বিরক্তভাবে বলে— আবার একজন ডাকতে এসেছে তোমায়।

কে?

কে জানে! ওদিকের ওই গলির মধ্যে থাকেন মনে হয়—একজন মহিলা। ওই সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

সিঁড়ির নিচে? কেন, ওপরে ডেকে আনলেই পারতে।

তা উনি আসবেন না। সিঁড়ির নিচে ওই অন্ধকারটায় কী যেন আছে, ওটা পার হয়ে কেউ ওপরে আর উঠতেই চায় না।

সুহাস রবারের চটি জোড়া পায়ে লাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে সেখানে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখামাত্রই দারুণ চমকে ওঠে—টুনুর মা—সত্যসন্ধবাবুর স্ত্রী।

একী! কাকীমা আপনি?

হ্যাঁ, তোমার কাছে আমাকেই আসতে হলো সুহাস।

সুহাসের চমকে ওঠা এতক্ষণে ভয়ের চেহারা নিয়েছে—এ নিশ্চয়ই টুনুর ব্যাপার! না হলে এই রাত্রে উনি আসবেন কেন? সুহাসদের বাড়িতে তো আসেনও না কোনদিন। কিন্তু—? টুনু কী তবে ওর নামে মিথ্যে কথা কিছু বলেছে?

তুমি একটু আমাদের বাড়িতে এসো সুহাস।

সুহাস এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়ে বলে— কী ব্যাপার কাকীমা ?

খুবই বিপদে পড়ে আমি তোমার কাছে এসেছি—

বিপদ ? কি বিপদ কাকীমা ?

তুমি এসো, সব বলবো—

এখানেই বলতে পারেন না কাকীমা— সে মৃদু অনুনয়ের সুরে বলে। টুনুর সামনে সে যেতে চায় না আর। বিছানায় শুয়ে তার নিজের কথাও ভাবতে হবে—সময়ের আজ বড়োই অভাব সুহাসের।

না সুহাস, এখানে বলা যাবে না, তুমি আমাদের বাড়িতে একটু এসো।

সুহাসের নিজের ইচ্ছার আজ কোন দাম নেই—সে নিরুপায়ের মতো শুধু ঘটনার স্রোতে ভাসছে। ভাসতেই হবে যতোক্ষণ না ছাড়া পায়। সে বলে— আচ্ছা, আপনি বাড়িতে যান কাকীমা, আমি জামাটা পরেই চলে আসছি।

খুব তাড়াতাড়ি এসো সুহাস, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো—

বলতে বলতে দ্রুতপায়ে তিনি বের হয়ে যান সুহাসকে এক অথৈ ভাবনার মধ্যে ফেলে—ব্যাপারটা যে টুনুকে জড়িয়ে তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু বিপদ। কী বিপদ ?

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকামাত্র তাকে সুস্মিতার সামনাসামনি পড়তে হয়। আলনার থেকে সার্ট নিতে দেখে সে সুহাসের দিকে তার বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে বলে— এখন আবার সার্ট পরছো যে ? কোথাও বেরোবে নাকি ?

হ্যাঁ, উনি ডাকতে এসেছিলেন। ওঁদের বাড়িতে একটু যেতে হবে।

ওঁদের বাড়িতে ? এখন ?—বলতে বলতে গলার স্বরটা আরও চড়া পর্দায় ওঠে সুস্মিতার— এই অবস্থায় তুমি নিচে গিয়ে একজন মহিলার সঙ্গে কথা বললে। আবার তাঁদের বাড়িতেও যাচ্ছো—তোমার কী খেয়াল আছে যে— ?

কী অবস্থার কথা তুমি বলতে চাইছো সুস্মিতা ? কী খেয়াল থাকার কথা বলছো ?

সুস্মিতার মুখের ভাবটা বদলে যায়—ঠোঁটের কোণে এক ঝিলিক হাসি ফুটে ওঠে— তোমার মুখে ওই গন্ধের ব্যাপারে মদ শব্দটা বার বার উচ্চারণ না করে একটু না হয় অন্য ভাবেই বললাম।

সুহাসের খেয়াল ছিল না যে একটু আগেই সুস্মিতা সে কথাটা বলেছে যার উত্তর ও আজ দিতে চায়নি—মনে পড়ে. সেকথাও, তবু এবারে একটা ক্ষীণ অভিযোগে অল্প একটু প্রতিবাদ মিশিয়ে সে বলে— গন্ধটা মুখে ছিলো না, এখনও

নেই সুস্মিতা, আছে প্যান্টের ডান পায়ে হাঁটুর কাছাকাছি জায়গায়—বিশ্বাস না হয় তো প্যান্টই তুলে একবার পরীক্ষা করে ছাখো—

তার মানে ? মদ তুমি খাওনি অথচ তাতেই প্যান্ট ভিজিয়ে এনেছো ?

হ্যাঁ, প্রায় ও-রকমই একটা ব্যাপার ঘটেছিল যা আমার ইচ্ছায় হয়নি, আমার কিছু করারও ছিল না তাতে—

সুস্মিতা সুহাসের মুখের দিকে স্থির চোখে একটু তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে— বেশ, সেকথা বলতে যদি না চাও আমিও জোর করবো না, কিন্তু ওই গলির ভদ্রমহিলা কেন এসেছিলেন সেটা শুনতে পারি কী ? না কি তাতেও আপত্তি আছে ?

এই প্রশ্নটার সামনে সুহাস হঠাৎ থতোমতো হয়ে বলে—

উনি ডাকতে এসেছিলেন, বললেন— কী যেন বিপদ হয়েছে ওঁদের—

সুস্মিতা মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, বলে— একদল এক্ষুণি গেল, আবার এখন একজন। শুধু আমার সঙ্গে শপিংয়ে যাওয়ার সময় যতোসব জরুরী কাজ পড়ে যায় তোমার—

একথার উত্তর দিতে গেলে কথা আরও বাড়বে। টুনুর মা-কে সে বলেছে এক্ষুণি যাচ্ছি, অথচ তা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, তাই প্রসঙ্গ ছোট করতে সে বলে— ব্যাপারটা কী তা দেখে আমি এক্ষুণি চলে আসছি সুস্মিতা—

এখনই আসো, আর দেরিই করো, রান্না যে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেটা তোমায় জানিয়ে রাখছি।

সত্যসন্ধবাবুর বাড়ির কাছে এসে সুহাস একটু অবাক হলো দেখে যে কাকীমা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারই অপেক্ষায়—কিন্তু বারান্দায় নয়, সিঁড়িতেও নয়, সিঁড়ির পাশে সরু প্যাসেজের দরজাটা খুলে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। আর কী যেন রহস্যের ব্যাপার—সুহাসকে ইসারা করে প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলে উঠলেন— এই দিকে। আমার পিছন পিছন এসো। খুব আস্তে। দেখো, শব্দ না হয়—

সুহাস কোনদিন এই গলি দিয়ে হাঁটেনি—এ দরজাটা খোলাও ছাখেনি কখনও। সে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকতো। ঘরের পিছন দিকেও একটা বারান্দা আছে। তার নিচে উঠোন। ও সব জায়গা তার কতো

চেনা! তবু এই গলিটা যে ছাখেও নি কোনদিন। এখন আধো-অন্ধকারের মধ্যে দেখছে—বাড়ির সব পরিত্যক্ত জিনিসগুলো এখানে পাঁচিলের গায়ে ডাঁই করে রাখা—ভাঙা চেয়ার, পুরণো বাঁশ, পায়া-ভাঙা খাটিয়া, পচা ক্যানস্তরার টিন—এমনি কতো জিনিষ। ওইসবের মধ্যে দিয়ে সাবধানেই সে হাঁট্‌ছিল, তবু হঠাৎ কী-একটায় পায়ের ধাক্কা লেগে সেটা উল্টে যাচ্ছিল, দ্রুতহাতে সেটাকে ধরে ফেলে স্থহাস দেখল একটা ভাঙা বালতির উন্থনের ওপরে বসানো এটা এক পুরনো দেয়াল ঘড়ি—এ কী সেই ঘড়িটাই যেটা সেকালে দরজার মাথায় টাঙানো থাকতো—সত্যসন্ধবাবু বলতেন— খুব ভালো ঘড়ি। একালে এমন জিনিষ আর তৈরিই হয় না স্থহাস।

হয়তো স্থহাস ওই কথা নিয়ে আরও কিছু ভাবতো। ভাল করে লক্ষ্য করলে সে ওখানে তার আরো অনেক চেনা বস্তু দেখতে পেতো—এ বাড়ির সমস্ত দৈন্যের ঘোমটা-খোলা মুখটা দেখে সে চমকেও উঠতো, কিন্তু তার বদলে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল আরেকটা কটা ভেবে। টুনুর মায়ের কাছে প্রথমে বিপদের কথা শুনে সে যে ভয়টা পেয়েছিল তার থেকে অনেক আলাদা। তখন তো মনেই হয়নি এ কথা—গলির মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে তার হঠাৎ মনে হলো—কী বিপদ হয়েছে এদের? অন্ধকার এই গলিটার পাশে যে ঘরে সত্যসন্ধবাবু থাকতেন, সেখানে কোনো আলো নেই। শব্দ নেই। সামনের বারান্দাও অন্ধকার—সে আসার সময় দেখেছে। উঠোনের দিকেও তো কোন আলোর চিহ্ন দেখা যায় না। তবে কী হয়েছে এদের যে সব আলো নিভিয়ে রেখেছে এরা? আর সেই অন্ধকারের একটা শুঁড়িপথ দিয়ে স্থহাসকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—কোথায়? কী জন্যে ওকে নিয়ে যাচ্ছেন কাকীমা?

তবে কী এদের বিপদটা সেই রকম— যা ওর মনে আসছে? তা হলে স্থহাসই বা বোকার মতো তার মধ্যে নিজেকে জড়াতে যাচ্ছে কেন?

সমস্ত বাড়িটা যেন মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। ঠিক তেমনিই অন্ধকার।

স্থহাস ততোক্ষণে উঠোনের মধ্যে পৌঁছেছিল। কাকীমা ফিস্‌ফিস্ করে বললেন— তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি।

বলে, তিনি সত্যসন্ধবাবুর ঘরের দরজা শব্দহীন খুলে ভিতরে চলে গেলেন। তাঁর পিছনে সেটা বন্ধও হয়ে গেল। স্থহাস দাঁড়িয়ে থাকল সেই উঠোনের মাঝখানে—

তারপর যেন এক অন্তহীন সময় পার হয়ে গেছে— সুহাস দাঁড়িয়েই আছে। দেখছে—উঠোনের ওপর বারান্দাটার এক জায়গায় পাশের বাড়ি থেকে জানালা-গলা এক-টুকরো আলো কী-একটা শাদামতো বস্তুর ওপরে পড়েছে। ওটা কী— ? ওই আলো-পড়া জিনিষটা ? কাকীমা তো ঘরের মধ্যে গিয়েছেন— বেরিয়েও আসছেন না আর! কিন্তু এ-বাড়ির অন্য সব মানুষগুলো কোথায় ?

সুহাস চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। এখনও কি তার উচিত এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ? কী করবে সে— যে শুঁড়িপথে এখানে এসেছে তা দিয়েই নিঃশব্দে ফিরে যাবে আবার ?

আর একটু পরে সুহাস যখন চলে আসার জন্য পিছনের দিকে ঘুরছে তখনই দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ। কাকীমাও বেরিয়ে এসেছেন— এক হাতে একটা জ্বালানো কেরসিনের কুপি, অন্য হাতে একটা কাঠের পিঁড়ি। সেদিকে দেখামাত্র সুহাসের চড়া-টান স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে আসে— কতোক্ষণের বন্ধ নিঃশ্বাস যেন ছাড়া পেল হঠাৎ— কাকীমার হাতের পিঁড়িতে এক শব্দহীন অভ্যর্থনার ভাষা। কুপি এ-সব ঘটনার বাইরের অন্য কথা বলছে।

বারান্দা থেকে নেমে এসে তিনি এদিকে ওদিকে দেখছেন। উঠোনের একদিক থেকে অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে শেষে বারান্দার দূর প্রান্তে এগিয়ে গেলেন। বোঝা যায়, পিঁড়িটা পাতবার মতো জায়গা তিনি খুঁজছেন। তারপরে যেন বারান্দাটাও পছন্দ নয়—সুহাসের কাছে এগিয়ে এসে আগেকার মতোই ফিসফিস করে বলেন— ওঁর ঘুম বড্ডো পাৎলা, চলো রান্নাঘরেই বসবে।

কাকীমার পিছন পিছন সে এগিয়ে যায়। এই টালির-ছাউনী রান্নাঘরও সুহাসের চেনা। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে একবার ওখানে একটা বেতের মোড়ায় বসে কড়াই থেকে তোলা গরম বেগুনীভাজা খেয়েছিল—সে আর সত্যসন্ধবাবু দুজনে।

সিমেন্ট-ভাঙা মেঝের ওপরে পাতা পিঁড়িটার ওপরে বসে সামনে কেরসিনের কুপিটার অল্প আলো-পড়া কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই দিনটার কথা ভাবছিল সুহাস— ছোট্ট একটা মেয়ে কাকাবাবুর কোলের ওপর বসে গরম বেগুনীতে হাত দিয়েই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে— সে টুনু। আজ যাকে সে মিঃ দত্তের ঘরে দেখে এসেছে।

কুপির আলোটা তার সামনের একটুখানি জায়গা ছাড়া বাকী সবই যেন আরও বেশি অন্ধকার করে রেখেছে। সুহাস চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে নিল।

ইলেকট্রিক কেটে দিয়ে গেছে সুহাস— একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাকীমা বলেন।

এটা, সুহাস বুঝতেই পেরেছিল। সে বুঝেছিল আরও অনেক কথা। টুনুকে সে তো আজ দেখেই এসেছে। কিন্তু তার কথাটা কাকীমা কতোক্ষণে তুলবেন? যদিও কাকীমা এখনো তার নাম একবারও উচ্চারণ করেন নি তবু সেজন্যই তো ডেকে এনেছেন সুহাসকে। আর, কামীমা যে বিপদের কথা বলেছেন— কী সেটা?

তুমি কতোদিন আমাদের বাড়িতে আসো না সুহাস। উনি তোমাকে কতো ভালবাসতেন, এখনও তোমার কথা মাঝে মাঝেই বলেন, আজ সকালেও বলছিলেন—

সুহাস মনে মনে অধীর হয়ে ওঠে— আসল কথাটা কখন উনি বলবেন?

আমাদের যে কী করে দিন চলে সুহাস।

এমনি আরও কথা কাকীমা বলছেন। শেষে সুহাসই এক সময় বলে ওঠে— টুনুকে তো দেখছি না কাকীমা।

টুনু—

শুধু এইটুকু বলে তিনি থেমে গেছেন। সুহাস তাঁর মুখের দিকে তাকায়— সেই অল্প আলোর মধ্যেও কাকীমার মুখটায় যেন অরণ্যের অন্ধকার। তিনি সুহাসের দৃষ্টি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

সুহাস আবার বলে— টুনু বাড়ি ফিরেছে কাকীমা?

এতক্ষণে তিনি আবার কথা বলছেন— ও মেয়ে মরলেই ভালো ছিলো সুহাস।

আবার একটু সময়ের স্তব্ধতা। কাকীমা আরও কি যেন বলতে চেষ্টা করছেন। সুহাস শোনার অপেক্ষায় আছে। শেষে হঠাৎ বলে ওঠেন তিনি— জানো সুহাস— টুনু তিন মাসের পোয়াতি। তোমারই চেনা কে যেন একজন—

আরও কী যেন তিনি বলছিলেন— কিন্তু সুহাসের সামনে পৃথিবীটা দুলতে সুরু করেছে। দুলতে দুলতে এই রান্নাঘরটা যেন সেই হোটেলের ঘরের মধ্যে মিশে গেল— মিঃ দত্ত টুনু অতনু বাসু-সাহেব— সুহাসও। সবাই সেখানে একসঙ্গে মিলে মিশে এক অন্ধকার বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে— সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে—শুধু সেই জোড়া-খাটের বিছানাটা স্থির হয়ে আছে—টুনু মা হয়ে গিয়েছে।

দুলতে দুলতে সব একসময় আবার স্থির হয়ে আসে। সুহাসের মনে পড়ে

দত্তর বলা সেই তৃতীয় সিঁড়ির কথাটা। তা দিয়ে দ্রুত ওঠা যায়— টুনুও উঠতে চেয়েছিল— কেরসিনের কুপি-জ্বলা এ-বাড়ির অন্ধকার ঘর থেকে অনেক উঁচুতে ছতলায় সেই উজ্জ্বল আলোর ঘরে সে পৌঁছেও ছিল। তবু হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়েছে সে— ফুটপাথের ওপরে তালগোল পাকানো রক্তাক্ত এক মৃতদেহে নয়— সব মালটিস্টোরিড্ বাড়ির নিচে যে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড বেসমেণ্ট থাকে তারই অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে টুনু।

টুনুকে আজ ওই ছ-তলার ঘরে দেখার পরে সে অনেক কিছু ভেবেছিল, কিন্তু এই সম্ভাবনার কথাটা একবারও মনে হয়নি সুহাসের।

সুহাস একটু একটু করে কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে। টুনুর ব্যাপারটা একটু ভেবে নিয়ে সে বলে— কিন্তু আমাকে এর জন্যে কেন ডেকেছেন কাকীমা? আমি কী আর করতে পারি বলুন?

তুমি ছাড়া আর কে করতে পারে বাবা?

সুহাস একটু অবাক হয়ে বলে— আমি। আমি এর কী করবো কাকীমা?

তোমার যখন চেনা লোক! তুমি ছাড়া আর কে পারবে? আর, আমাদের আছেই বা কে? আমি তো মেয়েমানুষ। ছেলেটা তো মানুষই নয়! আর তোমার কাকাবাবুর যা শরীরের অবস্থা—একথা শুনলে হয়তো মরেই যাবেন—

কাকীমা যা বলেছেন সবই হয়তো ঠিক, তবু সুহাস ভেবে পায়না এই ঘটনার মধ্যে সে কী করে জড়াবে? তা ছাড়া দত্ত আর বাসু-সাহেবকে নিয়ে সে নিজে আজ যে সমস্যায় পড়েছে তার যে জটিলতা সেখানে এই ব্যাপারটাও কি করে জুড়ে দেবে তা কিছুতেই ওর মাথায় আসছে না।

সুহাস, বাবা, তুমি আমাদের বাঁচাও—

ম্লান বিষন্ন গলায় বলে— কাকীমা সব কথা আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না, কিন্তু জানেন, বিশ্বাস করুন কাকীমা! যে এ-ব্যাপারে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়। বন্ধ দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে, আর তখনই দেখতে পায় টুনু ওই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে— এতক্ষণ যেন ওখানে দাঁড়িয়ে সে সুহাসদের কথা শুনেছিল, এখন সুহাস হঠাৎ বেরিয়ে আসতে সরে যাবার সময় পায়নি।

সুহাস ভেবেছিল এবারে টুনু সরে যাবে। কিন্তু সে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে

সুহাসের মুখের দিকে চেয়ে আছে। কী অদ্ভুত এক দৃষ্টি তার চোখের মধ্যে। এ সেই টুনু নয়—যেন অন্য আরেকজন। মানুষও নয় যেন—দেয়ালে আঁকা এক মানুষীর ছবিই শুধু তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে অন্ধকার এক দেয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে। অনেক ঝড়-বাদল তার ওপরে ছোপ ফেলে গেছে।

সুহাসের চোখের সামনে টুনুর পিছনেও এক অন্ধকার দেয়াল। সুহাস মুখ ফিরিয়ে নিল তার দিক থেকে। তখনই কাকীমা সুহাসের একটা হাত দু-হাতে ধরে বললেন— তুমি ওকে বাঁচাও সুহাস। তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে—

সুহাসের কোন্ অবচেতন যেন সেই মুহূর্তে হঠাৎ জেগে উঠে তারই মুখ দিয়ে বলে উঠল— কাল আমি দেখবো কাকীমা। যদি কিছু করতে পারি।

সুহাস আর কোনদিকে তাকালো না। দ্রুতপায়ে সেই ভাঙা জিনিষগুলোর স্তূপকে একপাশে রেখে চলতে লাগল কোনকিছুতে না হোঁচট খেয়ে, আর কিছু না উল্টে দিয়ে—যেন কতো দিনের চেনা-পথে সে হাঁটছে। দরজা দিয়ে বের হয়ে একবারও পিছনে না তাকিয়ে গলিটুকু পার হয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছোল।

সে বলে এসেছে— যদি আমি কিছু করতে পারি—কিন্তু কী করতে পারবে সে? পারা অবশ্য অনেক কিছুই যায়—শুধু একটু মরিয়া হওয়া দরকার। তা কী হতে পারবে সে? হওয়াই উচিত। কিন্তু—

সুহাস সেই ঘোরের মধ্যে হাঁটছিল রাস্তা দিয়ে যেখানে অনেক মানুষ পুজোর বাজার সেরে বাড়ির দিকে ফিরছে। হঠাৎ কাঁধে ঝাঁকি খেয়ে থেমে দাঁড়ায় সে—কে যেন ওকে থামিয়ে বলছে— কী রে। পাশ কাটিয়ে যে চলে যাচ্ছিস বড়ো?

মুখ ঘুরিয়ে দেখে সুহাস বলে— তুই?

হাঁ, কেমন আছিস বল?

ভালো, তুই?

ভালোই আছি। ওঃ, তোর সঙ্গে কতোদিন পরে দেখা।—সুহাসের ছেলেবেলার বন্ধু রঞ্জিৎ বলছিল— এতো কাছে থাকি অথচ দেখাই হয় না। একদিন আয় না আমাদের বাড়ি তোর গিন্নীকে নিয়ে।

তুই-ই আয় না কেন।

ঠিক আছে, এই রবিবারে বিকেলের দিকে আসবো, থাকবি তো বাড়িতে ?

থাকবো, আসিস— সুহাস বলে।

তোর গিন্নী আর বাচ্চারা সবাই ভালো আছে তো ?

হ্যাঁ, ভালোই আছে—

চাকরি তো ওখানেই করছিস ?

কোথায় আর যাবো বল্, আছি একই জায়গায়।

সেই পোস্টেই আছিস তো ?

হ্যাঁ, আর প্রোমোশন এখনও হয় নি—

মানে, খুব পিটিয়ে যাচ্ছিস, না ?

তার মানে ?

রঞ্জিৎ একটু মুচকি হেসে বলে— পারচেজ্-অফিসার। ওই পোস্টটা যে খুব ভালো তা আমরা জানি সুহাস। আর শুধু ব্যাংকে নয়— এখানেও বেশ জমছে—

সুহাসের পেটের ওপর দুটো আঙুল দিয়ে মাংসের স্তরটা ধরার চেষ্টা করে রঞ্জিৎ। সুহাস তার হাতটা ঠেলে দিয়ে আবার হাঁটতে সুরু করে। শুনতে পায়, পিছন থেকে রঞ্জিৎ বলছে— রবিবার বিকেলে আসবো। দেখিস কোথাও আবার বেরিয়ে পড়িস না যেন—

সুহাস বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছে। বারান্দায় ওঠার আগেই দেখতে পায় ওখানে এতক্ষণে একদল মানুষ এসে গিয়েছে—তাদের কেউবা শুয়ে পড়েছে, কেউ শোবার ব্যবস্থা করছে। এরা ভিখারীর দল। প্রতি বছর পুজোর আগে গ্রাম থেকে যে-সব নিরন্ন মানুষ কলকাতার পথে পথে কিছুদিন ভিক্ষা করে খায়—রাতে বারান্দায় ফুটপাতে শুয়ে কাটায়, ভোর না হতেই আবার পথে বেরিয়ে পড়ে— সুহাসদের বারান্দায় তাদেরই একটা দল কদিন ধরে রাতে এসে শুচ্ছে তা জানে সে। রাত্তিরে উপরের বারান্দা থেকে তাদের ও ঘুমন্ত দেখেছে কয়েকদিন—আজ দেখল সামনা-সামনি। নারী পুরুষ বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশু— সব বয়সের মানুষ। দেখে বোঝা যায় এক-একটা পরিবারের সবাই এরা একসঙ্গে এসেছে—একই গ্রামের কাছাকাছি বাড়ির মানুষ বলে মনে হয়—

এই, বাবুর রাস্তা ছেড়ে দাও— কোণের দিক থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল। সুহাস তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। ত্রস্ত এক ব্যস্ততা দরজার সামনেটায়— নিমেষে খালি হয়ে গেল সেই জায়গাটা।

সুহাস দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে— শুনতে পেল কে একজন বলছে— দরজার মুখটা খালি রেখে দিও— রাস্তা অমন আটকে রেখো না বাবুদের—

সিঁড়ির কাছে এসে সে যখন দরজাটা বন্ধ করছে, তখনই আরেকটা পুরুষ গলার গম্ভীর শব্দ আসে—বৌমা, খোকাকে ভালো করে শোয়াও—

দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সুহাস সিঁড়ি দিয়ে দু-তলায় উঠে যায়।

॥ চোদ্দ ॥

এখন কটা বাজে? সুহাস ঘড়িটা ঘরের মধ্যে রেখে এসেছে, তবু অনুমানে মনে হয়— সুস্মিতার খাবার দেওয়ার সময় হিসাব করে যে, নটা পনেরো থেকে সাড়ে-নটার মধ্যেই কোনো এক সময় হবে। সোয়া-নটা সুস্মিতার আর্লি-ডিনার, সাড়ে-নটা একটুখানি লেট্। তারপর ঠিক আধঘণ্টা খাওয়ার সময়। খাওয়া শেষ হলে উপন্যাস বা গল্পের বই— এখন কিছুদিন পুজো সংখ্যা চলছে। রাত এগারোটায় সুস্মিতার শুতে যাওয়ার সময়?

খাওয়া শেষ হলে সুস্মিতা সুহাসকে আর একবার খাওয়ার তাড়া দেবে। সেই সময়টা পার করে দিতে পারলে সে এগারোটা পর্যন্ত সময় পাবে, এ-হিসাব সুহাসের জানা।

দু-তলার বারান্দায় বসে সুহাস আনমনে রাস্তার দিকে দেখছে। ভাবতে চেষ্টা করছে আজকের সব ব্যাপার—তাদের মধ্যে সে ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে? কী ও করতে পারে? কী করা উচিত।

নিজের প্রিনসিপল-এ শক্ত সে থাকবে। দত্তর একটা হাতের তাস সে দেখে নিয়েছে। উনি কোনোভাবে অন্য পার্টিদের কাছে পাঠানো চিঠিগুলোকে হাত করেছেন। সুহাসকে ফোন করতে বারণও করছিলেন তাদের। কিন্তু কেন? ফোন করলে তারা জেনে যাবে, না? উনি আরও বলেছেন যে সুহাস ফোন করলে আর একটা নতুন তাস খুলবেন। কি সেটা? হয়তো টেলিফোন-অপারেটরকেই হাত করে ফেলবেন। কাদের? সুহাসদের, না ওই দুটো কোম্পানীর? কে জানে! হয়তো দু-দিক দিয়েই তাঁর খেলাটা চলতে পারে।

কিন্তু সুহাস যদি নিজে গিয়ে জানিয়ে দেয়? অফিসে একটু দেরিতে

পৌঁছোবে তাহলে— কতোদিন এমনিই তো দেরি হয়ে যায়। অফিসে যাওয়ার পথে দু-জায়গায় গিয়ে দেখা করে মিঃ দত্ত তার বাসু-সাহেবের সব চাল সে উল্টে দিতে পারে।

কিন্তু তারপর ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? দত্তর আশাটা ফলবে না। তখন বাসু-সাহেবের জন্ম হোটেলের ঘরও তিনি আর খুলে দেবেন না নিশ্চয়। বাসু-সাহেব তাঁর আদিম ক্ষুধায় বঞ্চিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াবেন সুহাসের দিকে সব নখ-দাঁত একসঙ্গে বের করে—সভ্যতার সব মুখোস খুলে ফেলে।

সুহাসকে চলে যেতে হবে ম্যাড্রাসের অফিসে। চাকরিটা ছেড়ে দেবার তো কথাই ওঠে না। এই বাজারে একটা চাকরি ছেড়ে আরেকটা ভালো চাকরির আশা প্রায় নেই বললেই হয়।

প্রিনসিপল। তার জন্যে এই মূল্য দিতে তৈরি থাকতে হবে সুহাসকে। অথচ অন্য দিকে সে যদি দত্তর বাড়ানো হাতটা শুধু ধরে নেয়—তৃতীয় সিঁড়ি দিয়ে তাঁকে উঠতে দিয়ে নিজেও তাঁর সঙ্গে ওঠে, তাহলে কলকাতার একটা বাড়ি করার জমি। তারপর বাড়ি। কুন্তির জন্যে একটা চাকরি তো সঙ্গে সঙ্গেই হবে— অনুপ অবশ্য আর কোনদিন আসবে না। আর, টুনুর জন্য একটা ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে, বাসু-সাহেবকে না জানিয়ে শুধু দত্তকে ধরলেই ওর নিশ্চয় একটা উপায় হবে— সুহাস শুনেছে কলকাতায় সব মেয়েদের ডাক্তার এখন মোটা টাকায় এ-সব কাজ করেন। যদিও সুহাস নিজে তাদের কাউকে চেনে না, তবু দত্তর মতো একজন সচল মানুষ নিশ্চয় খুব সহজেই তার সব দিতে পারবেন।

মানে, আপাতত সুহাসদের সবাইকার সমস্যা এক রকম সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় সিঁড়ি একটু পিছল সিঁড়িও। সেখান থেকে আজ টুনুকে ও গড়িয়ে পড়তে দেখেছে—বেসমেন্টের অন্ধকার ডুবে সে এই পাড়ার একটা ছোট্ট বাড়ির মধ্যে এখন হয়তো বসে বসে কাঁদছে। সুহাসেরও অমনি হতে পারে যদি এই—অর্ডারের ব্যাপারটা নিয়ে কোন দিন প্রোব্ হয়। সেই জালে তাহলে সুহাস নিশ্চয় ধরা পড়বে— পড়বেন বাসু-সাহেবও, তবে উনি তো একটু বাইরে বাইরেই চলছেন, সুহাসের তৈরি স্টেটমেন্টের ওপরে যদিও তাঁর একটা সই থাকবে— তবু সুহাসই প্রথম। সে চুনো-পুঁটিও—জালে যারা সহজে পড়ে। বাসু-সাহেব রাঘব-বোয়াল— ওপর-তলার মানুষ। খুঁটিও খুব মজবুত তাঁর—সেই জোরে তিনি হয়তো রেহাই পাবেন, যা সুহাসের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভবে, শুধু সেই ভয়ে নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো দত্ত আর বাসু-সাহেবের সঙ্গে রফা করলে সুহাস নিজেকে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলবে। তৃতীয় সিঁড়ির আধো অন্ধকারে সুহাস যতো উঁচুতেই উঠুক, সেখানে নিজের কাছে আর সে কোন দিনই তার গর্বের মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এই বারান্দার ওদিকে একটা ঘরের মধ্যে এখন সুস্মিতা আর সুহাসের দুই ছেলেমেয়ে যে আহার থেকে তাদের দেহের পুষ্টি সংগ্রহ করছে, তারই মধ্যে সুহাসকে তাহলে অন্যায় আর পাপের ধারা বইয়ে দিতে হবে যা শরীরের মধ্যে নিয়ে একদিন ওরা দুজন বড়োও হয়ে উঠবে। সেদিন সব জানতে পেরে ওরা যদি সুহাসের কাছে কৈফিয়ৎ চায়? তাহলে কী উত্তর সে দেবে?

পাপ-পুণ্যে সুহাস ঠিক বিশ্বাস করে না—করে ন্যায় আর অন্যায়কে। আরও একটা বিশ্বাস তার আছে যে তাদেরও একটা ধারা আছে যা মানুষের জীবনে সংক্রামিত হয় রক্তধারা দিয়ে। শেষে তা বংশের মধ্যেও চলে যায়। সুহাসের ছেলে মেয়ে— ওরা বড়ো হবে। একদিন তাদেরও সন্তান আসবে এই পৃথিবীতে —সুহাসের বংশধর। ওর অন্যায়ের ধারা কতো পুরুষ ধরে যে তাদের রক্তের মধ্যে বইবে।

তাই সুহাস যদি একা হতো, তাহলে যা খুশি সে করতে পারতো! কিন্তু ওই দুটো শিশুর কথা ভেবে অন্তত তাকে অন্যভাবে চলতে হবে।

তাহলে ঠিক কোনটা করবে সুহাস? কী যে করতে পারে তা কিছুতেই তো ভেবে সে পাচ্ছে না! ওর এই মাথাটার মধ্যে এমন অলৌকিক কিছু বুদ্ধি নেই যা দিয়ে আজকের সব সমস্যার সমাধান সে করতে পারে।

কিন্তু সুস্মিতাকে সব খুলে বলতে পারলে হতো। ওর মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা। সুহাস অনেকবার দেখেছে কোনো জটিল সমস্যার মুখোমুখি সুস্মিতার মাথায় বেশ বুদ্ধি জুগিয়ে যায়।

তবু সুস্মিতাকে বলা চলবে না টুনুর জন্যে। সুহাসের সমস্যার সঙ্গে টুনু আজ এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যাতে তার কথা না তুলে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝানো কিছুতেই সম্ভব নয়। না, টুনুর ঘটনা সে কারও কাছে প্রকাশ করতে পারবে না—ওদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়ানো টুনুর সেই শেষ চাউনিটা তার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে।

আরও বলবে না অন্য এক কারণে। এখানে টাকার ব্যাপার রয়েছে। হঠাৎ টাকা—হঠাৎ লোভ। সুস্মিতা যদি সব শুনে সুহাসকে এমন পরামর্শ দিয়ে

বসে যাতে সে লোভের মধ্যে পড়ে অন্যায় করে ফ্যালে। তাই সুহাসকে তার নিজের পথটা নিজেই খুঁজে নিতে হবে।

কিন্তু, সে কোন্ পথ?

সুহাস আবার ভাবতে শুরু করে। প্রথম থেকে এক এক করে সমস্তটা ভেবে শেষে পৌঁছে সে আবার ভাবে— তাহলে ঠিক কোনটা ও করবে?

একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সুহাস বার বার ঠিক একই জায়গায় ফিরে আসছে। সব কিছু মিলে—সবাই একজোট হয়ে যেন ওকে এমন কোনঠাসা করেছে যে বেরিয়ে আসার কোনো পথই আর খোলা নেই। কোনোদিকে নেই।

সুহাস একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার দিকে তাকায়। কাল মহালয়া। পুজোর বাজার সেরে কতো মানুষ যে বাড়ির দিকে চলেছে। হাতে জামা-কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে কেউ চলেছে পায়ে হেঁটে, কেউবা রিকসায় চড়ে। এক একটা ট্যাকসিও মাঝে মাঝে। এক্ষুণি একটা প্রাইভেট-কার চলে গেল। খালি গায়ে, খালি পায়ে, খালি হাতে এক-একজন চলেছে। রঙীন উজ্জ্বল পোষাক অনেকের। হাসি আর কলরব। ভিখারীর চিৎকার— যাদের এখনও খাবার জোগাড় হয়নি, শোবার জায়গা হয় নি—

সুহাস নিজে এই দুতলার বারান্দায়। দত্ত কি এখনও সেই ছ-তলার ঘরটায় আছেন? টুনু তো ফিরে এসেছে ছ-তলা থেকে এ-পাড়ার ওই গলির মধ্যে অন্ধকার বাড়িটায়। হোটেলের সেই বিছানাটা— বাসু-সাহেব। কী নরম মোলায়েম স্নিগ্ধস্বরে না কথা বলেন বাসু-সাহেব। কে বিশ্বাস করবে যে তিনি—

তখনই সুহাসের চোখে পড়ল সামনের রাস্তায় পাড়ার ছেলেরা এসে জটলা করে দাঁড়িয়েছে। পুজোর ব্যাপার—ওরা ফেস্টুন টাঙাতে এসেছে— রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে টাঙিয়ে দেবে। একজনের হাতে একটা দড়ির বাণ্ডিল। বড়ো একটা মই দুজনে ধরে সামনের বাড়ির দেয়ালের গায়ে তুলে দিচ্ছে। ওপরের বারান্দার রেলিংয়ে একটা দিক বেঁধে আরেকদিক নিশ্চয় সুহাসদের বাড়ির সামনের লাইটপোস্টে বেঁধে দেবে—

হঠাৎ সুহাসের আর একটা রাতের কথা মনে পড়ে গেল— সেদিন গভীর রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে আরেকদল ছেলে ঠিক ওই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল— হাতে মই, মাটির হাঁড়ি— মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সুহাস সেদিন এই বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসেছিল—তখনই এসেছিল সেই ছেলেগুলো। আলো নিভে যাওয়া পথের মধ্যে এতো রাত্তিরে ওরা কী করতে এসেছে? সুহাস ভয়

পেয়েছিল। মাথাটা একটু সরিয়ে নিয়েছিল ভিতরের দিকে— তবু সে দেখেছিল —নিঃশব্দে মই দিয়ে উঠে দু-জন দেয়ালের গায়ে লিখতে সুরু করল মাটির হাঁড়িটা থেকে কী যেন তুলে তুলে। ওরা দেয়াল লিপি লিখছে— সুহাস বুঝতে পারল—

আস্তে আস্তে মাথাটা আরও দূরে সরিয়ে নিয়েছিল সুহাস—বোমা গুলি আর ছুরির সময় চলছে— কিছু দেখা ভালো নয়। জানা ভালো নয়। বিছানায় ফিরে এসে সুহাস সেদিন অনেকক্ষণ সেই অন্ধকারে-দেখা ছেলেগুলোর কথা ভেবেছিল—নিশ্চয়ই এ-পাড়ার ছেলে ওরা। পাড়ার সব দেয়াল যারা লেখায়-লেখায় শ্লোগ্যানে-শ্লোগ্যানে ভরিয়ে দিয়েছে— ওরা কারা? কোন কোন ছেলে ওদের মধ্যে আছে?

কিন্তু আর বেশি সে ভাবতে চায়নি— এখন কাউকে চেনা ভালো নয়— তার মনে হয়েছিল।

সেই রাতটা ভোর হতে সুহাস আবার বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখেছিল, নতুন কয়েকটা শ্লোগ্যান লেখা হয়েছে দেয়ালের খালি জায়গায় প্রায় সবটা ভরে দিয়ে। আর, নিচের দিকে একটা ছোট্ট কবিতা ছোট ছোট অক্ষরে—

অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার খুলবোই মোরা খুলবোই
নতুন দিনের সূর্যের আলো আনবোই মোরা আনবোই

তাহলে কী ওদের মধ্যে একটি কবিও আছে?—সুহাস অবাক হয়ে ভেবেছিল। কবিতাটা তার খুব ভালো লেগেছিল একথা ভেবে যে এতো যে বোমা বারুদ গুলি আর রক্তের সময় চলেছে—তার মধ্যে এই কিশোর কবি হয়তো কোন একদিন তার নিজের ভাষায় কথা বলবে— যখন সে বড়ো হবে—

কিন্তু, ততোদিন পর্যন্ত বেঁচে সে থাকবে তো? পার হতে পারবে কী এই রক্তের সময়টা?

সেই ছেলেটিকে সে খুঁজেছিল মনে মনে। তাকে চিনতে চেয়েছিল—দেখতে চেয়েছিল— পাড়ার সব ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকেই খুঁজতো সুহাস —ওদের মধ্যে কে সেই কবি? কিন্তু খুঁজে সে পায়নি। আরও বুঝেছিল সুহাস যে শুধু মুখ দেখে কোনো কবি চেনা যায় না— আর, কিশোর বয়সী সব ছেলেদের চোখে-মুখে তো একই রকম কোমলতা—

সেই ছেলেটির কথা আজ আবার মনে পড়ছে সুহাসের— সে কী বেঁচে

আছে আজও ? খুব সম্ভব নয়। ওদের অনেকেই আজ নেই। অনেক বড়ো শপথ করে, শেষে সব ফেলে রেখে তারা এমন জায়গায় চলে গিয়েছে যেখানে যাওয়া চলে, কিন্তু ফেরা আর যায় না।

বাসু-সাহেবদের হাতে ওরা পৃথিবীটাকে ছেড়ে দিয়ে গেল।

ছেলেদের ফেস্টুন টাঙানো শেষ হয়ে গেছে। এখানে টিউব-লাইটের সারি লাগানো হবে, আলোর মালা টাঙাতে হবে— এইসব কথা বলতে বলতে চলে গেল তারা। সুহাস আবার ফিরে এল তার আজকের ভাবনায়— বাসু-সাহেব দত্ত টুনু সুহাস সুস্মিতা সুহাসের দুই ছেলে মেয়ে—

সুহাস ভাবতেই থাকে—

হঠাৎ সুহাসের সব চিন্তা ভেদ করে কানে একটা শব্দ এসে লাগে— কি রে ভালো আছিস ?

রাস্তার দিকে কে যেন চিৎকার করে কাউকে বলছে। সুহাস সেদিকে ফিরে তাকালো। দেখতে পেলো একটা রোগা কালোমত প্যান্ট পরা ছেলে বলছে— তোকে অনেকদিন দেখিনি।

আর একটা ছেলে— প্রায় একই রকমের চেহারা— তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে উত্তর দিল—হ্যাঁ, খুব ভালো আছি। তুই কেমন আছিস বল ?

আমি আর কবে খারাপ থাকি রে ? —প্রথম ছেলেটি বলে।

তারপর ওরা কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সুরু করেছে। সুহাস দেখল— ওই-দুটো ছেলেরই শুকনো পাছায় আর সরু-মতো পায়ে এঁটে-বসা একই রকমের প্যাণ্ট। একই ধরনের গেঞ্জি-সার্ট ওরা পরেছে—দেখে মনে হয়, আজকাল বস্তির যে সব ছেলে প্যাণ্ট-পরা ধরেছে—তাদেরই দুজন ওরা। ওরা কী কথা বলছে……

তা শোনার চেষ্টা করছিল সুহাস— কিন্তু, শুনতে পাওয়া যায় না কিছুই। ওরা এখন আস্তে কথা বলছে— সেই 'ভালো আছি'-র মতো জোরে আর নয়।

'ভালো আছি'টা সবাই উঁচু গলায় বলে—সুহাসের হঠাৎ মনে হয়— সবাই সবাইকে দেখামাত্রই প্রশ্ন করে— ভালো আছো ? সবাই উত্তর দেয়— আছি।

সুহাসের মনে পড়লো—একটু আগেই তো টুনুদের বাড়ি থেকে ফেরার সময় সে যখন পাগলের মতো অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল তখন রঞ্জিৎ ওর কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিলো— ভালো আছিস ?

সুহাস তখন উত্তর দিয়েছিল— আছি।

তারপর সুহাসদের বারান্দায় আশ্রয়-নেওয়া সেই ঘর-ছাড়া মানুষদের মধ্যে একজন বলেছিল— বৌমা, খোকাকে ভালো করে শোয়াও—

তার উত্তরটা শোনার আগে সুহাস দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, তবু সে বলতে পারে উত্তরটা নিশ্চয় এ-রকমই ছিলো—হ্যাঁ বাবা, খুব ভালো করে শোয়াচ্ছি—

ভালো করে? হ্যাঁ, খুব ভালো করেই শুইয়েছে নিশ্চয় কলকাতার পথের ওপরে একটা বারান্দাতে তাদের রাতের আস্তানায়।

ভালো আছি— সুহাসের আরও মনে পড়ল যে আজ সারাদিন সে এই কথা শুনেছে। সকলেরই মুখে। কুন্তি, সত্যসন্ধবাবু, অনুপ—সুহাস নিজেও বলেছে। কেউ ওকে প্রশ্ন করেছিল, ও কাউকে করেছিল— ভালো আছো?

সবাই বলেছে— আছি।

সবাই ভালো আছে। খুব ভালো আছে! ওই যে যে-সব মানুষ খালি-গায়ে খালি-পায়ে হাঁটছে— মা দুটি ভাত দাওগো মা— বলে রাস্তা দিয়ে চলেছে, তাদেরও কোনো চেনা-লোক হঠাৎ জিগ্যেস করলে হয়তো উত্তর দেবে— হ্যাঁ, ভালোই আছি।

এমনকি সামনের ওই দেয়ালটাকে যদি প্রশ্ন করা যায়— তুমি কেমন আছো?

ও উত্তর দেবে— খুব ভালো আছি। চুনকাম হয়ে আজ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছি। আলকাৎরার সব দাগগুলো তো চাপাই পড়ে গিয়েছে।

সবই চাপা পড়ে আছে— সুহাসের মনে হয়— সব কিছুই বেশ চমৎকার চলছে যেন। যেমন সুহাস আজ নিজে—

সুহাসের ভাবনার ছেদ টেনে ওর খুব কাছে একটা শব্দ হলো। মুখ ফিরিয়ে দেখলো— সুস্মিতা দরজাটা খুলে সামনে চলে আসছে।

তুমি কি এখনও খেতে যাবে না? বারান্দায় বসে চুপচাপ কী করছো তুমি? রাত কতো হলো তা খেয়াল আছে?

আর একটু পরেই আমি যাচ্ছি সুস্মিতা—

সুস্মিতা সুহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করে। সুহাসকে সে অনেকগুলো শক্ত কথা আজ বলেছে— সুহাসকে সে আগে বলে রাখেনি তার সঙ্গে শপিংয়ে যাওয়ার কথা। শুধু মনে মনে ভেবেছিল, তবু সে ঠিকই জানতো যে সুহাস বাড়ি ফিরে নিজেই সুস্মিতার সঙ্গে যেতে চাইবে।

সুহাস আসেনি। সেজন্য জমে-থাকা উষ্মার আঘাতেই সুহাসকে সে আঘাত করেছে বার বার। তাই কি ও আজ খেতে যেতে চাইছে না? হতে পারে। খুবই সম্ভব সেটা।

সুহাসের চোখের চাউনিতে সেরকম ভাবের কোন চিহ্ন দেখতে সে পায় না। তবু সুহাসের মুখে যেন অদ্ভুত একটা ছায়া ফুটে উঠেছে। আর—সুস্মিতা অবাক হয়ে ছাখে যে ওর হাতে-ধরা সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে ছাই গড়িয়ে সার্টের ওপর পড়েছে— এখনও দীর্ঘ একটা ছাইয়ের স্তম্ভ যেন আবার ভেঙে যাচ্ছে তার ওপরে—

সিগারেটটা ফেলে দাও— সে বলে।

সুহাস সেটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সার্টটা ঝেড়ে ফ্যালো।

সুহাস ঠিক তাই করে।

ওটা পোড়েনি তো? দেখি দেখি—

সুহাস ছাখে, দেখায়।

আচ্ছা, তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো?

কিছুই তো হয়নি— সুহাস বলে।

তাহলে এখনও খেতে যাচ্ছো না কেন?

খিদে এখনও পায়নি সুস্মিতা।

তোমার শরীরটা নিশ্চয় খারাপ হয়েছে— দেখেই মনে হচ্ছে যে—

না, ভালোই তো আছে বেশ—

ভালো আছে? তবে তোমার চোখ মুখ ও-রকম থমথম করছে কেন?

শরীর ভালোই আছে আমার। আর কিছু জিগ্যেস তুমি কোরো না সুস্মিতা। এর চেয়ে বেশি কাউকেই প্রশ্ন করতে নেই, তাহলে যে জবাব শুনতে হয় তা শোনা ভালো নয়— কারও শোনার দরকার নেই। শুনলে মানুষকে ভয়ে আঁৎকে উঠতে হয়, তাই সুস্মিতা, শুধু শুনে রাখো যে শরীরটা আমার ভালোই আছে। খুব ভালো আছে।

সুস্মিতা অবাক হয়ে সুহাসের কথা শোনে। স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর কাছে এগিয়ে এসে বলে— দেখি তোমার জ্বর-টর কিছু হয়েছে কিনা?

জ্বর আমার হয় নি সুস্মিতা।

তবে কী হয়েছে ?

বললাম তো আমি ভালো আছি।

তার মানে ?

মানে, আমি ভালো আছি। তুমি ভালো আছো। রিনহু খোকন ওরা সবাই ভালো আছে। এই পৃথিবীর, আমাদের দেশের সবাই খুব ভালো আছে— এমনকি ওই দেয়ালটাও— ভালো চুনকাম হয়ে গিয়েছে—

স্মিতা একটু পিছিয়ে যায়। চোখে মুখে একটা ভয়ের ছায়া ফুটে উঠেছে তার। গলার শব্দ নেমে এসে যেন প্রায় শব্দহীন— মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

সুহাস বলে ওঠে— না সুস্মিতা, তুমি ভুল করছো। মাথাটা আজ খুবই শান্ত আমার। তবে কাল হয়তো খারাপ হয়ে যাবে। তখন আমি একটা বদ্ধ পাগলের মতো কাজ হয়তো করবো—
